

ক্যালকাটা পাবলিশার্স

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ —১৩৫৭

প্রকাশক ঃ

শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল

ক্যালকাটা পাবলিশার্স

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

মুদ্রক ঃ

শ্রীরণজিৎ সামুই

বাণী-শ্রী প্রিণ্টার্স

৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা-৬

সোনার হরিণ নেই

মজার স্বপ্ন দেখছিল বাপী তরফদার। শহরটা যেন পাঁচ মাসের দেখা কাতার শহর নয়। জঙ্গলটাও বানারজুলির চেনা জঙ্গল নয়। কলকাতার তাই আর একটা শহর। বানারজুলির মতোই আর একটা জঙ্গল। সেই র আর জঙ্গল পাশাপাশি নয়। একটার মধ্যে আর একটা। জঙ্গলের মধ্যে র, আবার শহরের মধ্যেই জঙ্গল। হাতি বাঘ ভালুক হায়না চিতা হরিণ নুষ মেয়েমানুষ সব যে-যার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছেও না। কারো প্রতি কারো ভ্রূক্ষেপ নেই।

ঘোরের মধ্যেই ঘুমটা ভেঙেছে। বাপী তরফদার হঠাৎ ঠাওর করে উঠতে পারছিল না কোথায় শুয়ে সে। উদ্ভট স্বপ্নের রেশ মগজে লেগে আছে। সামান্য নড়াচড়ার ফলে দড়ির খাটিয়া ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে উঠতে সজাগ হল। সবে সকাল। মাথাটা ভার-ভার।

দেড় মাস হল খুপরি ঘরের এই দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে রাত কাটছে। তার আগে যেখানে ছিল সেটা ভদ্রলোকের আশ্রয়। সেখানে সুখ ছিল। ভোগ ছিল। মণিদার বউ গৌরী বউদির চোখের তারায় আগুন ছিল। সে-আগুনে ব্যভিচারের প্রশ্রয় ছিল। রমণীর অকরুণ ইশারায় মণিদার পুরুষকা... তরফদারের পিঠে চাবুক হয়ে নেমে আসে নি। ভালো মানুষ মণিদা সাদামাটা দু'চার কথায় তাকে বিদায় দিয়েছিল।

তারপর থেকে এই দেড় মাস এখানে।

ভদ্রলোকের সেই সুখের ঘরের আশ্রয় থেকে ঢের ভালো। তবু সকালে ঘুম ভাঙলে মাথাটা রোজই ওই রকম ভার-ভার লাগে। সেটা দড়ির খাটিয়ার দোষ নয়। নিজের দোষ। মাথার দোষ। অমন পাগলের স্বপ্ন কটা লোক দেখে? স্বপ্ন দেখুক বা না দেখুক, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যে খাপছাড়া ভাবনাগুলো আর ইচ্ছেগুলো মাথার মধ্যে ঠিকি দিয়ে জমতে থাকে, সেগুলো তরল হবার মতো গাঢ় ঘুমের প্রলেপই বা কতটুকু পড়ে? নইলে এই রকম দড়ির খাটিয়ায় চেপেই তাদের মতো লোকেরা নিমতলা-কেওড়াতলায় চলে যায়। আবার শুয়েই শুয়ে ঘুমোয়ও দিব্যি।

টালি-ছাওয়া পঁচিশ ঘর বাসিন্দার মধ্যে ক'টা ঘরেই বা খাট-চৌকি... ভালো ঘুম না হওয়াটা নিজের স্বভাবের দোষ বাপী তরফদারের। তার... তলায় অসহিষ্ণু বাপ্প ... বসানো আছে। মুখ দেখে...

বোঝা যায় না, সেটা তার নিজের কৃতিত্ব। কিন্তু ওই মেশিনটার ওপর তার কোনো হাত নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওটা কাজ করে চলেছে। বাপ্প-গুলো ঠেলে-ঠেলে মাথায় নিয়ে গিয়ে ঠাসছে। ওই নিয়ে ঘুম, ওই নিয়ে জাগা।

গোল চাপ-বাঁধা এই পঁচিশটা টালিঘরের শতেক বাসিন্দাদের একজন ভাবতে চেষ্টা করে নিজেকে। কিন্তু এখানকার বাসিন্দাদের প্রায় কেউই তা ভাবে না। এমন কি, যার আশ্রয়ে এই আধখানা ঘরে সে আছে, সেই রতন বানকও ভাবে না। তার বউটার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু বাকি সকলে তাকে ভদ্রলোক ভাবে। ভদ্রলোকের ছেলে ভাবে। ভদ্রলোকের মস্ত পাশ-টাশ করা ছেলে ভাবে। তাদের চোখে এখানে সে রতন বনিকের সমাদরের অতিথি নেহাৎ বিপাকে পড়ে দিন কতকের জন্য এসে ঠাঁই নিয়েছে। দিন ফিরলেই চলে যাবে। নইলে বিপুলবাবুও ওদের মতো ওই আধখানা টালি-ঘরে পাকা বসবাসের ভাঙা কপাল নিয়ে এসেছে না কি। রতন বনিক কপাল চেনে। বিপুলবাবুর কপাল এরই মধ্যে সকলকে সে ঢাক পিটিয়ে চিনিয়ে দিয়েছে।

…বিপুল তারই নাম। শুধু বিপুল নয়, বিপুলনারায়ণ তরফদার। গরিব বাবা-মা কোন্ বিপুল আশার খুঁটি ধরে এরকম একটা নাম রেখেছিল জানে না। গোটা নামটা মনে হলে নিজেরই হাসি পায়। তবে এই পোশাকি নাম ভালো পোশাকের মতো তোলাই থাকে বেশির ভাগ সময়। বাবা মা আত্মীয় পরিজন বন্ধু-বান্ধব সকলের কাছেই সে বাপী। বাপী তরফদার। জ্ঞান বয়সের আগে থেকে ওই নাম শুনে তার কান পেকেছে। কিন্তু খিদিরপুর ব্রুকলিন গোডাউনের বাবুদেব পিয়ারের পিওন 'আট-কেলাস' পড়া রতন বনিকের সঙ্গে কার্য-কারণ সুবাদে এখানে তার ওই পোশাকি নামটাই চালু।

অন্য সব দিনের সঙ্গে এই দিনটার সকাল দুপুর বা বিকেলের রঙে তফাৎ ছিল না একটুও। টালি এলাকার সকলের আগে রোজ যেমন ঘুম ভাঙে আজও তাই ভেঙেছিল। তফাৎ শুধু এই উদ্ভট স্বপ্নটা। তার রেশ ছিঁড়তে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে একবার চোখ তাকিয়ে খুপরি জানলার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলোর আভাস দেখেছিল। নড়বড়ে জানলা দুটো বন্ধ করলেও খানিকটা ফাঁক থেকেই যায়। সেই ফাঁক দিয়ে আলো ঢোকে। মাথার ওপরের টালির ছাদের ফাঁক দিয়েও আলোর রেখা হামলা করে। আলোর [illegible]ম বেয়াড়া স্বভাব বরদাস্ত করতে ইচ্ছে করে না বাপী তরফদারের। [illegible] জড়ানো শতেক ফুটোর কম্বলটা মাথার ওপর টেনে দিয়ে অন্য দিনের [illegible] সে আবার অন্ধকারে সেঁধিয়ে গেছল।

উনিশ-শ' আটচল্লিশের ফেব্রুয়ারির একেবারে গোড়ার দিক এটা। চার কি পাঁচ তারিখ হবে। সকালের শীতের কামড়ের হাত থেকে বাঁচার তাগিদেও আপাদমস্তক কম্বলে ঢাকা দিতে হয়। কিন্তু শেষ রাতে হোক বা প্রথম সকালে হোক, চোখ একবার দু' ফাঁক হলে ঘুমের দফা শেষ। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুলেও সবার আগে কলতলার কলরব কানে কটকট করে লাগবে। এই শীতের সকালেও জল নিয়ে কাড়াকাড়ি। কম্বলের তলায় ঢুকে বাপী তরফদারের ইচ্ছে করে ওদের সকলের মাথায় ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে দিয়ে আসতে।

সকালের আলো গরম হতে না হতে একটু আগে পরে গাঁ-গাঁ করে রেডিও বেজে উঠবে দু' ঘর থেকে। পঁচিশ ঘর বাসিন্দার মধ্যে মাত্র দু' ঘরেই এই সম্পদ আছে। তারা সকলকে জানান দিয়ে বাজায়। প্রথমেই শোকের প্রসঙ্গ শুরু হবে। সমস্ত দেশ জুড়ে শোকের কাল, শোক-পক্ষ চলেছে এখন। আজ ফেব্রুয়ারির চার তারিখ কি পাঁচ তারিখ বাপী তরফদার ঠিক করে উঠতে পারছিল না। যাই হোক, পাঁচ-ছ'দিন আগে নীল আকাশ থেকে আচমকা একটা বাজ পড়ার মতো সেই শোক-সংবাদ সমস্ত পৃথিবীর বুকের ওপর ফেটে পড়েছিল। গান্ধীজী দিল্লীর প্রার্থনা সভায় গুলিবিদ্ধ হয়ে 'হা-রাম' বলে চিরকালের মতো মাটিতে লুটিয়েছেন।

খবরটা শুনে পৃথিবীর শত-সহস্র কোটি মানুষের মতো বাপী তরফদারও প্রথমে সচকিত আর পরে স্তব্ধ হয়েছিল। কলকাতায় এসেছে মাত্র পাঁচ মাস আগে। অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়ার এক মাসের মধ্যে। দূরে বসে দাসত্বের শেকল ভাঙার ঝনঝনানি কানে যত মিষ্টি লেগেছিল, এই পাঁচ মাস যাবৎ আবেগশূন্য বাস্তবভূমির ওপর বিচরণের ফলে তার রেশ প্রায় মিলিয়েই গেছে। তার চোখে মহাত্মার-হত্যা সেই আবেগ-শূন্যতার শেষ নজির। এই নজির দেখে সেদিন সে স্তব্ধ বোবা হয়ে বসেছিল। সকলেরই তাই হবার কথা। কিন্তু তারপর থেকে দেখছে শোকের আনুষ্ঠানিক দিকটাও কম ব্যাপার নয়। যত বড় শোক, ততো বড় অনুষ্ঠান। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রেডিওয় শোকের গান আর শোকের বক্তৃতা, পথে ঘাটে শোকের মিছিল আর শোকের মিটিং। বাপী তরফদারের এক-একসময় মনে হয়েছে দেশটা সত্যি শোকে ডুবে গেল নাকি শোকের উচ্ছ্বাসে! বাইশ বছর বয়সের মধ্যে সে নিজে তো কখনো সরবে শোক করেনি।

...যে মহারানীর ঘুম ভাঙলে বাপী তরফদারের শরীর খানিক চাঙা হতে

পায়ে আর মাথায় ভার একটু কমতে পারে, তাঁর সকাল হতে কম করে এখনো ঘণ্টা দুই দেরি। রতন বনিকের বউ কমলা বনিক। আজ দেড় মাস হয়ে গেল ওরাই তার আশ্রয়দাতা এবং আশ্রয়দাত্রী। রতন বনিকের কড়া হাতের ধাক্কা না খেলে রেডিও বাজুক বা কলতলা সরগরম হোক বেলা আটটার আগে সেই দেমাকীর ঘুম ভাঙতে চায় না। ঠেলা মেরে ঘুম ভাঙানোর পরে রতনকে আবার মিষ্টি সোহাগের সুরে দু'-চার কথা বলতে হয়। তা না হলে সাত-সকালে বউয়ের বচনের তোড়ে অনেক সময় তাকে ছিটকে এই খুপরি ঘরে চলে আসতে হয়। সপ্তাহে একদিন করে নাইট ডিউটি পড়ে রতন বনিকের। ফেরে পরদিন সকাল দশটায়। সেদিন বেলা আটটা সাড়ে- আটটার আগে কেউ আর বাপী তরফদারের এই খুপরি ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকে না।

গত রাতে রতনের নাইট ডিউটি ছিল না অবশ্য। তাই সোয়া সাতটার থেকে সাড়ে-সাতটার মধ্যে চায়ের আশা আছে। খুপরি ঘরের দরজা আছে কিন্তু হুড়কো নেই। অন্য দিনের মতোই কমলা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেছিল। কম্বলের তলা থেকে বাপী তরফদার সেটা টের পেয়েছে। কারণ, ভেজানো দরজা দুটো শব্দ করেই খোলা হয় আর এই কমলার চলনও লঘু নয়। ঘরে ঢুকে রোজ সে আপাদমস্তক কম্বলে মোড়া একই দৃশ্য দেখে, আর বাপী তরফদারের একই সম্ভাষণ শোনে।

—কই গো, বড়বাবুর ঘুম ভেঙেছে—নাকি ফিরে যাব ?

এক ডাকে সাড়া না দিলে সত্যি ফিরে যাবে। দ্বিতীয়বার আর ডাকবে না। সাড়া না পেয়ে এরকম ফিরে গেছে দুই-একদিন। কমলার নিজের ঘুমের ওপর মমতা আছে বলেই বেশি হাঁকডাক করে কারো পাকা ঘুম ভাঙাতে চায় না। ডাক শোনা মাত্র বাপীকে কম্বল ফেলে তড়াক করে দড়ির খাটিয়ার শয্যায় উঠে বসতে হয়।

সকালের এই একটা সময় রতন বনিকের বউটাকে ভালোই লাগে। ঘুমের দাগ লাগা ফোলা-ফোলা মুখ। কালো চোখের তারায় ঘুম-ছোঁয়া ঢুলু ঢুলু ভাব একটু। তার এক হাতে শাড়ির আঁচলে জড়ানো গরম চায়ের গেলাস, অন্য হাতে শস্তা দামের খানচারেক বিস্কুট, নয়তো হাতে-গড়া দু'খানা রুটি আর গুড়। বিস্কুট বা রুটি পছন্দ নয়, ওই চায়ের গেলাসটাই লোভনীয়। কিন্তু কমলার শাসনে পড়ে বিস্কুট বা রুটি-গুড়ও নিতে হয়। না নিলে কমলা খর হয়ে উঠবে, খালি পেটে চা গিললে কারো 'নিভার' আস্ত থাকে!

'আট-কেলাস' পড়া রত্তনী বনিকের 'ছ'-কেলাস' পড়া বউয়ের ভুলটা বাপী তরফদার একদিন শোধরাতে চেষ্টা করেছিল।—কথাটা নিভার নয়, লিভার।

পলকা ঝাঁঝে মুখঝামটা দিয়ে উঠেছিল কমলা বণিক। —থাক্, নিজের বিদ্যে নিজের মাথায় ঠেসে রাখো, আমাকে আর বিদ্যে দান করতে হবে না!

এরপর আর ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেনি। কিন্তু রোজ সকালে ওই শামলা মুখের ধমক একটু খেতেই হয়। কারণ, কম্বল ফেলে ধড়মড় করে উঠে বসেই চায়ের গেলাসের জন্য হাত বাড়ায় সে। ফল কি হবে জেনেও। শাড়ির আঁচল তেমনি গেলাসে ধরে রেখেই কমলা চোখ পাকাবে।—মুখ ধোয়া হয়েছে?

এটুকু ভালো লাগে বলেই বাপী তরফদার মিথ্যে বলে না। বিব্রত মুখে মাথা নেড়ে জানান দেয়, ধোয়া হয়নি।

—ঘেন্নাও করে না বাসি মুখে কিছু গিলতে—যাও মুখ হাত ধুয়ে এসো!

এই নিয়মিত অধ্যায় চটপট সারা হলে তবে চায়ের গেলাস আর বিস্কুট ধা রুটি তার হাতে আসে।

আজও এর খুব ব্যতিক্রম হল না। তবে একটু হল চায়ের গেলাস আর বিস্কুট হাতে নিয়ে বসার পর। গজেন্দ্রগমনে কমলা বনিক দরজার কাছাকাছি এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল। এটুকু অপ্রত্যাশিত। চা দিয়ে চলে যাবার সময় বিপুল তরফদারের দু' চোখ নিজের অগোচরে দরজা পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করেই। আজ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানোর ফলে চাউনিটা তার মুখের ওপর হোঁচট খেল। আর এটুকুও কমলার চোখে ধরা পড়ল। হাসির ঝিলিক ঢাকা দেবার জন্যেই সে ছোট করে হাই তুলল একটা।—বুড়ো বলছিল বিপুলবাবু দুই-একদিনের মধ্যেই চলে যাবে।...ঠিক? আ হা, ষাট ষাট, জিভে গরম চায়ের ছেঁকা লাগল বুঝি?

চায়ের গেলাস কোলের কাছে নামিয়ে বাপী তরফদার গম্ভীর মুখে জবাব দিল, দেড় মাস হয়ে গেল আর কত অসুবিধে করব তোমাদের...

কমলাও গম্ভীর মুখেই সায় দিল, আমাদেরই বা সকালে এক গেলাস চা আর দু'খানা বিস্কুট দিয়ে কতকাল কেষ্ট ঠাকুরকে ধরে রাখার ক্ষ্যামোতা বলো।...তা এবার কোন্ মহলে ঘর ঠিক হল?

—কোথাও না। দেশেই চলে যাব ভাবছি। এখানে আর কিছু হবে না—

কমলার কালো চোখের তারায় চাপা হাসির ঢেউ খেলে গেল একটু।

বলল, কোথায় যে তোমার হবে ভগবানই জানে। বুড়ো অবিশ্যি বলে, হবে যখন দেখে নিস, বিপুলবাবুর ভাগ্যিখানা কালবোশেখীর ঝড়ের মতোই সবদিক তোলপাড় করে নেমে আসবে একদিন—তা দেখো, যেখানে গেলে হবে সেখানেই যাবে, তার আর কথা কি।

হেসেদুলে চলে গেল।

···আর এই সকালেই ইদানীংকালের সেই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধটা তার মধ্যে ছড়িয়ে রেখে গেল। বাপী তরফদারের ওই কমলার ওপরেই রাগ হতে থাকল। ভদ্রলোকের সংস্রব এড়িয়ে রাতের এই মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু তার নিশ্চিন্ত আশ্রয় হয়ে উঠতে পারত। রতনের সঙ্গে কথা বলে সামান্য কিছু ভাড়াও ঠিক করে নেওয়া যেত। কিন্তু এখান থেকে যাওয়ার কথা ইদানীং রতনকে বলতে হচ্ছে নিজের ভিতরের অস্বস্তি দিনে দিনে বাড়ছে বলে। যাবার কথা রতনকে কাল রাতেও বলেছে।

অস্বস্তি শুরু হয়েছিল এখানে আসার দিনকতকের মধ্যেই। বয়স্ক রতন বনিকের ওই তরতাজা বউটা ঠারেঠোরে তাকাতে জানে। চোখের কোণে আর ঠোঁটের ফাঁকে হাসির ঝিলিক ফোটাতে জানে। প্রথম ক'টা দিনই শুধু ধারেকাছে ঘেঁষেনি, আড়াল থেকে লক্ষ্য করেছে। সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি করে বাপী তরফদার তখন বিকেলের দিকে ঘরে ফিরত। ঘণ্টা দুই-তিন দড়ির খাটিয়ায় চিৎপাত শুয়ে থেকে আবার বেরুতো। বাইরে রাতের খাওয়া সেরে ঘরে ফিরত।

একদিন সন্ধ্যার ঠিক পরে ব্যস্তসমস্ত মুখে ঘরে ঢুকে রতন বনিক বলেছিল, আজ নাকি সমস্ত দিন খাওয়াই হয়নি আপনার?

বাপী তরফদার সচকিত।—কে বলল?

বউ বলেছিল, আজ সমস্ত দিন উপোস গেছে কেষ্ট ঠাকুরের—

বলে ফেলেই লজ্জা পেয়ে জিভ কামড়েছে সে। তারপর হেসে বলেছে কিছু মনে করবেন না বাবু, বউটার লঘু-গুরু জ্ঞান নেই—ওই রকমই কথা। বলে, কেষ্ট ঠাকুরপানা মুখখানা—। আজ ঘরে ফিরতেই বলল, কেষ্ট ঠাকুর সমস্ত দিন উপোস দিয়েছে। এরই মধ্যে ভাত তরকারি রেঁধে ফেলেছে, সকালের একটু মাছও আছে—আপনাকে এক্ষুনি ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঠেলে পাঠালো আমাকে। চলুন—

বাপী তরফদার বাধা দিয়েছিল, না না, তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না, আমি একটু বাদেই বাইরে থেকে খেয়ে আসছি—

মাথা নেড়ে রতন বনিক বলেছিল, আজ আর সেটি হচ্ছে না বিপুলবাবু, রাঁধা ভাত-তরকারি সব তাহলে ড্রেনে ঢেলে দেবে, আমাকেও খেতে দেবে না। চলুন শিগগীর—

অগত্যা উঠে আসতে হয়েছে। সকালের চা-রুটির পর সেদিন সত্যিই চার পয়সার মুড়ি আর চার পয়সার চিনেবাদাম ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি। সেটা যে নিছক অভাবের দরুন তা নয়। তিন মাসের চাকরির কিছু পুঁজি হাতে আছে এখনো। অবশ্য হিসেবের বাইরে একটিও বাড়তি পয়সা খরচ করে না সে। কিন্তু একেবারে না খাওয়াটা পয়সা বাঁচানোর তাগিদে নয়। মেজাজ না থাকলে এক-আধ বেলা ওরকম উপোস দিতে অভ্যস্ত।

খেতে খেতে একটু সহজ হবার জন্যেই রতন বনিকের বউয়ের দিকে একবার মুখ তুলে তাকিয়েছিল। আর তার পরেই কি-রকম ধাক্কা খেয়েছিল একটু। এ-ক'দিনে দুই-একবার আভাসে দেখলেও মুখখানা চোখে পড়েনি। আধবয়সী রতন বনিকের ঘরে এরকম বউ থাকা সম্ভব সে ভাবেনি। গায়ের রং তারই মতো কালো ঘেঁষা, কিন্তু অল্প বয়েস, সুঠাম স্বাস্থ্য। কালো চোখে সরমের বালাই নেই। উল্টে সে নিজেই যেন রমণীটির চোখে একটি দর্শনীয় বস্তু।

চোখাচোখি হতে বাপী তরফদার হেসেই বলেছিল, সমস্ত দিন সত্যিই আজ ভালো করে খাওয়ার ফুরসত হয়নি, কিন্তু তুমি বুঝলে কি করে?

তক্ষুনি জবাব এলো, মাটির কেষ্ট হলে বোঝা যেতনি, ওই বুড়োর চোখ থাকলে সে-ও বুঝত।

বউয়ের কথা শুনে রতন বনিক হেসে উঠেছিল, তোর মতো চোখ আর কার আছে বল্। পরে বলেছিল, তোর স্বভাব জানি, বিপুলবাবুর সামনে কক্ষনো ঠাট্টা-ঠিসারা করে বসিস্নি যেন—আমাদের কত ভাগ্যির জোরে উনি এখানে এয়েছেন—একদিন ওঁর দিন কেমন ফেরে দেখে নিস—

নিরীহ বিস্ময়ে কমলা বলেছিল, দিন ফিরলে আমি দেখে নেব কি করে গো!

তুষ্ট মুখে হার মেনে রতন বলেছিল, সবেতে কেবল ফষ্টি-নষ্টি কথা তোর—দিন ফিরলেই বিপুলবাবু কি আমাদের ভুলে যাবেন!

সেই দিন থেকে ভিতরে ভিতরে কেমন অস্বস্তি বোধ করেছিল বিপুল তরফদার। দীর্ঘকাল জঙ্গলে বাসের ফলে বুনো জন্তু-জানোয়ার ছেড়ে মানুষেরও প্রবৃত্তির দিকটা অনেকখানি চেনা তার। সেই সঙ্গে নিজের খোলস-

ঢাকা চরিত্রও ভালোই জানা। মনের তলায় সেই রাতেই একটা বিপদের আভাস উকিঝুঁকি দিয়ে গেছে।

পরদিন থেকেই সকালে চা-বিস্কুট বা চা-রুটি-গুড় নিয়ে রতন বনিকের বদলে কমলা নিজেই দরজা ঠেলে অনায়াসে ঘরে ঢুকেছে। আর তখন অতিথির অস্বস্তিটুকুও তার কাছে উপভোগ্য কৌতুকের মতো। তারপরে আবারও এক-আধদিন দুপুরের খাওয়া বাদ পড়লে এই বউটার চোখে ধরা পড়বেই। আর তখন জুলুম করে ধরে নিয়ে গিয়ে খেতে বসাবে তাকে। ঠিসারার সুরে রতনকে বলবে, অসময়ে তোমার ভাগ্যিমন্ত অতিথির একটু সেবা-যত্ন করে রাখলে আখেরে কাজ দেবে—কি বলো?

রতন বনিকেরও তুষ্ট মুখ—এখন ঠাট্টা করছিস কর, পরে দেখে নিস।

বাপী তরফদার এরপর বিকেলে ঘরে ফেরাই ছেড়ে দিল। একেবারে রাতের খাওয়া সেরে ঘরে ঢুকত।

কমলা সেই সময় থেকে তাকে বড়বাবু বলে ডাকতে শুরু করেছে। শুনে কান করকর করেছে বাপী তরফদারের। কিন্তু এ নিয়ে তাকে কিছু বলেনি। বলতে গেলেই কমলা দুটো রসের কথা বলে বসবে। সেটা নিজেকে প্রশ্রয় দেওয়ার সামিল হবে বাপী তরফদারের। সব থেকে বেশি ভয় নিজেকে। বনে-জঙ্গলে বাসের কালে বিষাক্ত সাপের আচমকা ছোবলে এক-একটা বড় বড় জীবকে ধরাশায়ী হতে দেখেছে। সেই ছেলেবেলা থেকে ওই রকম একটা হিংস্র প্রবৃত্তি তার মধ্যেও লুকনো আছে। এই কারণেই নিজেকে সব থেকে বেশি ভয়।

··দেড় মাস আগে প্রবৃত্তির এই দিকটা আচমকা অনাবৃত হয়ে গেছল। গৌরী বউদি দেখেছিল। চিনেছিল। গৌরী বউদি কম করে ছ' বছরের বড় তার থেকে। কিন্তু জানোয়ার বয়েস দেখে না। গৌরী বউদিও চোখের সামনে সেদিন তাজা জ্যান্ত পুরুষ দেখেছিল একটা। তার চোখের আগুনে পতঙ্গ পোড়ে না। পতঙ্গ করুণার পাত্র। মণিদা করুণার পাত্র। গৌরী বউদির চোখের আগুনে ব্যভিচারের প্রশ্রয়।

···কিন্তু জানোয়ারটা ততক্ষণে খোলসে সেঁধিয়েছিল আবার। গৌরী বউদি তাকে ক্ষমা করেনি। তাকে আশ্রয়-ছাড়া করেছে।

···এই কমলার মতোই গায়ের মাজা রং গৌরী বউদির। সুপটু প্রসাধনে আর একটু উজ্জ্বল হয়তো। মাথায়ও কমলার থেকে কিছু লম্বা। কিন্তু গৌরী বউদির মতো নয় কমলা। তার মতো তীক্ষ্ণ নয়। নির্লিপ্ত নয়। অকরুণ নয়।

মায়া-মমতা আছে। বুড়ো স্বামীর যত্ন-আত্তি করে। মেজাজ ভালো থাকলে সহজ কৌতুকে আর উচ্ছ্বাসে টইটম্বুর। সে ঠারেঠোরে তাকাতে জানলেও তাকে দেখে গৌরী বউদির মুখ মনে পড়ত না বাপী তরফদারের।

কিন্তু ইদানীং মনে পড়ে। পড়ছে। হঠাৎ-হঠাৎ মনে হয়, সে-রকম পরিস্থিতি-বিপর্যয়ে এই কমলাও গৌরী বউদির মতো হয়ে উঠতে পারে। মণিদার মতো রতন বনিকও হয়তো তখন নিরীহ মুখে ওকে এখান থেকে চলে যেতে বলবে। সেই ভয়েই মাঝে মাঝে এই আশ্রয় ছেড়ে পালানোর কথা ভাবছে সে। যাবার কথা রতন বনিককে বলেছেও।

কমলা নিজের স্বামীকেই বলে বুড়ো। রতনের সামনেই বলে। কিন্তু রতন তাতে রাগ করে না। এই বউয়ের পাশে একগাল কাঁচা-পাকা দাড়ির জন্য একটু বেখাপ্পাই দেখায় তাকে। দ্বিতীয় পক্ষের এই বউকে খুশি করার জন্যও রতন বনিক কেন দাড়ির মায়া ছাড়তে পারে না বাপী তরফদার সেটা ভালোই অনুমান করতে পারে।

রুকলিনের বাবু এমন কি বড়বাবুদের কাছেও কোনো কারণে রতনের একটু বিশেষ সমাদর আছে। এই দাড়ির বোঝা সাফ করে ফেললে সেই বিশেষ কদরে ঘাটতি পড়ার আশংকা। কিন্তু দাড়ির কারণে এই স্বামী-সম্ভাষণ কি অন্য কোনো চাপা ক্ষোভের ফলে, সেটা একমাত্র কমলাই জানে। রতনের বয়েস এখন উনচল্লিশ আর কমলা খুব বেশি হলে কুড়ি ছাড়িয়েছে। কমলা বাপীর থেকে দেড়-দু' বছরের ছোট হতে পারে।

সন্ধ্যার পর মাত্রা রেখে একটু-আধটু নেশা করার অভ্যাস আছে রতন বনিকের। এই খুপরিটা তার নেশার ঘর। বোতল থেকে সাদা জলের মতো খানিকটা দিশি মাল খায় আর সেই সঙ্গে নুন মেশানো কিছু আদার কুচি। আগে হয়তো ওই পর্বের পর এই দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে খোয়াব দেখত। এখন মেঝেতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে অল্প অল্প দোলে। কেউ সামনে থাকলে মন খুলে গল্প করে তার সঙ্গে। সামনে গোড়ার দিকে বাপী তরফদারই থাকত। রতনের সংকোচ সে-ই কাটিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আমি তোমার আশ্রিত, কিন্তু তোমার কোনরকম অসুবিধে হচ্ছে দেখলে আমি সরে পড়ব।

রতনের অসুবিধের ব্যাপারটা প্রথম সন্ধ্যাতেই টের পেয়ে গেছল। অন্য কারো ঘরে গিয়ে নেশা সেরে এসে রতন এই খুপরিতে এসে বসেছিল। মেঝেতে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে তাকে একটু একটু দুলতে দেখেই সন্দেহ

হয়েছিল। তারপর ওর জিভ আল্‌গা হতে সমস্যা বুঝেছে। বউটার বিবেচনার অভাবের কথাই বলছিল রতন। মাতাল তো আর হয় না, সমস্ত দিন খাটা-খাটনির পর সামান্য মৌজের লোভে যা একটু খায়। শরীর মন ভালো থাকে, রাতে ভালো ঘুম হয়। এই খুপরি ঘরে অতিথি আছেন জেনেও বোতল সুদ্ধু বউ তাকে নিজের ঘর থেকে বার করে ছাড়ল। বোতল হাতে দেখলে রতনকে সাদরে ডেকে নেবার মতো ঘর এখানে আরো দু'পাঁচটা আছে। কিন্তু যে ডেকে নেবে তাকে ভাগ তো দিতেই হয়। সেদিনই খামোখা একটা ছোট বোতল একেবারে ফাঁক হয়ে গেল। রোজ রোজ লোককে এ-রকম ভাগ দিতে হলে সে-যে ফতুর হয়ে যাবে বউয়ের এই সামান্য বিবেচনাও নেই।

বাপী তরফদার তারপর ওই কথা বলে তাকে নিশ্চিন্ত করেছিল। ঢুলু ঢুলু দু' চোখ টান করে রতন বলেছিল, বিপুলবাবুর মতো এমন দরাজ মনের মানুষ সমস্ত ক্রকলিনেও আর দুটি নেই, অথচ বরাত এমন যে তারই চাকরিটা সকলের আগে খোয়া গেল। কিন্তু সে নিশ্চিন্ত, বিপুলবাবু ঢের ঢের বড় হবেন বলেই এই ধাক্কাটা খেতে হল।

ওর বড় হওয়ার ভবিতব্যের কথা শুনে কমলা তাকে ঠাট্টা করে বড়বাবু বলা শুরু করেছে।

অতিথির কাছ থেকে রতন বনিক ঘর ভাড়া নেবেই না যখন, অন্যভাবে বাপী তরফদারকে তার দরাজ মনের পরিচয় দিতে হয়েছে। বার দুই নিজে ছোট বোতল কিনে ওর হাতে গুঁজে দিয়েছে। রতন বনিক খুশিতে আটখানা। এ-সময় একটু-আধটু চেখে দেখলে বাবুরও মন ভালো হত এ-কথা অনেকবার বলেছে। কিন্তু জঙ্গলের মানুষদের এ জিনিস হামেশাই খেতে দেখেছে বাপী। অনেক বেলেল্লাপনাও দেখেছে। ফলে এই লোভ সে বাতিল করেছে। রতনের কথায়ও বিন্দুমাত্র আগ্রহ হয়নি। উল্টে বউয়ের ওকে ঘরে বসে এ জিনিস খেতে না দেওয়ার তেজটুকু ভালো লেগেছে।

এ-সময় ওই দ্বিতীয় পক্ষটির গল্প রতন বনিকের মুখেই শুনেছিল সে।… কমলা রতনের নিজের শালী। প্রথম পক্ষ দুর্গার থেকে ঢের ছোট অবশ্য। শ্বশুর-শাশুড়ীর বুড়ো বয়সের মেয়ে।…দুর্গার সর্বাঙ্গ মায়ের দয়ায় ছেয়ে গেছল। সেটা জানাজানি হতে সরকারী গাড়ি এসে তাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে রেখে এসেছিল। আর ঘরের মুখ দেখতে পায়নি, সেখানেই সব শেষ। পাঁচ বছর আগের কথা। দুর্গাকে হারিয়ে রতন চোখে-মুখে অন্ধকার দেখেছিল। কমলার তখন বছর পনের কি ষোল বয়েস। মফঃস্বলে বিধবা মায়ের কাছে

থাকে। শাশুড়ী তাকে চিঠি লিখত, একটা তো গেছেই, যেটা আছে তার ভয়ে বুকের ভিতরটা সর্বদা হিম হয়ে থাকে। মেয়েটা দিনকে দিন দজ্জাল হয়ে উঠছে।

রতনের তখন শোকের সময়। অতশত কান দেয়নি। বছর ঘুরতে শাশুড়ীর জোর তাগিদ এলো, জামাইয়ের শিগগীর একবার আসা দরকার—এখানকার ঘর বাড়ি বেচে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার ইচ্ছে তার। ততদিনে রতন বনিকের শোক হালকা হয়েছে। কিন্তু বোতলের অভ্যাসটাও তখন থেকেই।

ছুটি নিয়ে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে তার সমস্যা স্পষ্ট করে বুঝল। সমস্যা ছোট মেয়ে। কমলার তখন বছর সতের বয়েস। বাড়ন্ত গড়ন। তাকে দেখে চোখে পলক পড়ে না রতনের। অনেক ছোট শালী, কাছে ডেকে আগের মতোই গায়ে পিঠে হাত বোলাবার লোভ ছাড়তে পারেনি। কিন্তু সতের বছরের ওই কমলা পাকা ঝানু মেয়ে তখন। তার হাত একটু বেসামাল হতেই ফোঁস করে উঠেছে। আর তাই দেখে ভিতরে ভিতরে রতন বনিকও পাগল হয়েছে। কিন্তু কাউকে বুঝতে দেয়নি।

গম্ভীর মুখে সামনে বসে শাশুড়ীর নালিশ শুনেছে সে। সমস্যা আর দুর্ভাবনার কথা শুনেছে। এই মেয়েকে আর সামলাতে পারছে না শাশুড়ী। তার ফষ্টি-নষ্টি বেড়েই চলেছে। আগে আশপাশের সমান পর্যায়ের ছেলে-ছোকরাগুলো উৎপাত করত। ওই পাজী মেয়েও তাদের আসকারা দিত। যার সঙ্গে খুশি বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতো। কোথাও যাত্রা হচ্ছে শুনলে মায়ের শাপমন্যিতে ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যেত। এখন ভদ্রঘরের ছেলেদের উৎপাত শুরু হয়েছে। দিনেদুপুরে জানলা দিয়ে ঢেলার মতো চিঠির মোড়ক ঘরে এসে পড়ে। শাশুড়ী লেখাপড়া জানে না, আর কমলাও চোখ-কান বুজে মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলে। কিন্তু ফাঁক পেলেই চুপিচুপি বেরিয়ে যায়। একা শহরে গিয়ে সিনেমা দেখে আসে। ওই সব পাজী ছেলেগুলোই নিশ্চয় পয়সা যোগায়। চৌদ্দ-পনের বছর বয়েস পর্যন্ত বাখারি-পেটা করে মেয়েকে মাটিতে শুইয়ে ফেলা গেছে, কিন্তু এখন মেয়েটা মায়ের সমস্ত শাসনের বাইরে।

...হ্যাঁ, বুদ্ধির চালে সেই একবার শাশুড়ী আর তার মেয়ে দুজনকেই ঘায়েল করতে পেরেছিল রতন বনিক। ভেবে-চিন্তে শাশুড়ীকে বলেছে, কমলাকে এখান থেকে সরানো দরকার। কলকাতা দেখাবার নাম করে শাশুড়ী আর শালী দুজনকেই তার ওখানে নিয়ে যাবে সে। আর তারপর কমলার মতো মেয়ের ভালো বিয়ে হতে কতক্ষণ? কমলার যে ভালো বিয়ে হবে নিঃসংশয়ে সেই

ভবিষ্যৎবাণীও করেছে। জামাইয়ের এই ঘোষণার ওপর শাশুড়ীর ভারী আস্থা। তার ওপর শুনেছে খরচাপত্রের জন্যেও ভাবনা নেই—যা করার জামাই-ই করবে। কলকাতার এই চাকুরে জামাই শাশুড়ীর মস্ত গর্ব।

কমলাও সানন্দে এসেছে। কলকাতা দেখার লোভ, তার ওপর দিনে একটা করে সিনেমা দেখার লোভ। এত লোভের টোপ না গিলে থাকতে পারবে এমন মেয়ে কমলা নয়। সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে বিয়ের আগের দিন মতলবটা শাশুড়ীকে জানিয়েছে রতন বনিক। প্রথম শোনার পর শাশুড়া ঘণ্টা-কতক গুম হয়ে ছিল অবশ্য। কিন্তু আবার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে মেয়ের হাল কি হতে পারে সেই ভবিষ্যৎবাণী শোনার পর শাশুড়ী আর আপত্তি করেনি। উল্টে ভেবেছে এ বরং ভালোই হল, মেয়েটা তোয়াজে থাকবে।

কমলা জেনেছে একেবারে বিয়ের দিন সকালে। কিন্তু সেদিন আর রতন বনিক এই টালি এলাকা থেকে তার পালাবার মতো কোনো ফাঁক রাখেনি। শেষে মুখ বুজেই বিয়েটি করতে হয়েছে তাকে। তবে ওই দজ্জাল বউকে বাগে আনতে বেশ সময় লেগেছিল রতন বনিকের। কখন কোন্ ফাঁক দিয়ে পালায় সেই ভয়ে আস্ত একটা মাস আপিস ছুটি নিতে হয়েছিল। আর রোজ একটা করে সিনেমা দেখাতে হয়েছিল।

কথায় কথায় একদিন বউয়েব আর একটা খেদের কথা জেনেছিল রতন বনিক। এখানে কারো ঘরে কোনো শুভ কাজ হলে বউ নাকি অপমান বোধ করে। কুড়ি পার হতেও ছেলেপুলে হল না বলে এখানকার এয়োরা কোনো শুভ কাজে প্রথমে তার মুখ দেখতে চায় না। রতন বনিক অবশ্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছে কমলা ছেলের মা হবে, ব্যস্ত হবার কি আছে, সবে তো কুড়ি গড়ালো বয়েস। কিন্তু বউ তক্ষুনি গলা উঁচিয়ে তর্ক করবে, তাহলে দিদির কেন তিরিশ বছরেও ছেলেপুলে হল না! এ-সব কথা শুনলে রতন বিরক্ত হয়।—দিদির বরাতে ছিল না তাই হয়নি —তা নিয়ে তোর এত ভাবনা কেন, তোর হলেই তো হল!

কপালের ব্যাপারে এত লোকের এত বিশ্বাস রতন বনিকের ওপর, এতটুকু বিশ্বাস নেই শুধু ঘরের বউয়ের। আরে বিশ্বাস না থাকলে কারো কোনদিন কিছু হয়!

...আপিসের সহকর্মীদের কাছে তো বটেই, বাবুদের আর বড় ঘরের বাবুদের কাছেও পিওন রতন বনিকের ওই কপাল গোনার গুণেই বাড়তি খাতির। মাস দুই আগে পর্যন্ত বাপী তরফদার নিজেও ওই ব্রুকলিনেরই সাধারণ কেরানী-

বাবুদের একজন ছিল। রতন বনিক সেই বিভাগেরই পিওন। কিন্তু পিওনের কাজ খুব একটা করতে হয় না তাকে। কারণ, দশটা-পাঁচটা অফিসের মধ্যে নিজের বা অন্য বিভাগের কোনো না কোনো বাবু ডিউটির অর্ধেক সময় তাকে ডেকে নিয়ে পাশে টুল পেতে বসিয়ে ভবিষ্যতের জট ছাড়াতে চায়।

নিজস্ব পদ্ধতিতে ভবিষ্যৎ গণনার সুনাম দিনে দিনে বাড়ছিল রতনের। হাত দেখা বা ঠিকুজি দেখার সঙ্গে এই গণনার কোনো সম্পর্ক নেই। তার কোন্ এক গুরুর আশীর্বাদে এক ভিন্ন পদ্ধতিতে সে ভবিষ্যৎ বক্তা আর ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হয়ে বসেছে। একমাথা চুল, একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি, আর চওড়া কপালে তেমনি মোটা করে মেটে সিঁদুর ঘষা। অনেকেরই বিশ্বাস লোকটার তন্ত্রমন্ত্র জানা আছে কিছু। ছোট বড় বাবুদের কাছ থেকে দু'দশ টাকা রোজগার হয় রতন বনিকের।

সে তার খদ্দেরের মাথার শেপ দেখে, ভুরু কান নাক চোখ দেখে, ঠোঁটের বক্রাভাস দেখে—আর সব থেকে বেশি দেখে মুখ আর কপালের রং। শুধু তার চোখেই যে কোনো লোকের সুসময়ে অথবা দুঃসময়ে কপাল আর মুখের রং-বদল ধরা পড়ে। খুব নিবিষ্ট মনে এইসব দেখে নিয়ে চোখ বুজে সে ভবিষ্যৎ বলা শুরু করে। যা বলে তার কিছু সত্য হতে পারে, বেশির ভাগই হয়তো সত্য হয় না। বাপী তরফদারের তাই ধারণা। একশটা ঢিল ছুঁড়লে দু' দশটা লেগে যায়ই। কিন্তু মানুষের মন এমনি দুর্বল, যেটা লাগল সেটারই দাগ থেকে গেল। অনেককে বলতে শুনেছে, ব্যাটা ভাঁওতাবাজ, কিস্সু জানে না। কিন্তু বিপাকে পড়লে অথবা কোনো আশার সম্ভাবনা দেখলে তাদেরও ওকে খাতির করে কাছে ডেকে বসাতে দেখেছে।

শাশুড়ীর কাছে চিঠি লিখতে হলে বা টাকা পাঠাতে হলে নতুন বাবু অর্থাৎ বাপী তরফদার তার সেই চিঠি অথবা মানিঅর্ডার ফর্ম লিখে দিত। আর রোজ ওকে দিয়ে চা আনানোর সময় ওকেও চা খাওয়ার পয়সা দিত। সেই কারণে হোক বা সমস্ত বিভাগের মধ্যে এমন কি আপিসের মধ্যেও একমাত্র বিপুল তরফদারই ভাগ্য যাচাইয়ের ব্যাপারে কখনো শরণাপন্ন হয়নি বলে হোক—রতন বনিকের তার ওপর একটু বেশি টান ছিল। তার আগ্রহ না থাকলেও নিঃসংশয়ে সে তার সম্পর্কে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যা শুনে সহকর্মীদের চোখ ট্যারা আর বাপী তরফদারের মেজাজ গরম। তার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সে গোটা ব্রুকলিন ডিপোর মালিক হয়ে বসলেও অবাক হবার কিছু নেই।

...ভবিতব্যের কথা শুনে অপরের হাসি দেখে সাধারণ কেরানীবাবু বিপুল-

নারায়ণ তরফদারের মেজাজ গরম হবার আরো কারণ আছে। খুব ছেলেবেলা থেকে সে আকাশ-ছোঁয়া রকমের বড় হওয়ার স্বপ্নই দেখে এসেছে। সেই স্বপ্ন এত প্রত্যক্ষ যে এর প্রতিকূল কোনো বাস্তব সম্ভাবনার সঙ্গে এতটুকু আপোস নেই। মনের তলায় এক বিশাল সাম্রাজ্যই গড়ে বসে আছে। বড় হওয়ার এই তাড়নাটা বাসা বেঁধে আছে অনেক দিনের এক অসহ্য তাচ্ছিল্যের আঘাত থেকে। আর, নিজের সেদিনের ছোট্ট শরীরটার তাজা রক্তের নোনতা স্বাদ থেকে।

...মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে দুঃসহ অপমানের বিকৃত প্রতিশোধের প্ররোচনায় কোনরকম জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনার অবকাশ ছিল না। তারপর শাসনের চাবুকে অপরিণত বয়সের সেই দেহ ঝাঁঝরা হয়েছে। দুই কশ-ঝরা নিজের সেই তাজা রক্তের স্বাদ বাপী তরফদার এ জীবনে ভুলবে না।

সেই থেকেই বড় হওয়ার একটা অফুরন্ত তাগিদ ধমনীর রক্তে টগবগ করে ফুটত সর্বদা। এখনো ফোটে। কত বড় হলে মন ভরে সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। কোনো গণ্ডী বা কোনো সীমানার মধ্যে কুলোয় না সেটা।

বাপী তরফদারের সমূহ সমস্যা রতন বনিকের বউ কমলাকে নিয়ে। তার হাব-ভাব রকম-সকম দ্রুত বদলাচ্ছে। ওকে দেখলেই মনের তলায় অঘটনের ছায়া পড়ে। বাপী তরফদার সরোষে ওটা ছিঁড়েখুঁড়ে মন থেকে সরায়।

মাত্র দিন পাঁচ-ছয় আগের কথা। বিকেলের আগেই রেডিও মারফৎ খবরটা আগুনের গোলার মতো ছড়িয়ে পড়তে শুদ্ধ বাপী তরফদার আর বাইরে টহল না দিয়ে এই খুপরি ঘরে এসে বসেছিল। ও-পাশ থেকে কমলা দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছে। একপিঠ খোলা চুল, ঢিলে-ঢালা বেশ-বাস, উত্তেজনায় দু'চোখ কপালে।—তুমিও খবর শুনেছ তাহলে? তোমাদের ভদ্দলোকদের হল কি গো বড়বাবু, দেশসুদ্ধু মানুষ জানে উনি মানুষ নন্—দেব্‌তা—তাঁকেই গুলি করে মেরে দিলে?

এর কি জবাব দেবে বাপী তরফদার। তার নিজের মাথার মধ্যেই সব তাল গোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

আগ্রহে আর উত্তেজনায় কমলা খাটিয়ার সামনেই মেঝের ওপর বসে পড়েছিল। তার শোনার ইচ্ছে, জানার ইচ্ছে, বোঝার ইচ্ছে। এ-রকম কেন হয়, দেবতার আবার শত্রু থাকে কি করে?

বাপী তরফদার টুকটাক দুই-এক কথায় জবাব দিচ্ছিল। জানতে বুঝতে

এসে কমলা নিজেই বেশি কথা বলছিল। গেল বছর বেলেঘাটায় গিয়ে কমলা নিজের চোখে গান্ধীজীকে দেখে এসেছিল। এখানকার আরো অনেকে গেছিল। নিজের কানে তাঁর কথা শুনেছে, নিজের চোখে তাঁর হাসি দেখেছে—জন্ম সার্থক। আর আজ কিনা এই!

বলতে বলতে কমলা থমকে মুখের দিকে তাকিয়েছে। নিজের অগোচরে বাপী তরফদারের দু'চোখ তার মুখে বুকে ওঠা-নামা করেছে হয়তো দুই একবার। কিন্তু আসলে সে নিজের প্রতি বা কারো প্রতি সচেতন ছিল না একটুও।

গা-ঝাড়া দিয়ে কমলা বসা থেকে সোজা উঠে দাঁড়িয়েছিল আর সঙ্গে সঙ্গে খসা আঁচলটা সজোরে বুকের ওপর দিয়ে পিঠের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। তারপর ছদ্ম ঝাঁঝে বলে উঠেছিল, খুব যে পরের বউকে সামনে বসিয়ে চোখের সাধ মেটানো হচ্ছে—অ্যাঁ?

বলতে বলতে ঘর ছেড়ে চলে গেছল সে। বাপী তরফদার কাঠ।

পরের চার-পাঁচ দিনের মধ্যে কমলার হাবভাব আরো অন্যরকম দেখছে। বাইরে গম্ভীর, কিন্তু চোখে চোখ পড়লে অঘটনের অস্বস্তিকর ছায়াটা আরো ঘন হয়ে উঠেছে। বাপী তরফদার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ স্নান সেরে বেরিয়ে পড়ে। বাইরে দু'বেলার খাওয়া সেরে একেবারে রাতে ফেরে। গতকাল বেরুনোর আগে কমলা এই খুপরিতে এসে হাজির। কালো মুখ পলকা-গম্ভীর, চোখের কোণে কৌতুক চিকচিক।

—আজকাল তোমার কোন্ পার্কে ডিউটি চলছে গো?

—তার মানে? না বুঝেও বিরক্ত।

—মানে আবার কি, রোজ সাড়ে এগারোটা বারোটায় বেরিয়ে রাত নটা পর্যন্ত হন্যে হয়ে তুমি চাকরি খুঁজে বেড়াও সেটা ওই হাঁদা বুড়ো বিশ্বাস করলেও আমি করি না। চাপা হাসি উছলে উঠতে চাইল কিন্তু উঠতে দিল না।—মরুকগে, এদিকে একটা ভালো ছবি হচ্ছে, এখানকার অনেকে দেখেছে; দুকুরের শোয়ের দু'খানা টিকিট কাটতে পারবে? আমি পয়সা দিচ্ছি—

কমলার চোখ এড়িয়ে মাথা নেড়ে বাপী তরফদার বিড়বিড় করে জবাব দিল, আমার সময় হবে না।

এ জবাবের জন্য প্রস্তুতই ছিল কমলা।—ঠিক আছে, টিকিট আমিই কেটে রাখব না হয়…তোমার দেখার সময় হবে?

এবারে ওর চোখের দিকে তাকালো বাপী তরফদার। কমলা ফিক করে

হেসে ফেলল।—তোমার অত ভয় কিসের, কেউ টের পাবে না। ছবি দেখার পর বেরিয়ে এসে আমি তোমাকে চিনতেও পারব না-সোজা ঘরে চলে আসব—

কমলার দু'চোখের কৌতুক সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। জবাব না দিয়ে বাপী তরফদার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

তারপর কাল রাতেই রতন বনিককে এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা বলেছে। আর তাই শুনেই কমলার সকালের এই ঠেস।

কিন্তু সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত আজকের দিনটায় আর কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। অভ্যাসমতো বাপী ঘণ্টাকয়েক আপিসপাড়ায় ঘোরাঘুরি করেছে। সেখানে লালদীঘির মাছ দেখে ঘণ্টা দুই কেটেছে। বিকেলে ময়দানের মাঝখান দিয়ে অন্যদিনের মতোই দক্ষিণে হাঁটা দিয়েছে। ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসের পয়সা কটাও বাঁচে আবার লম্বা হাঁটাও হয়। এই হাঁটারও কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। পা যখন আর চলতে চায় না, ধারেকাছের কোনো একটা পার্ক-টার্ক-এ বেঞ্চিতে নয়তো ঘাসের ওপরে বসে পড়ে। ততক্ষণে শীতের ছোট বেলার শেষ আলোটুকু অন্ধকারের জঠরে চলে যায়।

আজ ক্লান্ত লাগছিল না। বেলা তিনটে নাগাদ ছেলেবেলার বন্ধু নিশীথ সেন এর আপিসে গেছল। সে ভর-পেট জলখাবার খাইয়ে দিয়েছে। সোঁকালয়ের ফুটপাথ ধরে চলতে চলতে নিজের বাসের এলাকা ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে চলেছে। হাজরা পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে গেল একটু। লাইট জ্বালিয়ে প্যাণ্ডেল খাটিয়ে এখানেও গান্ধীজীর শোকসভা চলেছে।

এর পাশেই আর এক দৃশ্য দেখে হাসি পেয়ে গেল বাপী তরফদারের। রেলিং-ঘেঁষা ফুটপাথে গজ দশেক দূরে দূরে কুপী জ্বালিয়ে দু'জন শীর্ণকায় গণৎকার বসে। সামনে ফুটপাথের ওপরেই খড়ির ছক-কাটা। তাদের সামনে একজন করে খদ্দের হাত বাড়িয়ে বসে আছে। এখানেও ভাগ্য গণনা চলছে। এক-আধজন আবার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। বসে পড়বে কি পড়বে না—দোনামনা ভাব।

বাপী তরফদার এগিয়ে চলল। মানুষ কত দূরের ভবিষ্যৎ দেখতে পেলে নিশ্চিন্ত হতে পারে? আসলে এ একটা রোগ। রোগের মতো কিছু। এই রোগে বাপী নিজেও জর্জর। কিন্তু কোনো লোককে সে হাত দেখায় না। ঠিকুজি দেখায় না। সে জানে, দেখালে একটা রূঢ় বাস্তব তাকে হাঁ করে

গিলতে আসবে। কল্পনায় যে সাম্রাজ্যের সে অধীশ্বর, সেটা কোনদিন সত্যের ধারেকাছে ঘেঁষবে এমন ভবিষ্যদ্বাণী কোনো গণৎকার করবে না। বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, রতন বনিকের ভবিষ্যৎ-বচন বরং শুনতে ঢের ভালো লাগে তার।

কিন্তু ঠিক এই এক ব্যাপার থেকেই যে এই দিনটা অন্য সবগুলো গতানুগতিক দিন থেকে এত তফাৎ হয়ে যাবে, তখন পর্যন্ত এ-রকম সম্ভাবনা তার কল্পনার মধ্যেও নেই।

…বড় রাস্তা ছেড়ে ভিতরের একটা মাঝারি রাস্তা ধরে আরো আধ মাইলটাক দক্ষিণে হেঁটে এসেছিল। সামনের মোড়ের মাথায় একটা তিনতলা বাড়ির রাস্তা-ঘেঁষা একতলার ঘরটার দিকে চোখ গেল। বাপী আবারও হেসে উঠল। ওই ঘরেই একজন জ্যোতিষী বসে সে জানে। এই রাস্তায় আরো এসেছে-গেছে। এই একজন বড়লোকের জ্যোতিষী। বড়লোকের ভাগ্য দেখে, ভাগ্য ফেরায়। ঘরের সামনে হু'টো তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে অভিজাত মেয়ে-পুরুষেরা অপেক্ষা করে। ভিতরের খদ্দের বেরিয়ে এলে তবে আর একজনের পালা।

আজও দূর থেকে সেই একই দৃশ্য দেখল। হু'খানা গাড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে। বাইরে হু'জন ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা। বাপী তরফদার হাসছে মৃদু মৃদু, এগিয়ে আসছে। সামনের দরজা দিয়ে ফরাস-ঢাকা চৌকিতে বসা জ্যোতিষীকে দেখা গেল। তার সামনে হুটি অভিজাত মহিলা বসে। পিছন থেকে তাদের পিঠ দেখা যাচ্ছে, মুখ দেখা যাচ্ছে না। জ্যোতিষীর মুখে হুঁকো-গড়গড়ার নল। নলের তামাক টানছে আর নিবিষ্ট মনে দেখছে কিছু।

দরজা ছাড়িয়ে এসে পাশের জানলা দিয়ে ভিতরে তাকাতেই বাপী তরফদার স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডটা লাফালাফি করে বুকের খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। এ কাকে দেখছে বাপী তরফদার? কাদের দেখছে? সত্যি দেখছে না স্বপ্ন কিছু?

সত্যি না হলে গত আটটা বছরের এতগুলো দিন থেকে এই দিনটা- এই রাতটা মুহূর্তের মধ্যে এত তফাৎ হয়ে গেল কি করে? সত্যিই এখানে এত বড় একটা চমক তার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে।

জানালার গরাদ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত দুই চক্ষু মেলে দেখছে। ওই হু'জনই এত বেশি চেনা তার যে দেখামাত্র সর্বাঙ্গের স্নায়ুগুলো এক সঙ্গে টান-টান হয়ে গেল। বয়স্কা মহিলার জমকালো বেশবাস, গলায় কানে হাতে

ঝকমক একরাশ গয়না।···মনোরমা নন্দী। জ্যোতিষীর সামনে কচি পদ্মের মতো দু' হাত মেলে বসে আছে তার মেয়ে মিষ্টি···মালবিকা। ছেড়ে আসা এক জায়গায় সে যেমন বিপুল নয়—বাপী, সেখানে এই মেয়েও তেমনি মালবিকা নয়—মিষ্টি। মিষ্টি মিষ্টি! বাপী অপলক চেয়ে আছে। দশ আর আটে আঠেরো হবে এখন বয়স। দশ বছরের সেই গরবিনী মেয়েটা আঠেরোয় এই হয়েছে!

বাপী তরফদার তাদেরই দেখছে আর তার মা-কে দেখছে এ কি বিশ্বাস করবে?

ভিতরে জোরালো আলো। বাইরেটা সে তুলনায় অন্ধকার। ভিতর থেকে তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

কতক্ষণ কেটেছে জানে না। উঠতে দেখল তাদের। মনোরমা নন্দী হাসছেন। মিষ্টি নন্দীও হাসছে। মনোরমা নন্দী সুন্দর হাতে ব্যাগ খুলে দুটো দশ টাকার নোট জ্যোতিষীর সামনে রাখলেন। ভিতরের কথাবার্তা কানে আসছে না।

নিজের ওপর আর এতটুকু দখল নেই বাপী তরফদারের। তারা বেরিয়ে আসতে সে দু'হাতেব মধ্যে এসে দাঁড়াল।

মনোরমা বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকালেন। পা-জামা পরা খয়ের রঙের গরম আলোয়ান জড়ানো একটা ছেলে হাঁ করে তাঁর মেয়েকে দেখছে। দেখছে না, দুই চোখ দিয়ে গিলছে।

—স্টুপিড! খুব অস্পষ্ট ঝাঁঝে কথাটা বলে মেয়ের হাত ধরে তিনি গাড়িতে উঠলেন। মেয়েটারও বিরক্তি-মাখা লালচে মুখ।

সাদাটে রঙের গাড়িটা চোখের সামনে দিয়ে আরো দক্ষিণে চলল।

পিছন থেকে গাড়িটার নম্বর চোখে পড়ল বাপী তরফদারের। তখনো স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে সে। গাড়ির রক্তবর্ণ সাইডলাইট দুটোও মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ জিভে করে নিজের শুকনো ঠোঁট বার দুই ঘষে নিল বাপী তরফদার। আট বছর আগের সেই অকরুণ আঘাতের চিহ্ন আট দিনেই মিলিয়েছে। কিন্তু নিজের দেহের সেই তাজা রক্তের নোনতা স্বাদ আজও জিভে লেগে আছে।

॥ দুই ॥

'...অন্ন দেইখ্যা দিবা ঘি, পাত্র দেইখ্যা দিবা ঝি'।

শুধু কথা নয়, এক বুড়োর ফ্যাসফেসে গলার টানা স্বরসুদ্ধ হুবহু মনে পড়ে গেল বাপী তরফদারের।

ছেলেবেলা থেকে এ-পর্যন্ত একটিমাত্র গুণের ওপর মস্ত নির্ভর তার। প্রখর স্মরণশক্তি। এই গুণটুকুও না থাকলে হাতের মুঠোয় বি-এস্‌সির ডিগ্রি ধরা দূরে থাক, স্কুলের গণ্ডী পার হতে পারত কিনা সন্দেহ। যা একবার দেখে নেয় তার ছাপ মগজ থেকে আর সরে না। যা একবার শোনে কানে লেগেই থাকে। কিন্তু এই গুণটাকে সে যদি কোনো উপায়ে বিস্মরণের রসাতলে ঠেলে দিতে পারত, দিতই। একটুও দ্বিধা করত না।...অনেক দাহ অনেক যন্ত্রণার শেষ হত তাহলে।

এক ধাক্কায় নটা বছর হুড়হুড় করে পিছনে সরে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে হাফপ্যান্ট আর মোটা ছিট কাপড়ের ফতুয়া-পরা তেরো বছরের এক ছেলে, নাম যার বাপী—সে সেই বনাঞ্চলের সব থেকে শৌখিন রংচঙা কাঠের বাংলোর বাইরের সাজানো ঘরের দরজার পাশে আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে। ভিতরের গদিআঁটা ঝকঝকে বেতের সোফায় বসে মুগা রঙের চোগাচাপকান পরা একজন সাদা দাড়িঅলা মুসলমান ফকির। সাদা দাড়ি নেড়ে নেড়ে অন্ন দেখে ঘি আর পাত্র দেখে ঝি দেবার কথা সে-ই বলছিল।

তার হাঁটুর এক হাতের মধ্যে চামড়া-ঢাকা চেকনাই মোড়ার ওপর মেমসাহেব বসে। অদূরের আর একটা সেটিতে সাহেব—যাঁকে সামনে দেখলে ভয়ে আর সম্ভ্রমে বাপীর বাবা আর বন-এলাকার সমস্ত মানুষের মাথা বুকের দিকে নুয়ে পড়ে। সাদা দাড়ি আর মাথায় সাদা ফেজ টুপী দেখেই অপরিচিত মানুষটাকে মনে মনে ফকির আখ্যা দেয়নি বাপী। সে যখন এসে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়েছে, ওই সাদা দাড়ি তখন সবে মেমসাহেবের হাত ছেড়ে তার ন' বছরের মেয়ে মিষ্টিকে কাছে টেনে নিয়েছে। সোফার হাতলের পাশে এক হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। মিষ্টির পরনে জেল্লা ঠিকরনো বেগনে রঙের ফ্রক। ওই ফ্রকটাতে এত সুন্দর লাগছে মিষ্টিকে যে এক হাতে ওকে ওইভাবে জড়িয়ে ধরে থাকার জন্য বুড়োর ওপর রাগই হচ্ছিল বাপীর। আরো একটু গলা বাড়িয়েছে সে। ওদের পিছনে একটু দূরে আর

একটা সোফায় আবার ভারিক্কি মুখে দীপুদা বসে। ওকে দেখতে পেলেই উঠে এসে মাথায় খট খট করে গাঁট্টা বসাবে। তবু সাবধানে মিষ্টিকে দেখার লোভ সামলে উঠতে পারছিল না বাপী।

…মিষ্টির ডান হাতটা বুড়োর সোফার হাতলে চিৎ করে পাতা। বাঁ হাতটা সামনে মেলে ধরা। ফুটফুটে হাতের ছোট চেটো দুটোতে যেন হালকা গোলাপী রং বোলানো। সেই দুটো হাতের ওপর বুড়ো তার এক হাতের পুরু কাঁচের চাকতিটা ফেলে একমনে দেখা শুরু করতেই বাপী বুঝে নিল লোকটা গণৎকার। ওই কাঁচের জিনিসটা সে চেনে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস না কি বলে ওটাকে। গণৎকার যদি মুসলমান হয় তাকে ফকির ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে বাপী জানে না।

হাতের রেখার ওপর চোখ রেখে বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, বেটীর নাম কি?

লজ্জা-লজ্জা মুখ করে মিষ্টি বলল, মালবিকা নন্দী। জবাব দিয়ে সকৌতুকে ও একবার বুড়োর মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর একবার নিজের হাতের দিকে।

এরপর ভবিষ্যৎ বলা শুরু হল। খাসা মেয়ে। যত বড় হবে আরো খাসা হবে। উদগ্রীব মুখে তার মা আরো সামনে ঝুঁকল। আর বাবা সিগারেট ধরালো।

—খুব বুদ্ধিমতী মাইয়া। অনেক লেখা-পড়া অইব। বি.এ. এম এ. পাশ করবো। না, কোন রকম বড় অসুখ বিসুখ দেখা যায় না, মায়ের কোন ভাবনা নাই, বেটীর শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাইবো।

মেমসাহেবের প্রশ্ন, আর বিয়ে? বিয়ে কেমন হবে দেখুন—

বাইরে থেকে বাপীরও মনে হল মিষ্টির সম্পর্কে এইটেই শুধু জানার মতো কথা, আর সব বাজে।

ওর দুটো হাতের ওপরেই কাচ ফেলে-ফেলে দেখছে বুড়ো। বেশ করে দেখে নিয়ে শেষে শ্লোকের মতো করেই কথা কটা বলল। 'অন্ন দেইখা দিবা ঘি, পাত্র দেইখা দিবা ঝি'—

বাইরে থেকে স্পষ্টই শুনল বাপী কিন্তু অর্থ বুঝল না। মেয়ের বিয়ের মধ্যে আর ঘি ঝি আবার কি ব্যাপার! মাথাটা আবার একটু বাড়িয়ে দিতে হল। মিষ্টিও বড় বড় চোখ করে বুড়োর দিকে চেয়ে আছে।

মিষ্টির মা উদ্বিগ্ন একটু।—তার মানে গণ্ডগোল দেখছেন নাকি? প্রশ্নটা করেই কিছু খেয়াল হল। মেয়েকে বলল, এই মিষ্টি তোর হয়েছে, তুই যা এখন।

মিষ্টি মাথা ঝাঁকালো, দাদা থাকলে আমি থাকব না কেন!

ফলে দাদার প্রতিও মায়ের নির্দেশ, দীপু, তুইও বাইরে যা তো একটু—

শোনামাত্র এদিক থেকে বাপীর ছুট লাগানোর কথা। কিন্তু প্রস্তুত হবার আগেই ছেলের প্রতিবাদ কানে এলো, বা রে, আমারটা তো দেখাই হয়নি এখনো, আমি তাহলে বাড়ি থেকেই চলে যাচ্ছি—

বাপী জানে, মেমসাহেব ছেলের কাছে নরম মেয়ের কাছে গরম। ওমনি ছেলেকে অনুমতি দিল, আচ্ছা তুই থাক। সুর পাল্টে মেয়েকে বলল, মিষ্টি! কতদিন বলেছি না দাদা তোমার থেকে ঢের বড়—যাও, ও-ঘরে গিয়ে বই নিয়ে বোসো—

বাপী এদের সমস্ত খবর রাখে। বাইরের শাসন সাহেবের আর ভিতরের শাসন মেমসাহেবের। বিরস মুখে মিষ্টি দরজার দিকে পা বাড়ালো। এবারে বিপদ হতে পারে বাপী জানে, তবু দরজার আড়াল থেকে সে নড়ল না।

বাইরে পা দিয়ে ওকে দেখেই মিষ্টি থমকালো এক দফা। পরের মুহূর্তে ঘরের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, মা—বাপী পাজিটা এখানে দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে শুনছে সব!

এক লাফে জাহাজ মার্কা কাঠের বাংলো থেকে বাপী মাটিতে এসে পড়ল। খানিকটা নিরাপদ ব্যবধানে ছুটে এসে ঘুরে দাঁড়াল। না, ওর চিৎকার শুনে সাহেব বা মেমসাহেব কেউ বেরিয়ে আসেনি। এসেছে দীপুদা। চোখোচোখি হতে সে হাত তুলে মার দেখালো, তারপর আবার ভিতরে চলে গেল।

বয়সে দীপুদা তিন বছরের বড় হলেও আর সেবারে সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলেও ওই ননীর শরীরে জোর কত বাপীর তাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু সাহেবের ছেলের জোর যাচাইয়ের প্রশ্ন ওঠে না। তাই হাতের নাগালে পড়লে বাপীকে গুঁতো খেতে হয়। সাহেবের ছেলে না হলে ও উল্টে লড়ে দেখতে পারত। ছুটে দীপুদা তার নাগাল পায় না কখনো, সে-চেষ্টা করলে জিভ বার-করা কুকুরের হাল হয়।

দীপুদা ঘরে ঢুকে যাওয়ার পরেও ফ্রক পরা মিষ্টি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে আর ওকেই দেখছে। এ রকম একটা সুযোগ বাপী ছাড়তে পারে না। যতটা সম্ভব দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল। তারপর হাত দুটোও দুপাশে টান করে দিল। শেষে মুখটা বিকৃত-কুৎসিত করে আর দু' আঙুল জিভ বার করে ভেঙচি কেটে দাঁড়িয়ে রইল।

ফল যেমন আশা করেছিল তেমনি। রাগের মাথায় ও-দিকের কাঠের বারান্দা থেকে মিষ্টিও চোখের পলকে ঠিক ওই রকম পা ফাঁক করে হাত

দু'দিকে ছড়িয়ে আর জিভ বার করে ভেঙচি কেটে পাল্টা জবাব দিল। তারপরেই তারস্বরে আবার চিৎকার, ও মা! দেখে যাও বাপী পাজিটা আমাকে কি বিচ্ছিরি করে ভেঙাচ্ছে!

আর দাঁড়ানো নিরাপদ নয়। মেয়ের ডাকে ওই মেমসাহেব বাইরে এসে আঙুল তুলে ডাকলেই বাপীকে কাচপোকার মতো কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়িয়ে কানমলা বা চড় খেয়ে আসতে হবে। চড় অবশ্য এখন পর্যন্ত খেতে হয়নি, কিন্তু কানে দুই-একবার হাত পড়েছে। আর চড়িয়ে গাল লাল করে দেবার শাসানি শুনতে হয়েছে। এ-সব নির্যাতন ওই সোহাগী মেয়ের নালিশের ফল। নইলে দরকার পড়লে মেমসাহেব ওকে ডেকে ফাইফরমাস তো বেশ করে। আর, একটু সুনজরের আশায় বাপীও তার কোনো কাজ করতে পেলে বর্তে যায়।

সোহাগী মেয়ের চিৎকার শেষ হবার আগেই বাপী রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে সেঁধিয়েছে। তারপর জঙ্গলের ভিতর দিয়েই হাসতে হাসতে ঘরমুখো হয়েছে।

মাথায় ফকিরের কথাগুলো ঘুর-পাক খেতে লাগল। যা বলল তার অর্থ কি হতে পারে? ঘরে গিয়ে পিসীকে জিজ্ঞেস করতে হবে। পিসীর কথা-বার্তার মধ্যেও বাঙালের টান আছে, বিশেষ করে বাবার সঙ্গে যখন কথা বলে। আর ওই ফকিরের মতো অনেক রকমের ছড়া-পাঁচালি কাটে পিসী।

বাপীর যা-কিছু আদর আব্দার সব পিসীর কাছে। ঘরে মা নেই। মা-কে সে-রকম মনেও পড়ে না। চিন্তা করলে মায়ের একটা কাঠামো শুধু মনে আসে। আরো সাত বছর আগে অর্থাৎ বাপীর ছ'বছর বয়সের সময় এখানকার হাসপাতাল থেকে মা-কে শহরের বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে মা আর এই বানারজুলিতে ফিরে আসেনি। পিসী তার আগে থেকেই এখানে ছিল। একদিন বিকেলের দিকে তাকে মেঝেতে আছড়ে পড়ে কাঁদতে দেখেছিল। আর বাবাকে মুখ কালি করে ঘরের কোণে বসে থাকতে দেখেছিল। তারপর জেনেছে মা বড় হাসপাতাল থেকেই সগ্গে চলে গেছে। এই তেরো বছরের জীবনে তারপর মায়ের জন্য হাহুতাশ করার সময় খুব একটা মেলেনি।

ঘরে ঢুকে পিসীকে বলল, সাহেব বাংলোয় মস্ত এক ফকির এসেছে কোথা থেকে, সকলের হাত দেখছে—

হাত দেখা ফকিরের কথা শুনে পিসীর জিভে জল গড়ালো।—বলিস কি

রে! কে ফকির? কোথাকার ফকির? তুই নিজের হাতটা একবার দেখিয়ে এলি না কেন?

বিরক্তিভরে শেষের প্রশ্নটারই জবাব দিল, কি যে বলো ঠিক নেই, সাহেব মেমসাহেব তাদের ঘরে বসে হাত দেখাচ্ছে সেখানে নিজের হাত বাড়াতে গেলে আস্ত থাকত—ছুমড়ে ভেঙে দিত না!

এ-রকম কথা শুনলে পিসীর রাগ হয়ে যায়।—কেন, ভেঙে দেবে কেন শুনি? ওদের ভবিষ্যৎ আছে তোর নেই—তুই কি বানের জলে ভেসে এসেছিস নাকি!

পিসী আবার বাবার ঠিক উল্টো। বাবা সাহেব মেমসাহেবের নাম শুনলে কাঁপে। পিসী জ্বলে। পিসীর রাগের কারণও বাপী নিজেই। তার কাছে ও দুধের ছেলে। সাহেবের ছেলে ভাইপোর গায়ে যখন-তখন হাত তোলে, আর মা-ও ভালো ব্যবহার করে না, ধমক-ধামক করে, কানে হাত দেয় পর্যন্ত—এ পিসী বরদাস্ত করতে পারে না। দাঁত কড়মড় করে বাপীকেই ঠেঙাতে আসে, তুই নোলা বার করে যাস কেন ও-দিকে বেহায়ার মতো—এত হেনস্তার পর লজ্জা করে না ও-মুখো হতে?

বাপীর লজ্জা করে না। দীপুদা তার বাবা-মা, এমন কি ওই মিষ্টিটার ওপরে পর্যন্ত কি-রকম একটা আক্রোশ তারও বুকের তলায় জমাট বেঁধে আছে। তবু যায়। না গিয়ে পারে না। বিকেলে বা ছুটির দিনে একটা অদৃশ্য কিছু তাকে ওই বাংলোর দিকে টেনে নিয়ে যায়। ওই বাংলোটা তার চোখে রূপকথার নিষেধের এলাকার মতো। নিষেধ বলেই ওদিকে হানা দেবার লোভ।

পিসীর সামনে গ্যাঁট হয়ে বসল বাপী।—বাজে কথা ছাড়ো—অন্ন দেইখা দিবা ঘি, পাত্র দেইখা দিবা ঝি—মানেটা কি চটপট বলে দাও দেখি?

হঠাৎ এই বচন শুনে পিসী হাঁ প্রথম।—কে বলেছে?

—ওই ফকির।

—কাকে বলেছে?

—মিষ্টির হাত দেখে তার মা-কে বলেছে।

পিসী মিষ্টিকে চেনে। মেমসাহেবকে লুকিয়ে ও বাপীর সঙ্গেই দু'দিন এখানে এসেছে। পিসী ওকে আদর করে নারকেলের নাড়ু আর মুড়ির মোয়া খাইয়েছে।

হাসিমুখে পিসী ভাইপোকে ছড়ার অর্থ বুঝিয়ে দিল। শুনে বাপী চিন্তিত

হওয়া দূরে থাক উল্টে খুশি হল। ঢাক-ঢোল-শানাই বাজিয়ে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেই হল? হোক গণ্ডগোল—গণ্ডগোলটা যত বেশি হয় বাপী ততো খুশি হবে। ওই হাবা মেয়ে কিস্সু বোঝেনি। বুঝবে কি করে, তাকে তো ঘর থেকে সরিয়েই দেওয়া হয়েছিল। পিসীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হলে নিজের মা ওকে ঘর থেকে সরাবে কেন! মিষ্টিটাকে এবারে হাতের নাগালে পেলে হয়—

ডাকলে মিষ্টি যে ওর ধারেকাছে আসতে চায় না সেই দোষটা বাপীর নিজেরই। মেয়েটাকে দেখলেই মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি চাপে। অবস্থার ফারাকটা ওরা যদি এত বড় করে না দেখত তাহলে বোধ হয় এতটা হত না। মেয়েটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা অজ্ঞাত লোভ মনের তলায় উকিঝুঁকি দেয়। ঝাঁকড়া আধা-কোঁকড়ানো চুলের সামনে ফর্সা টুলটুলে মুখখানা দেখে মনে হয় ছোট্ট মিশকালো একটা ঝোপের মধ্যে সুন্দর একখানা বড়ো ফুল বসানো।

একা পেলেই ডেকে বসত, এই মিষ্টি, শোন্—

মিষ্টি কাছে আসত।—কেন?

—তোকে আমি খেয়ে ফেলব। তারপর আরাম করে এক গেলাস জল খাব।

এরপর আর রাগ না করে থাকতে পারে কোন্ মেয়ে। কাছে আসুক না আসুক, দেখা পেলেই বাপীর ওই কথা।—মিষ্টি, তোকে আমি খেয়ে নেব—দূরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কাছে এলে খেয়ে নেব বলে?

মিষ্টি এই নিয়ে তার দাদার কাছে আর মায়ের কাছে নালিশ করেছে। দীপুদা এই অপরাধে ওর মাথায় কম গাঁট্টা মারেনি। আর এই অপরাধেই মেমসাহেবের হাতে কানমলা খেয়েছে। তার ফলে দেখা হলে দূর থেকে আরো বেশি করে এই কথা বলে ছুটে পালিয়েছে। এরপর বাবার কাছে সাহেব বা মেমসাহেব কে তড়পেছে বাপী আজও জানে না। বাবা একদিন আপিস থেকে ঘরে ফিরেই ওকে ধরে বেদম ঠেঙানি। কি দোষে মার খাচ্ছে, পিসীর বা ওর তাও বুঝতে সময় লেগেছে। এই মারের ফলেই পিসীর সঙ্গে বাবার ঝগড়া বেঁধে গেছে। দোষটা তখন বোঝা গেছে। বাবা বলেছে, সাহেবের মেয়েটাকে দেখলেই মিষ্টি খাবে, মিষ্টি খাবে বলে চেঁচায়—আজ ওকে আমি শেষ মিষ্টি খাওয়াচ্ছি।

বাবার ওপরে রাগ করেই পিসী গুমগুম করে ওর পিঠে আরো কটা কিল বসিয়ে দিয়েছে।—সাহেবের গরিব কেরানীর ছেলে হয়ে তোর এত লোভ—পা চাটতে পারিস না?

এরকম বিপাকে পড়ার ফলেই মিষ্টিকে দেখলে বাপী এখন আর গলার আওয়াজে জানান দিয়ে একথা বলে না। কিন্তু মনে মনে ঠিক বলে। আগের থেকে আরো বেশি বলে। আর সেটা ওই মেয়ে ঠিক বুঝতে পারে। কিন্তু কানে না শুনলে নালিশ করতে পারে না বলেই বাপীর ওপর আরো বেশি রাগ তার।

দাদাকে বলেওছে ক'দিন, ও মনে মনে ঠিক আমাকে খাবার কথা বলছে, ঠোঁট নড়ছে দেখছ না—ধরে দাও না দু'ঘা!

কিন্তু দীপুদা, যখন দেখে তখন আর বাপীর ঠোঁট নড়ে না। বোনের রাগের কথায় সে অতটা অবুঝ হতে পারে না। তবু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে নেয়, মনে মনে বলছিস?

যতটা সম্ভব মুখখানা নিরীহ করে তুলে বাপী মাথা নাড়ে। বলছে না।

দুপুরটা কোনরকমে কাটিয়ে জংলা পথ ধরে আবার সোজা বাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল। বিকেলে মিষ্টি বাংলো ছেড়ে বেরুবেই জানা কথা। নিজেদের বাগানে ছোটাছুটি করে, আবার সামনের পাকা রাস্তা ধরে বেড়ায়ও। ফাঁক পেলে মেয়েটার জঙ্গলে ঢুকে পড়ারও লোভ খুব। কিন্তু একলা ঢুকতে সাহস পায় না। বাপীর তোয়াজ তোষামোদে মেজাজ ভালো থাকলে মা-কে লুকিয়ে তার সঙ্গেই মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ে। ইদানীং বাপীরও তোষামোদের মেজাজ নয় বলে সেটা বন্ধ আছে। এমন কি মিষ্টি ওকে দেখলে বাগান ছেড়ে বাইরেই আসতে চায় না।

চুলবুলে মেয়ে ঘরে কতক্ষণ আর থাকবে। একটু বাদেই কাঠের বাংলোর বারান্দায় দেখা গেল ওকে। তারপর থমকেও দাঁড়াল। অর্থাৎ ওরও চোখ এই দিকে।

একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল বাপী। কেউ নেই। গেট-এর সামনে এসে হাত তুলে ইশারায় কাছে ডাকল।

মিষ্টি দাঁড়িয়ে রইল। অপলক চোখ। রাগ-রাগ মুখ। বাপী বুঝে নিল সকালে যেভাবে ওকে ভেংচি কাটা হয়েছে, সহজে আসতে চাইবে না। খুব মোলায়েম গলায় ডাকল, মালবিকা, একটা কথা শুনে যা, খুব মজার কথা—

মালবিকা বলে ডাকার মানে ওকে বোঝাতে চায় মনে মনেও সে এখন মিষ্টিকে খেয়ে ফেলার কথা ভাবছে না। কিন্তু মেয়েও ত্যাঁদড় কম নয়।—ফের তুই-তুকারি করে কথা! মা-কে ডাকব?

বাপীর ইচ্ছে হল ছুই চড়ে ফোলা-ফোলা লালচে গালে দশ আঙুলের দাগ বসিয়ে দেয়। তার বদলে দু হাত জোড় করে ফেলে বলল, ঠিক আছে আর তুই-তুকারি করব না, কিন্তু একবার এলে খুব মজার কথা বলতাম, সকালের সেই গণৎকারের কথা—পিসীমার কাছে চুপিচুপি জিগগেস করে জেনে নিয়েছি!

বাংলো ছেড়ে বাইরে আসার লোভ একটু একটু হচ্ছে বোঝা যায়। তবু মাথা নাড়ল, মা তোমাদের সঙ্গে মিশতে বারণ করে দিয়েছে।

এ-কথা মিষ্টি আগেও বলেছে। শুনলেই রাগে ভিতরে ভিতরে গজরাতে থাকে বাপী। কিন্তু এত শুনেছে বলেই কানে তোলার মতো নয়। সাদা-মাটা মুখ করে বলল, ঠিক আছে, শুনতে হবে না তাহলে…জঙ্গলের মধ্যে মস্ত একটা মৌচাকও দেখাব ভাবছিলাম। আবু বলছিল, শিগগীরই মওকা বুঝে এক রাত্তিরে ওটা পেড়ে ফেলবে—অনেক মধু হবে। তুই তোর মায়ের আঁচলের তলায় বসে থাকগে যা।

গেট ছেড়ে রাস্তায় এ-ধারে চলে এলো বাপী।

লোভ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ছে মিষ্টির। এই পাজীটার সঙ্গে জঙ্গলে বেড়াতে ওর ভালই লাগে। বাবার সঙ্গে বা বাবার লোকের সঙ্গে ও আর দাদা জঙ্গলে ঘুরেছে। হাতীর পিঠে চেপেও ঘুরেছে। কিন্তু সে আর এক রকমের ঘোরা। বাপীর সঙ্গে ঘুরতে অন্য রকমের মজা। বাপী হাত ধরে টানাটানি করলেও মিষ্টি ঘন জঙ্গলে ঢোকে না অবশ্য। এমনিতেই গা ছমছম করে। দাদাও ভীতু, একলা বেশি দূর যায় না। কিন্তু বাপীর ভয়ডরের লেশ-মাত্র নেই। যেখানে বাঘ ভালুক চিতা থাকে, আবুর সঙ্গে ও নাকি সে-সব জায়গাও চষে বেড়িয়েছে। আর ঢিল নিয়ে বুনো মোরগ খরগোস বেঁজী সজারু তাড়া করতে মিষ্টি নিজের চোখেই দেখেছে। ছমছমানি ভাব কেটে গিয়ে তখন সত্যিকারের মজা।

রাস্তার ওদিকে চলে গেল দেখে মিষ্টির আর বাংলোয় দাঁড়িয়ে থাকা হল না। পায়ে পায়ে নেমে গেট-এর কাছে এসে চোখ বেঁকিয়ে দেখে নিল সত্যি চলে যাচ্ছে কিনা। তারপর অনেকটা নিজের মনেই কথা ছুঁড়ে দিল, হুঁঃ মৌচাক দেখতে যাই আর বোলতা এসে কামড়ে দিক।

বোলতার বদলে বাপীর নিজেরই ওই ফোলা গালে কামড় বসাতে ইচ্ছে করছিল। বলল, বোলতা আর মৌমাছির তফাৎ জানিস না—তোকে দেখতে হবে না। ঢিল না ছুঁড়লে মৌমাছি চাক ছেড়ে নড়ে?

—আবু চাক ভাঙবে কি করে, তখন কামড়াবে না ?

—ম্নাতে ধোঁয়া দিয়ে ভাঙবে। জঙ্গল সাহেবের মেয়ের কত সাহস আবুকে বলে আসিগে যাই।

ওই একজনকে জঙ্গলের দেবতা বা অপদেবতা ভাবে মিষ্টি। আবু রব্বানীকে এ তল্লাটের মানুষ ছেড়ে জঙ্গলের সমস্ত জীব-জন্তুগুলোও চেনে বোধ হয়। জঙ্গলের খবর ওর থেকে বেশি কেউ রাখে কিনা সন্দেহ। এই জন্যে মিষ্টির বাবাও ওকে পছন্দ করে। আবুর বাবা এ জঙ্গলের হেড-বীটম্যান। ওর ছেলে আবুকে বাবা শিগ্গীরই বীটম্যান করে দেবে শুনেছে মিষ্টি। ওই আবু একসময় দাদার দু ক্লাস ওপরে পড়ত নাকি। বছর-বছর ফেল করার ফলে পাঁচ বছরের ছোট বাপী ওকে ধরেছিল। আর সেই বছরেই আবু ঘেন্নায় ইস্কুল ছেড়েছে। বয়সে দাদার থেকে মাত্র দু'বছরের বড়। বেশি হলে উনিশ। এরই মধ্যে শুধু পাথর ছুঁড়ে আর লাঠি পেটা করে কত রকমের জীব মেরেছে ঠিক নেই। এই সেদিনও পেল্লায় এক বিষধর সাপ মেরে মিষ্টির বাবাকে দেখাতে এনে খুব বকুনি খেয়েছিল। সাপ ইঁদুর খায়। ইঁদুর বনের ক্ষতি করে। তাই বেশি সাপ মারলে বনের ক্ষতি। বাবা বকুক আর যা-ই করুক, ওর বুকের পাটা আছে অস্বীকার করতে পারে নি। কেউ পারে না। জঙ্গলের ব্যাপারে তার আলাদা মর্যাদা।

বাপীকে নিয়ে আবুর সঙ্গেও মিষ্টি চুপি চুপি জঙ্গলে কম বেড়ায়নি। ছুটির দিনের দুপুরে বাবা-মা ঘুমোয়, দাদা শহরে যায়। ফাঁক বুঝে বাপীও এসে মিষ্টিকে ডেকে নিয়ে যায়। বাবা মা ওকে না দেখতে পেলেও ভাবে কাছাকাছি আছে কোথাও। আবু সঙ্গে থাকলে আর হাতে সময় থাকলে মিষ্টি ওদের সঙ্গে একটু ঘন জঙ্গলে ঢুকতেও ডরায় না। এই আবুর কাছে মিষ্টির ভীরু অপবাদ কাম্য নয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেট খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতে হল। মেয়ে ভাঙবে তবু মচকাবে না। ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, আবুকে বললে বয়েই গেল। বাবাকে বলে দেব আবু জঙ্গলের ক্ষতি করছে, ওকে যেন বীট-ম্যান না করে।

বাপীর ধৈর্য কমছে, তাই রাগ বাড়ছে।—কি ? আবুর নামে নালিশ করবি তুই ?

—ফের তুই ?···তুমিই বা আমার নামে ওকে বলতে যাবে কেন ? বোল্তার চাক কত দূর ?

একবার শুধরে দেবার পরেও ফের আবার বোলতাই বলল। বাপীর

মনে ওকে নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার তাড়না।—খুব কাছে।…আচ্ছা, আবুকে কিছু বলব না।

কিন্তু মিষ্টি অত সহজে ভোলবার পাত্রী নয়।—মজার কথা কি বলবে বলছিলে?

টোপটা আরো একটু রহস্যজনক করে তোলার সুযোগ পেল বাপী। মুখে হাসি টেনে বলল, সকালে গণৎকারের সঙ্গে তোর বিয়ের কথা বলার সময় তোর মা তোকে ঘর থেকে সরিয়ে দিল কেন সে-তো বুঝতেও পারিসনি বোকা মেয়ে! আয়, বলছি—

এবারে আর 'তুই' বলার জন্য ফোঁস-ফোঁস করে সময় নষ্ট করতে চাইল না মিষ্টি। আসলে মা বলেছিল বলেই, নইলে তুই-তুমির তফাৎ খুব একটা কানে লাগে না। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাংলোর দিকটা দেখে নিল একবার। কেউ নেই। রাস্তা পেরিয়ে কাছে এলো।…বিয়ের কথা মানেই মজার কথা আর ভালো কথা, কিন্তু মা হুট্ করে ওকে ঘর থেকে চলে যেতে বলেছিল কেন সত্যিই মাথায় ঢোকে নি।

—বলো।

—আগে এদিকে আয়। কাছে পাওয়া-মাত্র ওর একখানা হাতের ওপর দখল নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। তারপরেও হাত ছেড়ে দিল না। মিষ্টির সুন্দর ছোট হাত নিজের হাতে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করতে বা চাপাচাপি করতে ভালো লাগে।

—সকালের ওই গণৎকার কোত্থেকে এলো রে?

—বাবা শিলিগুড়ি থেকে আনিয়েছে। অনেক জানে।

—কি নাম?

—পীর বক্স্।

—তার মানে এক বাক্স পীর!

না বুঝে মিষ্টি বোকার মতো তাকালো তার দিকে।

বাপী বলল, বি-ও-এক্স বক্স মানে বাক্স না?

—তোমার মুণ্ডু, তুমি এই-সব বজ্জাতি করার জন্য আমাকে ডেকে এনেছ! হাত ছাড়বার চেষ্টা।

—না রে না—তোর বিয়ের কথায় বুড়ো সেই ছড়াখানা কি বলেছিল মনে আছে?

একটা কি বলেছিল মিষ্টির মনে পড়ছে। চেষ্টা সত্ত্বেও কথাগুলো মনে

পড়ল না। মাথা নাড়ল, মনে নেই।

'অন্ন দেইখা দিবা ঘি, পাত্র দেইখা দিবা ঝি'! বাপী হেসে উঠল।

মনে পড়ল। বুড়ো গণৎকার এই কথাগুলোই বলেছিল বটে। বড় বড় চোখ করে মিষ্টি ওর দিকে মাথা বেঁকিয়ে তাকালো।—তার মানে কি?

—'অ' আর 'নয়-নয়' অন্ন মানে ভাত তো?

মিষ্টি মাথা নাড়ল। তাই।

—পচা গন্ধ-অলা চালের ভাতে ভালো ঘি ঢাললেও খেতে স্বাদ ভালো হয়?

এবারে একটু ভেবে-চিন্তে মাথা নাড়ল মিষ্টি। হয় না বটে।

—আর পাত্র মানে হল ছেলে, যে-ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। আর ঝি মানে হল মেয়ে—যে-মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে।

মিষ্টি ফোঁস করে উঠল, ঝি মানে কখ্খনো মেয়ে নয়।

বাপী তেমনি জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ মেয়ে। পিসীর কাছে শুনে আমি ডিকশনারি দেখে নিয়েছি, বিশ্বাস না হয় তুইও দেখে নিস। ঝি মানে ঝিও হয় আবার মেয়েও হয়।

এ-কথা শুনে মিষ্টি দমে গেল একটু। বলল, ঝি মানে মেয়ে হলেই বা মা আমাকে ঘর থেকে যেতে বলবে কেন?

—তোর বিয়ে নিয়ে হাঙ্গামা আছে বলে। বাপী গম্ভীর!—পচা চালের মতো একটা বাজে ছেলের হাতে পড়বি তুই।

—কখ্খনো না। পীর সাহেব তো বলেছে, আমার অনেক লেখা-পড়া হবে, চেহারা আরো ঢের সুন্দর হবে, অসুখ করবে না, শরীর ভালো থাকবে—তাহলে খারাপ ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে কেন?

অনেক-জানার মতো মুখ করে বাপী হাসতে লাগল। বলল, ওই জন্যেই তো এই শোলকটারে! তোর পীরসাহেব বলেছে, যত ভালো মেয়েই হোক, সে-রকম ভালো ছেলের সঙ্গে যদি বিয়ে দিতে না পারো তাহলে পচা চালে ভালো ঘি ঢালার মতো হবে সেটা। বুঝলি?

বুঝেও গোঁ-ভরে মিষ্টি বলল, বাবা ঠিক দেখেশুনে ভালো ছেলের সঙ্গেই বিয়ে দেবে আমার—

বাপীর মুখের হাসি আরো প্রশস্ত হল।—তুই আচ্ছা বোকা, তোর বাবাও কি গণৎকার নাকি যে আগে থেকেই ছেলের সব জেনে ফেলবে! ভয় না থাকলে পীরসাহেবের মতো এত বড় গণৎকার এ-কথা বলবে কেন, আর তোর

মা-ই বা তোকে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে সরিয়ে দিতে চাইবে কেন! পরিতুষ্ট বাপী ওর হাতে বড়সড় চাপ দিল একটা। অকাট্য যুক্তির মুখে পড়ে মিষ্টি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বেশ রাগ হচ্ছে। একে হাসছে তায় হাতের ওপর হামলা।

—বোতলার চাক কই?

বাপী থতমত খেল একটু। চারদিকে তাকালো একবার।—কোন্ গাছটায় দেখেছিলাম ঠিক মনে পড়ছে না···একটু খুঁজলেই পেয়ে যাব।

এক ঝটকায় মিষ্টি নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল।—মিথ্যেবাদী, মিথ্যেবাদী! সঙ্গে সঙ্গে যে-দিক থেকে এসেছে সেইদিকে ছুট্।

মৌচাক জঙ্গলের কোথাও না কোথাও আছেই। একটা ছেড়ে অনেক আছে। কিন্তু একটাও দেখে রাখা হয়নি বলে বাপী মনে মনে পস্তালো একটু। ছুটে গিয়ে আবার ওকে চেপেচুপে ধরার লোভ। কিন্তু ধরতে পারলেও আজ আর ফেরানো যাবে না।···ওর ফুটফুটে নরম-গরম হাতটা এতক্ষণ নিজের হাতের মধ্যে ছিল, বেশ লাগছিল।

হৃষ্ট মুখেই বাপী এবার আর একজনের সন্ধানে চলল। বয়সে ছ বছরের তফাৎ হলেও এখানে প্রাণের দোসর একজনই।

আবু রব্বানী।

ওই রব্বানীর সে একনিষ্ঠ ভক্ত বললেও বেশি বলা হবে না। তার একান্ত কাছে থাকার ফলে বাপীর ইদানীং কত দিকে জ্ঞান বাড়ছে তা নিজেই অনুভব করতে পারে। বাপীর বিবেচনায় আবুর মতো মরদ তামাম বানারজুলিতে আর দুটি নেই। আবুরও ওর ওপর অকৃত্রিম স্নেহ। তার কারণ আছে। বীট্ম্যান হবার আশায় বানারজুলির এত বড় রিজার্ভ ফরেস্টের স্থানীয় সর্বেসর্বা রেঞ্জ অফিসারের মেমসাহেবটিকে আবু নানানভাবে তোয়াজ তোষামোদ করে চলেছে বটে। ঝুড়ি ভরতি ফিকে পীত রঙা শাল ফুল অথবা টকটকে লাল পলাশ দিয়ে আসে, আম জাম জামরুল পেয়ারা খেজুর নিয়ে যায়, বুনো মুরগী বা খরগোশ মারতে পারলে মেমসাহেবকে ভেট দিতে ছোটে। কিন্তু চাকরিটা একবার হয়ে গেলে ওর সমূহ মনিব কেরানীবাবু অর্থাৎ বাপীর বাবা হরিবাবু। তাই বাপীর সঙ্গে খাতির রাখাটা তার দরকারও বটে। কিন্তু আবুর অকৃত্রিম স্নেহটাই বড় করে দেখে বাপী।

—আরো খো গো—আল্লার খবর মোল্লায় রাখে!

বাপীর মুখে গণৎকার পীর বক্স্-এর সমাচার শুনে বাঙাল টান দিয়ে ওই

মন্তব্য করেছিল আবু রব্বানী। বিশেষ করে মিষ্টির বি-এ এম-এ পাশ করে মস্ত বিদুষী হওয়ার সম্ভাবনাটা এক ফুয়ে বাতিল করে দিয়েছিল সে। বলেছে, বি-এ এম-এ দূরে থাক, ওই মেয়েকে ম্যাট্রিকও পাস করতে হচ্ছে না বলে দিলাম।

আবু নিজে অনেক বছরের চেষ্টায় ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনে প্রমোশন না পেয়ে পড়া ছেড়েছে একথা একবারও মনে হল না বাপীর। সত্যিকারের বিস্ময় নিয়ে শুধিয়েছে, কেন বলো তো—মেয়েটা তো ওদের ক্লাসে ফার্স্ট হয়।

—ফার্স্ট হোক আর লাস্ট হোক, এই পীর যা বলে শুনে রাখ্।

শুনে রাখার মতোই কথা বটে। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু বেশি পড়াশুনা কেন হবে না বলো না?

আবুর মুখে সবজান্তা হাসি।—তোর কোনো বুদ্ধি যদি থাকত! এই বয়েসেই চেহারাখানা দেখছিস না মেয়েটার, ষোল-সতের বছরের ডবকা বয়সে এই মেয়ের চেহারাখানা কি রকম হতে পারে চোখ বুজে ভেবে দেখ দিকি? ভেবেছিস? ভালো করে ভাব—

বাপী সঠিক ভেবে উঠতে পারল না। তবে একটা সম্ভাব্য আদল চোখে ভাসল বটে। কিন্তু কি বলতে চায় বোঝেনি তখনো। মাথা নাড়ল। ভেবেছে।

আবু এবার ব্যাখ্যা শোনালো। সেই বয়সে কোনো না কোনো বড়-লোকের ছেলের চোখ পড়বেই ওর ওপর। বিয়ে করে ঘরে এনে পুরবে, তারপর লুটেপুটে শেষ করবে। বি-এ এম-এ পাশ করার ফুরসৎ মিলবে কোত্থেকে?

হাঁ করে বাপী আবুর মুখখানাই দেখছিল। মগজে এত বুদ্ধিও ধরে ও!

রাস্তার পাশে জ্যোতিষীর জানালা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওই মা মেয়েকে অপলক চোখেই দেখে নিয়েছিল বাপী তরফদার। তারপর শুধু মেয়েকেই চেয়ে চেয়ে দেখেছে। ওই মা পাশে না থাকলে হঠাৎ দেখে চিনতে পারত কিনা সন্দেহ। জ্যোতিষীর সামনে মিষ্টি টান হয়ে বসে ছিল। ডান পা-টা পিছনে মোড়া। জ্যোতিষীর দিকেই চেয়ে ছিল সে।

জানলা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে স্থানকাল ভুলে বাপী তরফদার ওকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখেছে। মাথা…কপাল…নাক কান চোখ মুখ… গলা… কাঁধ বুক।

এক পা পিছনে মুড়ে বসার ভঙ্গী…বুক থেকে কোমরের নীচে পর্যন্ত ঈষৎ স্থির যৌবনরেখা…একটু নড়লে-চড়লে সেই রেখাগুলোও নড়া-চড়া করেছে।

নিজের অগোচরে মনে মনে একটা হিসেব সেরে নিয়েছে বাপী তরফদার। আবু রব্বানীর সেই ভবিষ্যদ্বাণী এখন পর্যন্ত ঠিক হয়নি। ঠিক ন' বছর আগের কথা…মিষ্টির বয়েস এখন আঠারো। কিন্তু এখন পর্যন্ত কপালে বা সিঁথিতে সিঁদুরের আঁচড় নেই।

গাল ছুটো আগের মতো ফোলা-ফোলা নয়। মেদ-ঝরা টানা মুখ। আগের তুলনায় আরো আয়ত চোখ। গায়ের রঙও আগের থেকে ঢের বদলেছে, অনেক কম ফর্সা মনে হয়। কিন্তু এই রঙের মধ্যে আদুরে ভাব থেকে তাজা ভাব বেশি।

নির্নিমেষে দেখছিল বাপী তরফদার। তার এই দেখাটা বাইরের প্রতীক্ষারত অন্য মেয়ে-পুরুষদের চোখে বিসদৃশ লাগছিল সে হুঁশ নেই। মা-মেয়ে যখন উঠেছে, বাপী তরফদার আত্মস্থ নয় তখনো। অনাবৃত অপলক ছু চোখ মিষ্টির সর্বাঙ্গে ওঠা-নামা করেছে। তারা বেরিয়ে আসতে বাপী তাদের ছু'হাতের মধ্যে এসে মা-কে ছেড়ে মেয়েকেই দেখেছে। দেখেনি, ছুই চোখের বাঁধনে তাকে আটকে রাখতে চেয়েছে। চিনতে পারার কথা নয়, ছুজনের কেউই চিনতে পারেনি। অস্ফুট ঝাঁজে 'স্টুপিড' বলে মেয়ের হাত ধরে মা গাড়িতে উঠেছে। মেয়েরও বিরক্তিমাখা লালচে মুখ। মৃদু শব্দ তুলে সাদাটে গাড়িটা চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। পিছনের লাল আলোয় গাড়ির নম্বরের ওপর চোখ আটকেছে বাপী তরফদারের।

সেই দিকে চেয়ে ন বছর নয়, নিজের অগোচরে আটটা বছর পিছনে পাড়ি দিয়েছে বাপী তরফদার।…ওর বয়েস যখন চৌদ্দ।…মিষ্টির দশ।

হঠাৎ জিভে করে নিজের শুকনো ছুই ঠোঁট ঘষে নিল বাপী তরফদার। আট বছর আগের সেই আঘাতের চিহ্ন নেই—কিন্তু জিভে নিজের দেহের সেই তাজা রক্তের নোনতা স্বাদ!…এক মেয়েকে কেন্দ্র করে আট বছর আগে অপরিণত বয়সের ছেলের সেই প্রবৃত্তির আগুন বাইশ বছরের এই দেহের শিরায় শিরায় হঠাৎ দাউ দাউ করে জলে উঠল আবার।

আবছা অন্ধকার শূন্য পথের দিকে চেয়ে ছু চোখ ধক্‌ধক্‌ করছে প্রবৃত্তির ক্রূর আদিম অভিলাষ।

॥ তিন ॥

শীতের রাত বাড়ছে। পথে লোক চলাচল নেই বললেই চলে। বাপী ঠায় দাঁড়িয়ে। গায়ে শার্টের ওপর শুধু একটা আলোয়ান। কাঁপুনি ধরার কথা। কিন্তু ভিতর থেকে একটা উষ্ণ তাপের ওঠা-নামা চলেছে তখনো। একেবারে বুকের পাতাল থেকে। বাইরের ঠাণ্ডা চামড়ায় বিঁধলেও টের পাচ্ছে না। বাইরের জানলা দিয়ে দু চোখের এক-একটা উষ্ণ ঝাপটায় জ্যোতিষীর সামনে বসা শেষ লোকটাকে তুলে দিতে চাইছে।

জ্যোতিষীর অপেক্ষায় বাইরে তখন একমাত্র বাপী তরফদার ছাড়া আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই। হাতের কবজিতে পুরনো আমলের ঘড়ি বাঁধা আছে একটা। সেটা চলছে। রাত দশটা বেজে দশ।

ভবিতব্য জানার আশ মিটিয়ে শেষ লোকটা উঠল। বাপী তরফদারের স্নায়ুগুলো টান-টান আবার। লোকটা বেরিয়ে আসতে সে ঢোকার জন্য প্রস্তুত। দেখতে না পেলেও নিজের চোখ-মুখের খরখরে ভাবটা অনুমান করতে পারছে। ভিতরে ঢোকার আগে সেটা মোলায়েম করে নেবার তাগিদ।

ঘর ফাঁকা হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষী ভদ্রলোক নিজের ভাগ্য যাচাইয়ে মনোনিবেশ করেছে। সামনের এক-হাত প্রমাণ কাঠের বাক্সটা খুলে ভিতর থেকে এক মুঠো নোট বার করে ওটার ওপর রাখতে যাচ্ছিলেন। মুখ তুলে তাকাল এবং সঙ্গে সঙ্গে নোটগুলো আবার কাঠের বাকসের ভিতরে চালান করল। একই সঙ্গে পাশের গোল পকেট ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল?

বাপী তরফদার মাথা নাড়ল। ছিল না। আর কিছু বলার আগে ভদ্রলোকও মাথা নাড়ল।—অনেক রাত হয়ে গেছে, আজ আর হবে না।

প্ল্যানমাফিক বাপী তরফদার সবিনয়ে বলল, আমি শুধু একজনের ঠিকানা জেনে নেবার জন্য অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করছি···মিসেস মনোরমা নন্দী, আজ তাঁর এখানে আসার কথা ছিল···আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল, জানা থাকলে ঠিকানাটা দয়া করে যদি বলেন···

ভদ্রলোকের গোল দু'চোখ তার মুখের ওপর আটকে থাকল খানিক। তারপর আপাদ-মস্তক ওঠা-নামা করল।—তাঁদের এখানে আসার কথা ছিল আপনি জানলেন কি করে?

সন্দেহ এড়ানোর জন্যেই শুধু মনোরমা নন্দীর নামটা করেছিল। মালবিকা বা মিষ্টির নাম করে নি। তবু ভদ্রলোকের চাউনি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে সেটা অনুভব করা গেল। আমতা-আমতা করে জবাব দিল, বিকেলে ফোনে কথা হয়েছিল···তখন বলেছিলেন—

—ফোন নম্বর জানা আছে, বাড়ির ঠিকানা জানা নেই?

বাপী তরফদার মাথা নাড়ল। জানা নেই।

মুখের ওপর সন্দিগ্ধ চাউনিটা কঠিন হয়ে উঠতে লাগল।—কি মতলব?

—আজ্ঞে···?

—আমি দু ঘণ্টা আগেও তোমাকে ওই জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। ভদ্রমহিলার ঠিকানা চাই কেন? কি মতলব?

ভিতরের উত্তেজনার ফলে এ-রকম বিপাকে পড়ার কোন সম্ভাবনা অন্তত মাথায় আসে নি। এখন ছুটে পালাতে চাইলেও চেঁচামেচি করে লোক ডাকবে কিনা কে জানে। এই তিনতলা বাড়ির একতলায় বসে জ্যোতিষী করে। ডাকলে ভিতর থেকে কতজন ছুটে আসবে ঠিক নেই। কোণঠাসা হয়ে জবাবদিহি করল, ভদ্রমহিলাকে হঠাৎ এখানে দেখে তাঁর স্বামীর কাছে একটা চাকরির তদ্বিরের জন্য ঠিকানা খোঁজ করছিলাম···অনেক কাল আগে উত্তরবঙ্গে থাকতে ওঁরা আমাকে চিনতেন··

আরো রূঢ় স্বরে জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করল, ওঁর স্বামীর নাম কি?

—সন্দীপ নন্দী···উত্তরবঙ্গে বানারজুলি রিজার্ভ ফরেস্টের রেঞ্জ অফিসার ছিলেন এক সময়···বড় দুঃসময় চলেছে তাই একটু চেষ্টা করার ইচ্ছে ছিল—

এবারে বিশ্বাসযোগ্য হল বোধ হয়। শীতের রাতের এই বেশবাস বিশ্বাসের অনুকূল। ভদ্রলোকের ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস দেখা গেল। ভাঁওতাবাজী ধরে ফেলার মতই পাকা জ্যোতিষী। বলল, কোন মহিলার ঠিকানা জানার জন্য এভাবে আর কখনো কোথাও ঢুকে পড় না—ওঁর স্বামী কলকাতায় থাকেন না। যাও।

বেরিয়ে এল। এর পরেও উত্তেজনার উপশম হল না একটুও। মনে মনে জ্যোতিষীর মুণ্ডুপাত করতে করতে ঘরের দিকে পা বাড়াল। ওই মেয়েকে আবারও দেখার তাড়না ভিতরে একটা যন্ত্রণার মত ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকল। সেই যন্ত্রণার তাপ বুকের পাঁজর থেকে মাথার দিকে উঠছে। জ্যোতিষীর জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছে মিষ্টিকে, আর বাইরে বেরুনোর পর সামনে দাঁড়িয়েও দেখেছে। এই দেখায় বিশ্লেষণে ফাঁক ছিল না

বড। আগের সঙ্গে মেলে না। মাথায় লম্বা হয়েছে বেশ। স্বাস্থ্যও লোভনীয় রকমের নিটোল ছাঁদ নিয়েছে। ফোলা গাল ভেঙে অন্য ধাঁচের পরিণত আকার নিয়েছে গায়ের রঙে তাজা তামাটে প্রলেপ পড়েছে। সব মিলিয়ে মিষ্টিকে তীক্ষ্ণ মনে হয় এখন। রূপ নয়, এর থেকে ঢের রূপসী কলকাতায় এ ক'মাসে সে অনেক দেখেছে। সন্ধ্যার দিকে যে-কোন অভিজাত বার-রেস্তর াঁর সামনে দাঁড়ালে দু-চারটে অন্তত রূপসী মেয়ে চোখে পড়েই। বড় গোছের যে-কোন সোস্যাল ফাংশান ভাঙলেও চোখে পড়ে। ভিতরের সুপ্ত বাসনা অনেক সময়েই তাকে ও-সব জায়গায় টেনে নিয়ে যায়। পকেটে পয়সার টান। হিসেবী মন বাজে খরচের ঝোঁকে বিক্ষিপ্ত হয় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক-একদিন শুধু বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে। এই গোপন অশালীন দেখার খবর একমাত্র সে নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। সে-তুলনায় এই রূপ এমন কিছু নয়। কিন্তু এই রূপের মধ্যে এমন কিছু আছে যা পুরুষের বিশ্লেষণের বস্তু, আবিষ্কারের বস্তু। এই বিশ্লেষণ অথবা আবিষ্কার দীর্ঘকালের জমাট-বাঁধা লোভ আর যন্ত্রণার ফল কিনা জানে না। জানতে চায়ও না। অপ্রত্যাশিতভাবে যার দেখা পেল আজ, তার সমস্ত খুঁটিনাটি দু চোখের তারায় আগলে নিয়ে পথ চলেছে।

মগজে সাদাটে গাড়ির নম্বরটা ঘুরপাক খাচ্ছে।

রাত প্রায় এগারোটা। টালি-এলাকায় শীতের নিঝুম রাত। রাস্তার ধারে লাইটপোস্টের ঝিমুনো আলোয় ভিতরে ঢোকার সরু গলি-পথ দেখা যাচ্ছে। বাপী তরফদার নিঃশব্দে ভিতরে সেঁধিয়ে গেল। অন্ধকার সত্ত্বেও আন্দাজে ঠিক নিজের খুপরির দরজা ঠেলে অন্দরে ঢুকে যেতে পারবে। কিন্তু ভেতরটাও খুব অন্ধকার নয়। ওপর থেকে খানিকটা জ্যোৎস্না এক ধারের টালি বেয়ে উঠোনে লুটোপুটি খাচ্ছে।

কোন দিকে না তাকিয়েই বাপী তরফদার তার খুপরি ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। তার পরেই বিষম চমক। পাশের ঘরের দরজা দুটো খোলা। দরজার ওধারে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে রতন বনিকের ঘুম-কাতুরে বউ কমলা। মুখ-চোখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তাহলেও সাদা চাদর জড়ানো ওই মূর্তি ভুল হবার নয়।

চোখের পলকে বাপী তরফদার নিজের খুপরির দরজা ঠেলে ভিতরে চলে এলো। ক্যাঁচ করে শব্দ হল একটু। আবার বন্ধ করার সময়েও সেই শব্দ। জোরে না হলেও ওই শব্দ রাতের এই নিঝুম স্তব্ধতা ভেঙে দেওয়ার মতো

বিরক্তিকর। দরজা বন্ধ করে ঘরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে রইল বাপী। এতক্ষণে শীতটা ছেঁকে ধরেছে তাকে। একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি পা বেয়ে বুকের হাড়ের দিকে এগোচ্ছে। মিনিট খানেক বাদে পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করার আর হুড়কো লাগানোর মৃদু শব্দ কানে এলো।

এবারে ঠাণ্ডার ভাবটা কমতির দিকে। অবসন্ন শরীরটা দেয়াল-ঘেঁষা দড়িব খাটিয়ার কাছে টেনে নিয়ে এলো। বসল। গায়ের আলোয়ান খুলে পায়ের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর জামাসুদ্ধই কম্বলের নিচে ঢুকে গেল।

বিকেল থেকে এই রাত পর্যন্ত আজ অনেক মাইল হাঁটা হয়েছে। স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড ধকল গেছে। রাতে কিছু খেয়ে নেবার কথা মনেও পড়ে নি। কম্বলের তলায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল দু চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে।

বাপী তরফদার জানে এই সন্ধ্যেটা আর এই রাতটা অনেকগুলো বছরের অনেকগুলো সন্ধ্যা থেকে আর রাত থেকে এত তফাৎ হয়ে গেছে যে খানিকক্ষণের মধ্যেই অবসন্ন স্নায়ুগুলো আবার টান-টান হয়ে উঠবে। কিন্তু মনে-প্রাণে এখন সে ঘুমের অতলে ডুবে যেতে চায়। মড়ার মতো নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়তে চায়।

দরজার পরিচিত শব্দটা কানে এলো যখন, অন্য দিনের মতোই বাপী তরফদারের আপদ-মস্তক কম্বলের নিচে। কিন্তু আজ সে রাত থাকতে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে আবার শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে।

—বড়বাবু ঘুমিয়ে না জেগে?

কম্বলের তলা থেকে গলার স্বরটা ভারী-ভারী ঠেকল কানে। কম্বল বুকের নিচে নামিয়ে বাপী সোজা কমলার মুখের দিকে তাকালো। ঘুম-ভাঙা ফোলা-ফোলা মুখ আঁচলের ঘোমটায় কান মাথা গলা বেড়িয়ে আধখানা ঢাকা। ভিতরেও আজ পাতলা ব্লাউস্ নয়, একটা গরম জামা পরেছে। তার ওপর দিয়ে আঁট করে শাড়ি জড়ানোর ফলে শরীরটাও ফোলা-ফোলা লাগছে।

বাপী আস্তে আস্তে উঠে বসল। নির্লিপ্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, ঠাণ্ডা লাগালে কি করে?

অনেকটা সেই রকমই নির্লিপ্ত ঢংয়ে কমলা ফিরে জিজ্ঞাসা করল, ঠাণ্ডা লেগেছে তুমি বুঝলে কি করে?

—গলার আওয়াজ শুনে, তাছাড়া ঢাকাঢুকি দিয়ে এসেছ—

তার চোখের ওপর কমলার দু চোখ আকারে বড় হতে থাকল। তারপর রাগত সুরে বলল, দেখো, সাতসকালে গোপাল ঠাকুরের রঙ্গও ভাল লাগে না বলে দিলাম···ঢাকাঢুকি না দিয়ে কবে তোমার সামনে এসেছি ?

সকালের ঠাণ্ডা সত্ত্বেও ঝাঁ করে দু কান গরম হয়ে উঠল বাপী তরফদারের। তাড়াতাড়ি ওকে বিদায় করার জন্যেই চায়ের গেলাসের দিকে হাত বাড়ালো।

—মুখ ধোয়া হয়েছে ?

—হয়েছে।

সত্যি-মিথ্যে যাচাইয়ের চোখে একবার দেখে নিল।—কখন হল ?

—কারো ওঠার আগেই হয়েছে, দাও।

গেলাস আর নুন-মাখানো গরম রুটি দুটো সামনে এগিয়ে দিয়ে ঠেসের সুরে কমলা বলে উঠল, দরজায় আওয়াজ শুনেও তাহলে কম্বলের তলায় ঢুকে ছিলে কেন ?

বাপী তরফদার জবাব দিল না বা তার দিকে তাকালো না। রাতের নির্জলা উপোসের পর গরম চা আর নুন-ছড়ানো গরম রুটি অমৃতের মতো লাগছে। সকালে চায়ের সঙ্গে রুটি হলে সে চিনি-গুড়ের থেকে নুন পছন্দ করে।

কমলা ত্রস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল। কারণ না বুঝলেও বাপী তরফদার স্বস্তি বোধ করল একটু। কিন্তু দু মিনিটের মধ্যেই দ্বিগুণ বিরক্ত। শাড়ির আঁচলে নিজের চায়ের গরম গেলাস ধরে আবাব এ-ঘরে হাজির। চোখের কোণে কৌতুকের ছোঁয়ায় শ্যামবর্ণ মুখ সরস দেখাচ্ছে।

দু চুমুক তল করে বলল, বুড়োটা ঘুমোচ্ছে এখনো। ঠাণ্ডার চোটে উঠে পড়ে আজ এক ঘণ্টা আগে চা বানিয়েছি। তুমি চায়ের পিত্যেশে বসে আছ জানলে আরো আগেই করে দিতে পারতাম। বলতে বলতে একটা হাত পিছন দিকে নিয়ে দরজার একটা পাট বন্ধ করে দিল। তারপর সেদিকের দেয়ালে আড়াল নিয়ে ফিক করে হাসল একটু।—তোমার ঘরে এসে গপ্প করতে করতে চা খেতে দেখলে কার চোখে আবার কাঁটা বেঁধে ঠিক কি।

কাল রাতে নিজের ঘরের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকাটা ভুলতে পারেনি। আজ এই দিনমানেও ওকে দেখে অস্বস্তি। চাপা বিরক্তির সুরে বাপী বলল, আমার ঘরে এসে চা খাওয়ার দরকারটা কি !

চায়ের গেলাস মুখে তুলেছিল। সেটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে রেখেই হাসি আড়াল করল।—গোপাল ঠাকুরের মনে এক মুখে এক—হুঁঃ। বড় বড় তিন

চার ঢোঁক চা গিলে নিল। তারপর টেনে টেনে বলল, বড়বাবুর কি সাঁঝের টাইমে কোনো ডিউটি-টিউটি জুটেছে নাকি?

—না। নিজের গেলাস খাটিয়ার সামনে মেঝেতে নামিয়ে রাখল।

—তবে কাল রাতে ফিরতে এত দেরি হল?

এবারে সত্যি সত্যি ধমকে উঠল বাপী তরফদার।—দেরি হল তো হল—কেন দেরি হল সে জবাবদিহি তোমার কাছে করতে হবে?

গেলাসের চা শেষ করে মুখখানা আর একবার ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার বোধ করল কমলা। ঝাঁজালো ব্যঙ্গ ঝরল তার গলাতেও।—সাধে বড়বাবু বলি! নুন রুটি দিয়ে দিন শুরু তবু মেজাজ কতো! রাত-দুকুর পর্যন্ত হাট-করা খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাণ্ডা লাগালাম, সকালে তাই নিয়ে উঠে চা করে খাওয়ালাম—লজ্জাও করে না মুখ নেড়ে কথা বলতে!

বলতে বলতে এক-পাট খোলা দরজা ভুলে যেভাবে কাছে এগিয়ে এলো, মুহূর্তে দিশেহারা অবস্থা বাপী তরফদারের। কিন্তু না, টুপ করে উপুড় হয়ে তার খাওয়া গেলাসটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে দু চোখে এক-ঝলক মেকি আগুন ছড়িয়ে প্রস্থান করল।

বাপী তরফদার পঙ্গুর মতো বসে রইল। তারপর আত্মস্থ হল।...হ্যাঁ, মুখ নেড়ে কথা বলতে লজ্জা করে। আগেও করেছে, এখনো করে। তাই কথা বেশি বলে না, বলতে চায় না। কিন্তু এখন অন্যায় থেকে বেশি করে ভয়। ভয় কমলাকে। তার থেকে ঢের বেশি নিজেকে।

...বানারজুলিতে সোমত্ত বয়সের দু-ঘর সাপুড়ে মেয়ে ছিল। ননদ-ভাজ সম্পর্ক। একজনের মরদ দিন-রাত নেশা করে পড়ে থাকত। আর একজনের মরদের দুটো চোখই বসন্তের গুটিতে খেয়ে দিয়েছে। সেই ননদ-ভাজ একসঙ্গে দু'তিনটে ঝাঁপিতে সাপ পুরে নিয়ে গ্রামে শহরে সাপের খেলা দেখিয়ে বেড়াতো। গাল ফুলিয়ে পেটমোটা সাপুড়ের বাঁশি বাজিয়ে যেত ঘাগরা-পরা মেয়ে দুটো। কিছু পয়সা মেলার মতো ভিড় দেখলেই সাপের ঝাঁপি খুলে বসত তারা। হরেক রকমের সাপ বার করত। বাঁশি বাজাতো আর সাপের খেলা দেখাতো। কিন্তু অবাক চোখে বাপী ওই মেয়ে দুটোকেই বেশি দেখত। হাঁটু গেড়ে বা হাঁটু মুড়ে বসে বসে ফণা-তোলা সাপের মতোই সামনে, পিছনে ডাইনে বাঁয়ে কোমর-বুক-মাথা দোলাতো তারা। ওই করে সাপকে উত্তেজিত করতে চাইত। শুধু তাই নয়, সাপের ছোবল খাবার জন্য অঙ্গ যেন চিড়-চিড় করত তাদের। ফণা-তোলা সাপের সামনে ভুঁয়ের ওপর হাত

পেতে দিত। ছোবল পড়ার আগেই চোখের পলকে হাত সরিয়ে নিত, মাটির ওপর ছোবল পড়ত। এই করে যতবার ওরা সাপকে ঠকাতে পারতো ততো ওদেরও উত্তেজনা বাড়ত। কিন্তু ক্রুদ্ধ সাপের ছোবল একবার না একবার হাতের উল্টো পিঠে বা আঙুলের মাথায় পড়তই। সঙ্গে সঙ্গে দরদর করে রক্ত বেরুতো। ওরা তখন থলে থেকে কি পাতা বার করে দাঁতে চিবিয়ে সে-পাতা ক্ষতর ওপর লাগিয়ে দিত। ছোবল খাবার পরে উত্তেজনার শেষ।

...কমলাও অনেকটা সেই সাপুড়ে মেয়ে দুটোর মতোই। সাপকে দখলে রেখে উত্তেজনা বাড়িয়ে ছোবল খাওয়ার লোভ। কিন্তু সাপুড়ে মেয়েদের সাপের মতো নিজেকে নির্বিষ ভাবে না বাপী তরফদার। তাই কমলার থেকেও নিজেকে বেশি ভয়।

কিন্তু গত সন্ধ্যা থেকে তার ভিতরে ভিতরে সাপের মতোই এক বিষ-বাষ্প কুণ্ডলি পাকাচ্ছে, গজরাচ্ছে, ফুঁসে উঠে ছোবল বসাতে চাইছে। এই অকরুণ অব্যর্থ সন্ধানী লক্ষ্য আর এক মেয়ে। নাম মিষ্টি। মালবিকা...।

বানারজুলির সবজান্তা আবু রব্বানী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, ষোল-সতের বছর বয়সে মিষ্টির চেহারাখানা যা হবে, কোনো না কোনো বড়লোকের ছেলের চোখ পড়বেই ওর ওপর—বিয়ে করে ওকে ঘরে এনে পুরবে, তারপর লুটেপুটে শেষ করবে—বি. এ, এম এ পাশ করার ফুরসৎ মিলবে কোত্থেকে ?

হিসেবে ভুল হবার নয় বাপী তরফদারের। নিজের বয়েস চৌদ্দ আর আটে বাইশ। মাস দেড়-দুই বেশি হতে পারে ? ওই মেয়ের দশ আর আটে আঠের। সেই চৌদ্দ আর সেই দশ থেকে আটটি বছর সামনে পা ফেলেছে তারা। কিন্তু বাপীর একটা সত্তা চৌদ্দর সেই অবুঝ দুরন্ত রক্তাক্ত গণ্ডীর মধ্যে আটকে আছে এখনো। আর এই মেয়ের সবটাই সেই দশের গণ্ডী টপকে ভর-ভরতি আঠেরোয় পা ফেলে জাঁকিয়ে বসেছে। অতীতের ছিটে-ফোঁটাও তার গায়ে লেগে নেই। আবু রব্বানীর ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয়নি। ভরাট সময়ে যে রূপ রব্বানীর কল্পনায় ছিল সেটা এ-চেহারার সঙ্গে আদৌ মিলবে না এ বাপী হলপ করে বলতে পারে। তার থেকে ঢের ভালো কি ঢের খারাপ জানে না। মোট কথা মেলেনি, মিলবে না। কোনো বড়লোকের ছেলের চোখ পড়েছে কিনা জানে না, কিন্তু কেউ ঘরে এনে পুরতে পারেনি এখন পর্যন্ত। সাদা সিঁথিই তার প্রমাণ। বাপী তরফদার আরো হিসেব করেছে। এম. এ পড়ার বয়েস এখনো হয়নি, কিন্তু এযাবৎ ফেলটেল যদি না করে থাকে তো এতদিনে বি. এ পড়া শুরু করা উচিত।

একটা অসহিষ্ণু তাড়নায় বেলা এগারোটার মধ্যে স্নান-টান সেরে বেরিয়ে পড়ল। শুধু মোটর গাড়ির নম্বরটা সম্বল। শহর কলকাতার শত সহস্র গাড়ির মধ্যে সেই নম্বরের সাদাটে গাড়িটাকে খুঁজে বার করার চিন্তাও হাস্যকর পাগলামি। কিন্তু আট বছর পরের এই হঠাৎ-দেখাটা হঠাৎই শেষ একেবারে, এরকম চিন্তা বাপী বরদাস্ত করতেও রাজী নয়।

এক জায়গায় বেশ করে খেয়ে নিল। অনেক দিন বাদে নিজেকে সুস্থ আর তাজা রাখার তাগিদ। খেয়েদেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে একটা বড় কিছুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর প্রস্তুতি। আজ আর পা দুটো কোনো আপিসপাড়ার দিকে এগোতে রাজি নয়। গত সন্ধ্যার পথ ধরে হাঁটা শুরু করল। জ্যোতিষীর একতলা ঘরের বাইরের দরজা বন্ধ। খোলা থাকলেও সেখানে ওই বাঞ্ছিত মুখ আজও চোখে পড়বে এমন আশা বাতুলে করে

জ্যোতিষীর ঘর ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল বাপী তরফদার। অপ্রত্যাশিত হদিস মিলবে এরকম আশা করছে না বটে, কিন্তু রাস্তার দুদিকের একটা বাড়িও তার শ্যেন দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে না। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তাটা ফুরিয়ে গেল একসময়। বেঁকে গিয়ে ট্রাম লাইনের বড় রাস্তায় এসে মিশেছে। সামনে ব্রীজ। একটা রাস্তা গেছে তার তলা দিয়ে। আর একটা রাস্তা ট্রাম লাইন পেরিয়ে লেক-এর দিকে।

গলা দিয়ে অস্ফুট একটা গালাগাল বেরিয়ে এলো। বড় রাস্তার বাস স্টপের কাছে চুপচাপ খানিক দাঁড়িয়ে রইল বাপী তরফদার। মাঝখানের ট্রাম লাইন ধরে ট্রাম আসছে যাচ্ছে। এক-একটা করে মানুষ বোঝাই বাস এসে দাঁড়াচ্ছে আবার চলে যাচ্ছে। মোটর ছুটেছে অবিরাম। সাদাটে রঙের গাড়ি দেখলে দু চোখ সেটার গায়ে গিয়ে আটকাচ্ছে। সব-কিছুই দেখছে বটে, কিন্তু আসলে সে ভেবে চলেছে।

হঠাৎই মাথায় এলো কিছু। চেষ্টার নাম পুরুষকার। দেখা যাক। সামনে যে বাস পেল তাতেই উঠে পড়ল। সব বাসই ডালহৌসি যায় এ-সময়। গাড়ির নম্বর থেকে বাড়ির হদিস মেলা সম্ভব কিনা বন্ধু নিশীথ সেন সেটা বলতে পারে। নিশীথের বাবা মধ্য কলকাতার মাঝারি নাম-ডাকের কবিরাজ। নিজের আয়ুর্বেদ ফার্মেসি আছে। তাঁর ঝরঝরে গাড়ি আছে একটা। সেই গাড়িরও নম্বর আছে।

কলকাতায় বাপীর মোটামুটি দরদী বন্ধু বলতে ওই একজনই—নিশীথ সেন। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে, একসঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে।

বানারহাটে নিশীথ তার দাদুর কাছে থেকে স্কুলে পড়াশুনা করত। জলপাইগুড়ি থেকে আই-এসসি পরীক্ষার পর ছাড়াছাড়ি। নিশীথ আই-এসসি'র পর কলকাতায় বি-এ পাশ করেছে। ছেলেকে মেডিক্যাল কলেজে পড়ানোর ইচ্ছে ছিল বাপের। কিন্তু আই-এসসি'র ফল দুই দাঁড়ির নিচের দিকে ঠেকতে সেটা সম্ভব হয় নি। বি-এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ও একটা যুদ্ধের আপিসের চাকরিতে ঢুকে পড়েছিল। এখনো সে চাকরিতে টিকে আছে, কিন্তু মাথার ওপর ছাঁটাইয়ের খড়্গ ঝুলছে। দুদিন আগে হোক পরে হোক ওটা নেমে আসবেই। তা বলে বাপীর মতো বেকার হবে না সে। বি-এ পড়ার সময় থেকে বাপের কাছে কবিরাজি চিকিৎসার তালিম নিচ্ছে। বাবার সঙ্গে বসে নানারকম কবিরাজি ওষুধ তৈরির কাজে হাত পাকাচ্ছে। রোজ সন্ধ্যার পরে আয়ুর্বেদ ফার্মেসিতে বাবার পাশের কাঠের চেয়ার দখল করে গম্ভীর মুখে ছোট কবিরাজ হয়ে বসতে দেখা যায় তাকে। ছুটির দিনে সকাল-বিকেল দু বেলাই বসে সেখানে। বাপের অনুপস্থিতিতে সে এখন দিব্বি ঠেকা দিতে শিখেছে। চাকরিটা নেহাৎ আছে বলেই ছাড়তে পারছে না। চাকরি গেলে আয়ুর্বেদের দুই-একটা দিশী টাইটেল জুড়ে পাকাপোক্ত কবিরাজ হয়ে বসবে।

নিশীথ সেন আপিসেই আসেনি আজ। আবার একটা গালাগাল বেরিয়ে এলো বাপীর ভিতর থেকে। এটা ছেলেবেলার অভ্যাস। অনেক রকমের কুৎসিত গালাগালও নিঃশব্দে ঠেলে বেরিয়ে আসে।

আবার কলেজ স্ট্রীটের বাস ধরল। কপালে আজ কিছু পয়সা গচ্চা লেখা আছে।

কলেজ স্ট্রীট ছাড়িয়ে আরো একটু উত্তরে এগোলে নিশীথের বাড়ি। বাড়ির কাছেই ওদের আয়ুর্বেদ ফার্মেসি। আগে সেখানে হানা দিল। দরজা বন্ধ, কিন্তু বাইরে তালা ঝুলছে না। অর্থাৎ ভিতরে কেউ আছে। বাপ আর ছেলে ভিন্ন আর কেউ এ দপ্তর খোলে না। এই বেলা দেড়টায় বাপের এখানে দরজা বন্ধ করে বসে থাকার সম্ভাবনা কম।

বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা দিল। সাড়া না পেয়ে দরজার গায়ে জোরে দু' চাপটে চড়চাপড় বসালো। ভিতর থেকে দরজা খোলা হল।

কাঁচা ঘুম-ভাঙা মুখখানা বিরস দেখালো নিশীথের। হাই তুলে বলল, তুই আবার মরতে এখানে এসে জুটলি—

—আপিস কামাই করে এখানে ঘুমুচ্ছিস?

—বাড়িতে থাকলেই বাবা কোনো পাচন বা সালসা বানাবার কাজে বসিয়ে

দিত, এখানেও তুই দিব্যি ঘুমের বারোটা বাজিয়ে। বোস, খাবি কিছু ?

এই বেঁটেখাটো ছেলেটার বুকের তলায় একটু নরম জায়গা আছে। এমনিতে বাস্তববুদ্ধি প্রখর। কিন্তু বেকার বন্ধুর প্রতি সদয়। চাকরির প্রথম ক'টা দিন ওর বাড়িতেই ছিল বাপী তরফদার। কিন্তু বন্ধুর প্রীতি বেশি কি অনুকম্পা—জানে না।

বিরক্ত মুখ করে জবাব দিল, তুই ভাবিস আমি খালি খেতেই আসি তোর কাছে। এখন অন্য দরকারে এসেছি মন দিয়ে শোন্, তোদের তো একটা গাড়ি আছে ?

হঠাৎ গাড়ির খোঁজ কেন ভেবে না পেয়ে নিশীথ সেন শুরু থেকেই সতর্ক। —আছে একটা, কিন্তু তার ওপর বাবা ছাড়া আর কারো দখল নেই।

—আরে বাবা আমি তোদের গাড়ি চাইছি না ; কোনো গাড়ির নম্বর যদি তোকে দিই তুই তার মালিকের ঠিকানা বার করে দিতে পারিস ?

নিশীথ সেন অপ্রস্তুত একটু।—সে আবার কি— !

—আমার খুব দরকার। কাল হঠাৎ ভদ্রলোকের গাড়িটা দেখলাম, চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল, নম্বরটা মনে আছে, বাড়ির ঠিকানা বার করতে পারলে একটা চাকরি-বাকরি হতে পারে –

নিশীথ সেন জ্যোতিষী নয়, তাছাড়া পরিস্থিতিও সন্দিগ্ধ হবার মতো নয়। একটু ভেবে জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রলোকের কোন্ আপিস বা কি চাকরি জানিস না ?

জেরা পছন্দ নয়।—সে জানলে আর তোর কাছে আসব কেন, বড় চাকরিই করে নিশ্চয়, এককালে খুব চেনাজানা ছিল, ধরতে পারলে একটা সুরাহা হতে পারে।

—ভদ্রলোকের নাম কি ? ফোন-গাইড দেখেছিস ?

ভদ্রলোক বাপী তরফদারের চিন্তার মধ্যেও নেই বলেই তল্লাসীর এই প্রাথমিক রাস্তাটা মনে পড়ে নি।—সন্দীপ নন্দী ..ফোন-গাইড আছে এখানে ?

জবাব না দিয়ে নিশীথ সেন ঢাউস টেলিফোন গাইডটা টেনে নিল। সাগ্রহে খোঁজাখুঁজি চলল খানিকক্ষণ। দুজন সন্দীপ নন্দীর নাম পাওয়া গেল, কিন্তু বাড়ির ঠিকানা দক্ষিণ কলকাতার নয়। তাছাড়া তাদের একজন ডাক্তার আর একজন অ্যাডভোকেট। নন্দী এস-এর মধ্যে এন্তার নম্বর। ফোন-গাইড বন্ধ করে নিশীথ সেন জিজ্ঞাসা করল, গাড়ির নম্বর ঠিক মনে আছে ?

বাপী তরফদার গড়গড় করে নম্বর বলে দিতে সে একটু ভেবে মন্তব্য করল, মোটর ভেহিকিলস্-এ গেলে বাড়ির ঠিকানা বার করা যায়, অনেক দূর—

—সেটা কি? সেটা কোথায়?

—তোদের ও-দিকেই। সেখানে কলকাতার সমস্ত গাড়ির ঠিকানাপত্তর থাকে। কাল একবার খোঁজ করে দেখ্ না—

—কাল নয়, আজই। বাপী তরফদার সাগ্রহে উঠে দাঁড়াল।—আমার দ্বারা হবে না, চল্ আমি তোকে বাস ভাড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, আবার পৌঁছেও দেব—

তাগিদ বোঝাবার জন্যেই এরকম করে বলা।

মোটর ভেহিকিলস্-এর অপরিচিত চত্বরে পা ফেলতেই জনা-তিনেক হা-ঘরে মূর্তি ছেঁকে ধরল। কি চাই? নতুন লাইসেন্স না রিন্যুয়াল? লার্নার্স লাইসেন্স? ট্র্যান্সফার?

এখানে একলা এলে বাপী তরফদার কোনো কিছুর হদিস পেত কিনা সন্দেহ। কিন্তু নিশীথ সেন-এর জানা আছে। দালালদের মধ্য থেকে সব থেকে দুঃস্থ-মার্কা লোকটাকে বেছে নিল সে। তারপর বক্তব্য জানালো। গাড়ির নম্বর থেকে বাড়ির ঠিকানা বার করে দিতে হবে।

এরকম ফরমাস পেতে অভ্যস্ত নয় এরা। দুরূহ দায়িত্ব নেবার মতো মুখ করে দালাল পাঁচ টাকা দর হাঁকল। বাপী তরফদার তক্ষুনি পাঁচ টাকাই বার করতে রাজি। কিন্তু নিশীথ সেন আট আনা থেকে শুরু করে এক টাকায় রফা করে ফেলল।

দশ মিনিটের মধ্যে কাজ হাসিল। কিন্তু ঠিকানা হাতে নিয়ে নিশীথ সেন হাঁ...না সন্দীপ না নন্দী। সেই নম্বরের গাড়ির মালিকের নাম অনিমেষ ঘোষ!

বিব্রত মুখে বাপী তরফদার তার হাত থেকে কাগজটা নিল। কিন্তু বাড়ির ঠিকানা দেখে আশান্বিত একটু। সেই জ্যোতিষীর ডেরার রাস্তায় বাড়ির নম্বর। একটা টাকা দিয়ে দালাল বিদায় করে বন্ধুকে বলল, কোনো আত্মীয়ের গাড়ি হবে হয়তো ওটা—

নিশীথ সেন প্রস্তাব করল, এতটাই যখন করা গেল ওটুকু আর বাকি থাকে কেন—চল্, ওই ঠিকানাতেই খোঁজ করে দেখি তোর চেনা লোকের হদিস মেলে কিনা।

—না-না, আজ আর ভালো লাগছে না। বাপী তরফদার ব্যস্ত হয়ে

উঠল।—মেজাজ খিঁচড়ে গেছে, নাম মিলছে না, চলতি গাড়িতে কাকে দেখতে কাকে দেখলাম কে জানে। ইয়ে, আমি এ-দিকে একটু কাজ সেরে যেতাম··· তোকে পৌঁছে দিতে হবে?

তাকে অব্যাহতি দিয়ে নিশীথ সেন. নিজের বাস ধরল। তারপর···। তারপর অপচয় করার মতো হাতে আর এক মুহূর্তও সময় নেই বাপী তরফদারের।

···সেই রাস্তা।

মিথ্যেই অনেকটা আগে থেকে রাস্তার ডান দিকের বাড়িগুলোর দিকে চোখ রেখে দ্রুত হেঁটে চলেছে বাপী তরফদার। রাস্তার বাঁয়ের বাড়িগুলোর জোড় নম্বর। তার বে-জোড় নম্বর চাই। নিজের ওপরেই বিরক্ত। বোকার মতো বেশি হাঁটছে। ওই নম্বরের বাড়ি রাস্তার শেষ মাথায় হবে। বাসে চেপে এসে শেষ দিক থেকে খুঁজতে খুঁজতে এলে সময়ের সাশ্রয় হত। শীতের বেলা পড়ে আসছে, তার হাঁটার গতি বাড়ছে।

কম করে দেড় মাইল লম্বা এই রাস্তা। জ্যোতিষীর বাড়ি সিকি মাইলের মধ্যে। লোকটা বিকেলেই দপ্তর খুলে বসেছে, আর আশ্চর্য, খদ্দেরও জুটেছে! জানলা দিয়ে একটা অসহিষ্ণু দৃষ্টি ছুঁড়ে বাপী তরফদার হনহন করে এগিয়ে চলল।

বাড়ির নম্বর যতো বাড়ছে, উত্তেজনাও বাড়ছে ততো। একটা বাড়ির সামনে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেল শেষে।···নম্বর মিলেছে। সামনে কোলাপ-সিবল্ গেট লাগানো শূন্য গ্যারাজ। তার কোণের দিকে দেয়ালের গায়ে বাড়ির নম্বর-প্লেট। ছোটর ওপর ছিমছাম বাড়ি।

বুকের ভিতরটা ধপ ধপ করছে বাপী তরফদারের।···ওই গাড়িটা হয়তো এই বাড়িরই, কিন্তু মিষ্টি···মালবিকা নন্দী নামে কোনো মেয়ে কি সত্যিই এখানে থাকে? পনের বিশ গজ এগিয়ে গিয়ে রাস্তা টপকে উল্টো দিকের ফুটপাথএ এসে দাঁড়াল। দোতলার বারান্দাটা ফাঁকা। তার ও-ধারে পর পর তিনটে ঘরে লোক চলাচলের আভাস পাচ্ছে। কিন্তু স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

নির্নিমেষে ওই দোতলার দিকেই চেয়ে আছে বাপী তরফদার। হঠাৎ তন্ময়তায় ছেদ পড়ল কেন জানে না। উল্টো দিকের বাড়িটার এক তলা বাঁধানো দাওয়ায় তারই বয়সী জনা-তিনেক ছেলে বসে সিগারেট টানছে। তারা ওকে দেখেই হাসাহাসি করছে বোধ হয়। আবার ঘন ঘন সামনের

বাড়িটার দোতলার দিকে তাকাচ্ছে।···এদিকের একটা বাড়ির দোতলায় রেলিংএর সামনে সোনালি ফ্রেমের চশমা-পরা ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একজন সুশ্রী লোক দাঁড়িয়ে। তারও দৃষ্টি ওই বাড়িটার দোতলার বারান্দার দিকে। বাপী তরফদারের হঠাৎ কেমন মনে হল সিগারেট-মুখে ওই ছেলেগুলো বা দোতলার ওই লোকটাও তারই মতো কারো দেখা পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। বাপী তরফদারের আশা বাড়ছে।

হঠাৎ নিঃশ্বাস রুদ্ধ হবার দাখিল তার। ঘর থেকে ওই দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে একজন। খোলা চুল ফোলা-ফোলা মুখ। মনোরমা নন্দী। মিষ্টির মা।

সন্তর্পণে বড় নিঃশ্বাস ফেলল বাপী তরফদার। একটা প্রকাণ্ড অনিশ্চয়তার অবসান। অনিমেষ ঘোষ যে-ই হোক, মিষ্টি এ বাড়িতেই থাকে।

ভুরু কুঁচকে মহিলা রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিচের দাওয়ার ছেলে তিনটেকে দেখলেন একবার। সামনের বাড়ির দোতলার সোনালি ফ্রেমের চশমা-পরা লোকটাকেও দেখলেন। তারপর বাপীর দিকে চোখ গেল তাঁর। রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে তিনি বারান্দা ছেড়ে ঘরে ঢুকলেন আবার।

বাপী তরফদারের মনে হল শেষের বিরক্তিটুকু এক বাড়তি উপদ্রব দেখার দরুন। অর্থাৎ তাকে দেখেই।

এর তিন-চার মিনিটের মধ্যে দাওয়ার ছেলে কটা সচকিত। তিনজনেরই ঘাড় রাস্তার উল্টো দিকে ফিরেছে।···হ্যাঁ, ও-দিক থেকে সাদাটে গাড়ি আসছে একটা। সঙ্গে সঙ্গে তারও ধমনীর রক্তে দাপাদাপি।

গাড়িটা এই সাতাশি বাড়ির গায়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল। বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। তবু সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেই সাদাটে গাড়ি। এঞ্জিনের সামনে সেই নম্বরের প্লেট।

গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে হর্নও বেজেছে। মনোরমা নন্দী আবার দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ভিতর থেকে একটা অল্পবয়সী চাকর ছুটে এসে গ্যারাজের তালাবদ্ধ কোলাপসিবল্ গেট খুলতে গেল।

বাপী তরফদারের একাগ্র দু চোখ গাড়িটার গায়ে আটকে আছে। পিছনের দরজা খুলে প্রথমে মিষ্টি নামল। বুকের সঙ্গে একপাঁজা বই ধরা। পরনে হালকা সবুজ শাড়ি, সবুজ ব্লাউস। নেমে দাঁড়াল একটু। পিছনে আর একজন প্যাণ্ট-কোট পরা বৃদ্ধ লোক নামছেন। তাঁর জন্য কয়েক পলকের প্রতীক্ষার ছলে দাঁড়িয়ে ভিন্ন দিকে তিন ঝলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মিষ্টি নন্দী :

প্রথমে দাওয়ার ছেলে তিনটের দিকে—তাদের কারো মুখে সিগারেট নেই এখন। তারপর সামনের বাড়ির দোতলার সোনালি ফ্রেমের চশমা-আঁটা সুশ্রী গম্ভীর মূর্তির দিকে।

তারপর বাপী তরফদারের দিকে। তাকে দেখাটা নতুন পতঙ্গ দেখার মতো।

পলকা ঝটকায় ঘুরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

॥ চার ॥

আবু রব্বানী বলেছিল, যদি মরদ হোস তো একদিন শোধ নিবি। একটা চোখ ছোট করে অন্য চোখে সটান তাকিয়ে শুধিয়েছিল, কি রকম শোধ বুঝলি?

চৌদ্দ বছরের বাপী মাথা নেড়েছিল, বুঝেছে। আবুর কল্যাণে এর ঢের আগে থেকেই না-বোঝার মতো কত কি জল-ভাত তার কাছে। তাছাড়া না বুঝলে নিজের কপাল নাক মুখ তো অক্ষতই থাকত। শোধ নেওয়ার কোনো কথাই উঠত না। তবু আবু রব্বানীর কথাগুলো নতুন করে মনে পড়েছে বাপীর।

পরের দুদিনও একটা অবুঝ অস্থিরতা সকালে-বিকেলে গলায় শেকল পরিয়ে এ পর্যন্ত টেনে এনেছে তাকে। এই সাতাশি নম্বর বাড়িটার দরজা পর্যন্ত। শুধু অস্থিরতা নয়, এক ধরনের অব্যক্ত উপোসী যন্ত্রণাও। শুকনো দুই ঠোঁট বার বার জিভে ঘষেছে। নিজের একদিনের সেই থ্যাতলানো মুখের রক্তের নোনতা স্বাদ লেগেই আছে। সেই ফয়সালা বাকি। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখতে অসুবিধে হয়নি। কল্পনার জগতের সোনার সিংহাসনেও চেপে বসা গেছে। তারপর এক মেয়ের সঙ্গে চরম কিছু ফয়সালার মুখোমুখি এসে থেমে গেছে। সেটার ছক কোনো সময় মনের মতো হয়নি।

সেটা আজও বাকি। সেই মেয়ের দেখা মেলার সঙ্গে সঙ্গে নিভৃতের একটা অস্বাভাবিক বিশ্বাস মগজে দাগ কেটে বসেছে। ফয়সালা হবে বলেই এত বড় দুনিয়ায় এত বছর বাদে আবার দেখা তার সঙ্গে।

ভিতরে ভিতরে এমন একটা নাড়াচাড়া না পড়ে গেলে বাপী তরফদার হয়তো আর একটু মাথা খাটিয়ে বাস্তবের মাটিতে পা ফেলে চলত। গত পরশু আর কাল শুক্রবার আর শনিবার গেছে। এ দুদিনের হাজিরায়

কোনরকম ব্যাঘাত ঘটেনি। সকাল সাড়ে নটার আগে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দেয়ালের নেম-প্লেটের নামটা মুখস্থ হয়ে গেছে। অনিমেষ ঘোষ, অ্যাডভোকেট। মালবিকার মায়ের বাবা হবে হয়তো। মুখ দেখে আর বয়েস আন্দাজ করে সেইরকমই মনে হয়েছে।

...পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়নি। প্রথমে বই বুকে করে বেণী দুলিয়ে ওই মেয়েকে স্বতঃপর গাম্ভীর্যে গাড়িতে উঠে বসতে দেখেছে। তিন দিনে তিন রকমের শাড়ি পরতে দেখল। যেদিন যেটা পরেছে সেটাই যেন সব থেকে ভালো মানিয়েছে। গাড়িতে ওঠার ফাঁকে বাপীর দিকে চোখ গেছে। উল্টো দিকের রকে আর দোতলার বারান্দায়ও। দোতলার বারান্দায় সোনালি ফ্রেমের চশমা। রকে দুটো তিনটে বা চারটে ছেলে। বাপীকেও এদের মতোই নতুন একজন ধরে নেওয়া হয়েছে, সন্দেহ নেই। চিনতে না পারাটা বাপীর ক্ষতর ওপর নুন ছড়ানোর মতো লেগেছে।

এক আধ মিনিটের মধ্যে বয়স্ক ভদ্রলোক গাড়িতে এসে ওঠেন। দোতলার বারান্দায় তখন মালবিকার মা মনোরমা নন্দীর অপ্রসন্ন মুখখানাও দেখা যায়। গাড়িটা সকলের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে গেলে তিনি ভিতরে পা বাড়ান। বিকেলেও একই ব্যাপার। পাঁচটা পনের থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে সাদা গাড়ি সাতাশি নম্বরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। ওই মেয়ে আগে নেমে ভিতরে চলে যায়। পিছনে বয়স্ক ভদ্রলোক। তাঁর কোনদিকে বা কারো দিকে চোখ নেই। আত্মতৃপ্ত সুখী মানুষ মনে হয়। রকে সেই দুটো তিনটে বা চারটে ছেলে। সামনের দোতলার বারান্দায় সেই সোনালি ফ্রেমের চশমা। আর সাতাশি নম্বরের দোতলার বারান্দায় মনোরমা নন্দীর অপ্রসন্ন মুখ।

...গত বিকেলেও বাড়িতে ঢুকে পড়ার ঝোঁক অনেক চেষ্টায় সামলেছে বাপী তরফদার। আজ রবিবার। কলেজ বন্ধ। সকাল সাড়ে আটটা না বাজতে ভিতরের দুর্জয় তাড়না তাকে এখানে ঠেলে নিয়ে এসেছে। এমনিতে দেখা পাওয়ার আশা কম। আজ বাপী ভিতরে ঢুকেই পড়বে। তারপর যা হয় হবে। এরকম ঝোঁকের ফলেই অন্য কোনো বাস্তব সম্ভাবনা তার হিসেবের মধ্যে ছিল না।

খাবার লোভে বা সঙ্গিনীর লোভে কোনো বেপাড়ার কুকুর সীমানা লঙ্ঘন করে ঢুকে পড়লে পাড়ায় সগোত্র-দল সেটা যেমন বরদাস্ত করে না, ঘেউ ঘেউ রব তুলে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে আঁচড়ে কামড়ে ওটাকে পাড়া-ছাড়া করতে

চায়—হঠাৎ সেই গোছের দাঁড়াল অবস্থাখানা। রোববারের রকের মজলিশে জন পাঁচেক বসে। পর পর কদিন সকাল-বিকেলে দুবেলা একটা উটকো লোককে ওই সাতাশি নম্বর বাড়ির সামনে টহল দিতে দেখেছে তারা। সামনের দোতলা বাড়ির সোনালি ফ্রেমের চশমা পরা সুশ্রী লোকটাও দেখেছে। সকলেরই একসঙ্গে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

আগেও এদের হাব-ভাব সদয় মনে হয়নি বাপী তরফদারের। তা বলে এরকম অতর্কিত হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সাতাশি নম্বরের সামনে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে রকের ছেলেগুলো উঠে এসে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। ওদের এক মুরুব্বির হাত সোজা তার কাঁধের ওপর উঠে এলো।

—কি মতলব ব্রাদার ?

বাপী তরফদার জবাব হাতড়ে পেল না। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

পাশ থেকে একজন সোল্লাসে ফোড়ন কাটল, অসুবিধে দেখে ব্রাদার বোবা হয়ে গেছে, দু'ঘা না বসালে কথা বেরুবে না।

এসব মজার ব্যাপারের চট করে গন্ধ পায় লোকে। অবশ্য একটু চেঁচামেচিও শুরু হয়ে গেছে। এদিক ওদিক থেকে বাচ্চা-কাচ্চারা স-কলরবে দৌড়ে আসছে। রাস্তার দুদিকেরই দোতলার বারান্দায় লোক দেখা যাচ্ছে। ভেবাচাকা খাওয়া মুখ তুলে বাপী তরফদার তাদেরও দেখল একবার। এদিকে মালবিকা···মিষ্টি···রেলিংএ ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। পাশে তার মা। ওদিকে সেই সোনালি ফ্রেমের চশমা। পাশে আরো দুই-একজন। পরিস্থিতি জমে উঠতে যারা তাকে ছেঁকে ধরেছে তাদেরও উল্লাস বেড়েছে। এদিক ওদিক থেকে ধাক্কা মেরে কথা বার করতে চেষ্টা করছে। মুরুব্বিটি কাঁধে একটা বড় ঝাঁকুনি দিয়ে গর্জন করে উঠল, জিভ টেনে ছিঁড়ব বলে দিলাম। কি মতলবে রোজ দুবেলা এখানে এসে ছোঁক-ছোঁক করা হচ্ছে ?

নিরুপায় বাপী তরফদার এবারে সাতাশি নম্বরের বাড়িটাই দেখিয়ে দিল। ওখানে ঢোকার জন্যে।

ছেলেগুলো থমকে গেল একটু। সকলেই বাড়িটার দিকে তাকালো। দলের মুরুব্বি এবারে যথাসম্ভব গলা মিষ্টি করে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, মাসিমা কদিন ধরে এই লোকটা আপনাদের বাড়িতে ঢোকার জন্যে ঘুরঘুর করছে বলছে—একে চেনেন নাকি ?

সরোষে মাথা নেড়ে মনোরমা নন্দী ভিতরে চলে গেলেন। মেয়ে দাঁড়িয়েই থাকল।

কাঁধ ছেড়ে মুরুব্বি এবার মুঠো করে বুকের জামা টেনে ধরল তার।—শালা মেরে একেবারে তক্তা বানিয়ে দেব—পাড়ায় ঢুকে এত সাহস তোমার?

সঙ্গে সঙ্গে এদিক-ওদিক থেকে জামা ধরে টানাটানি চলল। জামাটা ফ্যাস-ফ্যাস করে ছিঁড়তে থাকল। কাঁধে কোমরে দুই-একটা গুঁতোও পড়ল। একজন চুলের মুঠি চেপে ধরেছে।

সামনের বাড়ির দোতলা থেকে সোনালি ফ্রেমের সুশ্রী তরুণ গম্ভীর নির্দেশের সুরে বলল, ঘাড় ধরে পাড়ার বার করে দিয়ে এসো, আর যেন না ঢোকে!

এই নির্দেশ মতোই কাজ করল ছেলেগুলো। মারধরের দিকে না গিয়ে রাস্তা পার করে দেবার জন্যেই সামনের মোড় পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে চলল তাকে। যে লোভে নিজেরা সকাল-বিকেল রকে বসে থাকে সেই লোভেই আর একজন একটু বেশি এগিয়ে এসেছে বলে কত আর হেনস্থা করা চলে। আশা তো কারোরই নেই, চোখে দেখাই সার। মোড়ের এধারে ছেড়ে দিয়ে শুধু শাসালো, আর এদিকে রস করতে এসো না ব্রাদার, ওই অসিতদা না বললে আজ তোমার মিষ্টি মুখখানা একেবারে থেঁতো হয়ে যেত।

তার ওপর দিয়ে বিস্ময়ের পলকা রঙ চড়ালো আর একজন।—কি ব্যাপার বল্ তো মাইরি, ওই অসিতদার সব থেকে বেশি কলজেয় জ্বালা ধরার কথা, আর সে-ই আগেভাগে ক্ষমা করে ফেলল!

মুরুব্বি গম্ভীর মন্তব্য করল, রোমান্টিক গ্রেটনেস। থাম্ এখন—

বাপীকে বলল, যাও বাছা, ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাও—

ওরা ফিরে চলল। বাপী তরফদার সেদিকে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সামনের বাড়ির দোতলার সোনালি ফ্রেমের চশমা-পরা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ফর্সা লোকটাই অসিতদা হবে। একটা মেয়ের জন্য তারও কলজে পুড়ছে আগেই বুঝেছিল। এখন আরো ভালো বোঝা গেল।

হনহন করে হেঁটে চলল বাপী তরফদার। কারো দিকে তাকাচ্ছে না। মনে হচ্ছে সকলেই আস্ত ট্রাউজারের ওপর লণ্ডভণ্ড ছেঁড়া জামাটা দেখছে। আক্রোশের একটা জ্বলন্ত পিণ্ড গলার কাছে দলা পাকিয়ে আছে। সেখান থেকে একটা অসহ্য তাপ চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়ছে।

এত বড় হামলাটা যারা করল, রাগ এই মুহূর্তে তাদের ওপর নয়। গুষ্টির পিণ্ডি ওই অসিতদা না কে, তার ওপরেও নয়। আক্রোশ নিজের ওপর। আরো বেশি দোতলার রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়ানো ওই মেয়ের ওপর। যার নাম

মালবিকা। মিষ্টি। তাকে ঘিরে সেই মেয়ে একপাল পথের কুকুরের খেয়োখেয়ির মজা দেখছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।···আবু রব্বানী বলেছিল, মরদ হোস তো শোধ নিবি। সেই চরম শোধের নিষ্ঠুর অভিলাষ শিরায় শিরায় জ্বলছে এখন।

উঠোনে পা দিতেই রতন বণিকের বউ কমলার সঙ্গে চোখাচোখি। এটাই সব থেকে অবাঞ্ছিত বাপী তরফদারের। উঠোনের একধারের বাঁধানো কলতলায় শুধু কমলা ছাড়া আর কেউ নেই। বেলা দশটার ওধারে এখন কারোই থাকার কথা নয়। ছুটির দিনে পুরুষেরা ভালো-মন্দ বাজার করে আনে, তারপর ঘরে বসে বা বাইরে কোথাও আড্ডায় মশগুল হয়। মেয়েরা রান্নায় ব্যস্ত থাকে। টিউবওয়েলের হাতল চালিয়ে কমলাকে ওখান থেকে জল নিতে কমই দেখা যায়। তার ঘরের জল এমন কি স্নানের জলও রতনই তুলে দেয়। তাদের রান্নাঘরের পিছনে ছোট ঘেরানো স্নানের জায়গা আছে। আব্রু যাদের দরকার তাদের অনেক ঘরেই এরকম ব্যবস্থা।

আজ হয়তো কোনো কারণে জল ফুরিয়েছে। রবিবারে বেলা দুটো আড়াইটের আগে রতনের টিকির দেখা মেলে না। বাজার ফেলে দিয়েই সে বেরিয়ে পড়ে। ছুটির দিন মানেই তার কিছু বাড়তি রোজগারের দিন। বেশ খানিকটা আদর-কদর মেলার দিন। অনেক ক্লায়েন্ট জোটে। কোনো কোনো রবিবারে আবার আপিসের বাবুদের বাড়িতেও ভবিষ্যৎ-বচন শোনাতে যেতে হয়।

অন্য দিন হলে টিউবওয়েলের হাতল চালিয়ে কমলার ঘড়ায় জল ভরার দৃশ্যটা দেখতে মন্দ লাগত না বাপীর। আজ ভিতরটা ডবল চিড়বিড় করে উঠল। শুধু ওর হেনস্থা দেখার জন্যেই যেন বউটা এ-সময় ওখানে দাঁড়িয়ে।

কমলার এদিকে অর্থাৎ সামনের দিকে মুখ। উঠোনে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে চোখাচোখি। টিউবওয়েলের হাতল হাতেই থেকে গেল। নামছে উঠছে না। কমলার দু'চোখ কপালে।

ওই দৃষ্টি থেকে সরোষে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে বাপী তরফদার ঘরে ঢুকেই ঠাস করে দরজা দুটো বন্ধ করে দিল। নড়বড়ে দরজায় ছিটকিনি নেই, ছেড়ে দিতেই চার-ছ' আঙুল ফাঁক আবার।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে ক্যাঁচ করে একটা মৃদু শব্দ কানে আসতেই বা ঝাঁজালো দৃষ্টি দরজার দিকে। এক পাট খুলে কমলা ঘরে ঢুকল। শাড়ির আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে দু পা এগিয়ে এলো। বাপী তার খাটিয়ায়

বসে। ছেঁড়াখোঁড়া জামাটাও গা থেকে খোলার ফুরসৎ পেল না। দু চোখের উগ্র ঝাপটায় ওকে আবার ঘর থেকে বার করে দিতে চায়।

চোখের বিস্ময় মুখে নেমে এলো কমলার।—ব্যাপার কি গো বড়বাবু মারামারি-টারামারি করে এলে নাকি কোথাও থেকে?

এই অবস্থা দেখে ঢুকেছে যখন এমনিতে ঘর ছেড়ে চলে যাবার মেয়ে নয় কমলা। বাপী কি করবে এখন? জবাবে উঠে ওকে ধাক্কা মেরে বার করে দেবে?

কমলা খুঁটিয়ে দেখছে ওকে। উসকোখুসকো চুল, ক্রুদ্ধ বিবর্ণ মুখ, ছেঁড়া-খোঁড়া ঝলঝলে জামা। চকিতে কাছে এগিয়ে এলো সে। বাপীর হাঁটুর লাগালাগি প্রায়। তারপর ঝুঁকে ছেঁড়া জামার ভিতর দিয়ে গা দেখতে চেষ্টা করল। আঘাতের দাগ চোখে পড়ে কিনা সভয়ে তাই দেখছে।

বাপীর গলার কাছে একটা গরম নিঃশ্বাসের ছেঁকা লাগল। পরের মুহূর্তে মাথায় ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে গেল। দুটো চোখের শলাকা কমলার ঝুঁকে পড়া মুখ থেকে নেমে বুকের ওপর বিদ্ধ হল।·· বহুদিনের উপোসী ক্রুদ্ধ জানোয়ারটাকে এই মুহূর্তে খোলস ছিঁড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেবে? স্থান ভুলে কাল ভুলে রসাতলে ডুবে যেতে দেবে? আজকের অত বড় অপমানের জ্বালা জুড়োবে তাহলে?

আবার সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কমলা বিষম থতমত খেল এক প্রস্থ। দু'পা পিছনে সরে গেল। এরকম চাউনির একটাই অব্যর্থ অর্থ হতে পারে বুঝি। কৈফিয়তের সুরে বলল, কোথাও লাগল-টাগল কিনা দেখ-ছিলাম ··

ফাঁড়া কাটলো। নিজের কি সামনে যে দাঁড়িয়ে তার, বাপী জানে না। মাত্র কটা মুহূর্তের মধ্যে নিজের সঙ্গে অনেক যুঝে অশান্ত ক্রুদ্ধ জানোয়ারটাকে আবার খোলসের ভিতরে ঠেলে দিতে পেরেছে। কিন্তু তার ধকল চোখেমুখে এখনো এত স্পষ্ট যে কমলাও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মনে হল। বাপী তার মুখের ওপর রূঢ় ঝাপটা মেরে বসল একটা।—কেন দেখছিলে? কেন তোমরা এভাবে জ্বালাতন করো আমাকে?

—আমরা! কমলার বিস্ময়-ঝরা দু'চোখ তার মুখের ওপর নড়েচড়ে স্থির হল।···অন্য কোনো মেয়ের জ্বালাতনে আজ এই হাল নাকি তোমার?

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেই চলেছে।—তুমি যাবে এখন এখান থেকে?

কমলা মোলায়েম করে বলল, কি হয়েছে শুনি আগে—উঠোনে পা দিতেই ওই মূর্তি দেখে আমি আঁতকে উঠেছিলাম—

খাটিয়া ছেড়ে বাপী প্রায় তেড়েই এলো, তুমি এক্ষুনি যাবে কি যাবে না আমি জানতে চাই ?

কমলা চেয়ে আছে। রাগ ছাড়া আরো কিছু দেখার আছে যেন। এক পাট খোলা দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল। গম্ভীর। শামলা মুখ একটু মচকে বলল, আমার বাড়ি আমার ঘর, তুমি তাড়াবার কে ?

—ও। ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি।

অসহিষ্ণু হাতের টানে ছেঁড়া জামাটা ছিঁড়েই গা থেকে খুলে খাটিয়ার ওপর আছড়ে ফেলল। দড়ি থেকে আর একটা আস্ত জামা টেনে নিয়ে সরোষে দরজার দিকে এগিয়েই থমকে দাঁড়াল। এক পাট খোলা দরজা আগলে কমলা তেমনি দাঁড়িয়ে।

দুজনে সোজা তাকালো দুজনের দিকে। বাপীর লাল চোখ। কমলা প্রায় তেমনি গম্ভীর।

—কি হল, যাও ?

বাপী ফুঁসে উঠল, সরো বলছি !

পিছনে ঘাড় ফিরিয়ে একবার বাইরেটা দেখে নিল কমলা। কেউ নেই। থাকলেও এই দিনমানে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করতে দেখলে খুব কিছু মনে করবে না কেউ। বুড়োর গণনা আর বোলচালের ফলে বডবাবুকে এখনো মস্ত বাবুই ভাবে সকলে।

আবার সোজা তাকিয়ে পলকা ঝাঁজে কমলা বলল, এক বস্ত্রে চলে যাচ্ছ—তোমার ওই রাজ-শয্যা, বাড়তি জামাটামা আর ওই ভাঙা টিনের সুটকেস কার জন্য রেখে যাচ্ছ ?

বয়েস মাত্র বাইশ, কিন্তু নিজের ভিতরের বয়েস কতো এগিয়ে আছে বাপীই শুধু জানে। রমণীর এই তেজ আর এই উক্তির বিপরীত রসের আঁচটুকু ভালোই অনুভব করতে পারে। সভয়ে এদিকটাই এড়িয়ে চলেছে এতকাল। কিন্তু আজ হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। এই মেয়ে ভিতর দেখেছে তার। সেই জোরেই এভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এমন কথা বলছে।···এক মেয়ের চোখের ওপর অপমানের সেই চাবুকের জ্বালা আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে। এখন সামনে এক হাতের মধ্যে যেভাবে আর একজন দাঁড়িয়ে, তাকে দেখে জ্বালা জুড়োবার সেই ক্রূর লোভ নিজের দুটো চোখের তারায় আবারও চিকিয়ে উঠছে।

এবারে কমলার গলার স্বর মোলায়েম-এ।—ঠাণ্ডা হয়ে বোসো গে যাও।

তার পর ইচ্ছে হয় বলবে, ইচ্ছে না হয় বলবে না। আমি কি তোমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছি!

ভিতরের অসহিষ্ণু তাড়না মাড়িয়ে বাপী খাটিয়ায় এসে বসল।

কমলা অনড় তার পরেও। দেখছে।—এক গেলাস চা করে এনে দেব?

—না!

—বাবা রে বাবা, বাইরে কোথায় কি কাণ্ড করে এসে এখন ঘরের ভালো মানুষদের কাছে যত দাপট আর হম্বি-তম্বি।…রান্নাটা সেরে ফেলিগে যাই, তুমিও চানটান করে মাথা ঠাণ্ডা করো।

যেতে যেতে চোখের কোণ দিয়ে খাটিয়ায় বসা মুখখানা আর একবার দেখে নিল।

বাপী সটান শুয়ে পড়ল। স্নায়ুর ওপর দিয়ে আবার এক প্রস্থ ঝড় বয়ে গেছে। অসাড়ের মতো পড়ে থাকল খানিক। নিজের বুকের তলায় ঢিপঢিপ শব্দ কানে আসছে। হঠাৎ নিজের ওপরেই আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল সে। এই পৃথিবীর মুখ একেবারে না দেখলে কি হত? না জন্মালে কি হত? মানুষের খোলসে ঢাকা ভিতরের এই হিংস্র অবুঝ জানোয়ারটাকে আর কতকাল ধরে পুষবে? মাত্র কটা মুহূর্তের জন্য হলেও খোলস ছিঁড়ে নিঃশব্দ হুংকারে ওটা বেরিয়েই এসেছিল। থাবা উঁচিয়েছিল। কমলা দেখেছে। চিনেছে। অথচ সত্যিই তার দোষ নেই। যে মূর্তিতে ঘরে ফিরতে দেখেছে, আঁতকে ওঠারই কথা। ছুটে আসারই কথা।

চোখের সামনে আর একখানা মুখ ভেসে উঠল। সে-ও রমণীর মুখ। অকরুণ মুখ। কিন্তু সেদিন সেই সময়ে খুব অকরুণ ছিল না। মণিদার বউ গৌরী। বাপীর থেকে ছ' বছরের বড় গৌরী বউদি। রসভঙ্গের এক মূর্তিমান কৌতুকের মতো বাপী তরফদার অসময়ে বাড়ি ফিরেছিল সেদিন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে দেরি তখনো। সেই প্রকাশ্য নির্জনে পাশের লাগোয়া ফ্ল্যাট থেকে কোনো পুরুষের বেপরোয়া অভিলাষের আবেদন এবং এ ফ্ল্যাট থেকে সেটা নাকচের নিঃশব্দ প্রহসন চলছিল। বাপী তরফদার স্বচক্ষে দেখেছে। দোতলার বারান্দা থেকে ওকে দেখে পাশের ফ্ল্যাটের দিকে একটা লঘু ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করেছিল গৌরী বউদি। রস-ভঙ্গের ব্যাপারখানা উপভোগ্য ব্যতিক্রমের মতো।

…সেদিনও মাথায় আগুন জ্বলছিল বাপী তরফদারের। অপমান আর হতাশার যন্ত্রণা ভিতরটা কুরে খাচ্ছিল। সেই মূর্তি দেখে কমলার মতো আঁতকে

উঠে গৌরী বউদি বসার ঘরের দরজা খুলে ছুটে না আসুক, কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিল।

—কি ব্যাপার? এ সময়ে যে?

জবাব না পেয়ে আর একটু এগিয়ে এসে গৌরী বউদি আরো ভালো করে দেখে নিয়েছিল।—এই মূর্তি কেন? কে তাড়া করল?

...সেদিনও বাপী তরফদার স্থানকাল ভুলেছিল। পুরুষের রোষে বাসনা ঝলসে উঠেছিল। মনে হয়েছিল অপমান আর হতাশার আক্রোশ উজাড় করে জাহান্নমে ডুবিয়ে দেবার মতো এক রমণীয় আধার নাগালের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

...আর, চোখের সামনে হঠাৎ একটা দুর্বিনীত তাজা পুরুষ দেখেছিল গৌরী বউদি।

কি মনে হতে বাপী তরফদার খাটিয়ায় উঠে বসল। তারপর জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে পরল। তাকে চান করে মাথা ঠাণ্ডা করতে বলে কমলা রান্না সারতে গেছে। রান্না শেষ হলেই আবার আসবে। ওকে ঠেলে স্নানে পাঠাবে। তারপর জোর করে ঘরে ধরে নিয়ে গিয়ে খেতে বসাবে। নয়তো এ-ঘরে ওর খাবারটা নিয়ে আসবে। পরে কি হবে বলা যায় না, কমলা গৌরী বউদির মতো নয় এখনো। তার মতো অকরুণ নয়। মায়া দয়া আছে। আছে বলেই ওই উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি দেখে ছুটে এসেছিল। আর অত ছলা-কলা জানে না বলেই অমন কাছে এসে ছেঁড়া জামার ভিতর দিয়ে ব্যাকুল চোখে গায়ে আঘাতের চিহ্ন খুঁজেছিল। আজ অন্তত কমলা ওকে বাইরে খেতে যেতে দেবে না। বাপী তরফদারের এটা নির্ভুল অনুমান।

আবার একটা অসহিষ্ণুতা ঘরের বাইরে ঠেলে নিয়ে এলো ওকে। তারপর উঠোনে নামিয়ে দিল।

—ও কি! না খেয়ে এ-সময় আবার চললে কোথায়? বড়বাবু শোনো—শোনো বলছি! উঠোনের চারদিকে ঘর, কত আর গলা উঁচিয়ে ডাকতে পারে কমলা?

বাপী তরফদার ফিরেও তাকালো না। হনহন করে বেরিয়ে গেল।

নিরুদ্দিষ্টের মতো হেঁটে চলল অনেকক্ষণ। অনেক পথ। এই করে নিজেকে ক্ষয় করার তাগিদ। কিন্তু ক্ষয় সত্যিই করা যায় না। ক্লান্তি সার। সামনে পার্ক। বকুল গাছের ছায়ায় একটা খালি বেঞ্চিতে গা ছেড়ে বসল। শীতকাল হলেও এই অবেলায় দ্বিতীয় লোক নেই পার্কে।

ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছু টের পাচ্ছে না। বুকের দিক থেকে একটা চিনচিন যন্ত্রণা শুধু পেটের দিকে নামছে। সেটা সাতাশি নম্বর বাড়ির সামনের সেই অপমানের যন্ত্রণা হতে পারে। নিজের ভিতরের গ্লানির দরুনও হতে পারে। গ্লানি স্বাভাবিক। ওপরঅলার অভিশাপের মতোই প্রবৃত্তির অবুঝপনা হঠাৎ-হঠাৎ দখল নিয়ে বসে তার ওপর। নইলে বরাবর একটাই লক্ষ্য তার। একজনই লক্ষ্য। আট বছর ধরে ভিতরে বাইরে একজনকেই সে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেছে। আট বছর বাদে তার দেখা মিলেছে।

সব ভুলে বাপী তরফদার তুটো মেয়েকে দেখছে এখন চোখের সামনে। একজনের বয়েস দশ। নাম মিষ্টি। ফুটফুটে রং। ফোলা-ফোলা গাল। মাথায় ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল। বাপী নামে একটা তুরন্ত ছেলে মিষ্টি খেয়ে জল খেতে চায় শুনে সে রাগে ফুঁসছে, জিভ ভেঙাচ্ছে।

…আর একজনের বয়েস আঠের। নাম মালবিকা। গাল তুটো ফোলা নয় একটুও। মেদ-ঝরা সুঠাম দেহ, টানা মুখ। আয়ত চোখ। অনেক কম ফর্সা কিন্তু ঢের বেশি তাজা।…বাপী তরফদারের একটা বয়েস চৌদ্দয় আটকে আছে, আর একটা বয়েস বাইশ ছাড়িয়ে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে কেউ কল্পনা করতে পারে না। ওই মেয়েও না। ওই মেয়ে চেনেও না তাকে। চেনার আগ্রহও নেই। বাড়ির দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হৃষ্টচিত্তে একটা অপমানের প্রহসন দেখেছে শুধু। নিগ্রহ দেখেছে।

বাপী তরফদার সোজা হয়ে বসল। স্নায়ুগুলো সব টান হয়ে উঠল। নিঃশ্বাসে এক ঝলক তপ্ত বাষ্প ঠেলে বেরুলো। চৌদ্দ বছরের একটা ছেলের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মুখ দেখছে। সেটা যদি শেষ কথা না হয়ে থাকে, আজকের এই অপমান আর নিগ্রহও শেষ কথা নয়। বাপী তরফদার তা হতে দেবে না।

বছরগুলো পিছনে সরে যাচ্ছে। আট বছর…ন' বছর…দশ বছর। চোখের সামনে শান্ত গম্ভীর রহস্যে ছাওয়া বানারজুলি এগিয়ে আসছে।

॥ পাঁচ ॥

তুপুরেও আকাশ সেদিন মেঘলা ছিল। পিছনের দিকে তাকালে বুক পর্যন্ত কালচে মেঘে ঢাকা পাহাড়ের সারির মাথাগুলো শুধু দেখা যাচ্ছিল।

বাপী বৃষ্টি ভালবাসে না। কিন্তু মেঘলা আকাশ ভারী পছন্দ। আর এই মেঘে পেট-ঠাসা হিমালয়ও। ঝমঝম বৃষ্টি এসব জায়গায় লেগেই আছে।

তখন ঘরে থাকলে বেরুনো দায়। পিসী চোখে আগলায়। কাঠের ঘরে বসে তখন জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখলেও পিসী থেকে থেকে এসে শাসিয়ে যায়, জল মাথায় করে কেউ এখন বাইরে বেরুলে আর রক্ষা নেই—বাবাকে বলে ঠ্যাং ভাঙার ব্যবস্থা না করে ছাড়বে না।

বাপী পিসীর তম্বির পরোয়া করে না। বারো বছর বয়সে এটুকু অন্তত বুঝেছে পিসী আর যা-ই করুক, বাবার কাছে ওর নামে নালিশ করবে না। আসলে জলে বেরুতে বাপীর নিজেরই ভালো লাগে না। জংলা রাস্তাগুলো সব পিছল আর প্যাচপ্যাচে হয়ে যায়। গাছে পাখি কলকল করে না। বাঁদরগুলো সব মৌনী হয়ে বসে থাকে। খরগোশ আর বনমোরগগুলোর টিকির দেখা মেলে না। যদি বা দুই একটা চোখে পড়ে, পিছল রাস্তায় তাড়া করা যায় না।

তার থেকে মেঘলা আকাশ ভালো। বানারজুলির পেল্লায় জঙ্গলখানার তখন আর এক চেহারা। শাল শিশু অর্জুন জারুল দেবদারু ইউক্যালিপটাস —এই-সব বড় বড় গাছগুলো তখন বেজায় গম্ভীর। আর তাই দেখে ছোট গাছগুলোও যেন ঘাবড়ে গিয়ে চুপ মেরে থাকে। আকাশে স্যিয্যি ঠাকুর যতই জ্বলুক, এমনিতেই জঙ্গলের মধ্যে ছায়া-ছায়া ভাব। উনি মেঘে ঢাকা পড়লেই সেই ছায়া-ভাবটা ঘন থমথমে হয়ে ওঠে। আর তখনই জঙ্গলটাকে বাপীর সব থেকে ভালো লাগে। ওটা তখন অদৃশ্য একটা হাত বাড়িয়ে ওকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসতে চায়। এমন কি পাঁচ মাইল দূরেব স্কুলের ক্লাসে বসেও বাইরে মেঘলা আকাশ দেখলে ভিতরটা পাখা মেলে বানারজুলির ওই জঙ্গলে এসে সেঁধোয়, তারপর ইচ্ছাসুখে হুটোপুটি করতে থাকে। এক-একদিন তো এমন হয়, স্থান-কাল মনে থাকে না। মাস্টারমশাই উঠে এসে কান টেনে ধরে। অন্য ছেলেরা হাসাহাসি করে।

আর, তখন ঘরে থাকলে তো কথাই নেই। ছুটির দিনের দুপুর হলে সোনায় সোহাগা। পিসীর চোখে ধুলো দিয়ে ছোট্ট মজবুত লাঠিখানা হাতে করে ছুটে বেরুবেই। ওই ছোট্ট জুতসই লাঠিটা ওকে দিয়েছিল আবু রব্বানী। তেল খাইয়ে-খাইয়ে ওই লাঠি বাপী এখন প্রাণের জিনিস করে তুলেছে। জঙ্গলে ঢোকার আগে আরো কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করে নিতে হয়। শার্টের দু পকেট আর প্যান্টের দু পকেট বাছাই নুড়ি-পাথরে বোঝাই করে নেয়। ফুরোলে ওই অস্ত্র জঙ্গলেও মেলে। জল পড়লে ওপরের মাটি কাদা হয় বটে, কিন্তু আসলে তো পাথুরে জঙ্গল।

পাথর হাতে নিলেই বাপীর আবুকে মনে পড়ে। টিপ বটে হাতের। টিপের কমপিটিশন বা প্রাইজ থাকলে আবুকে দুনিয়ার কেউ হারাতে পারত না বোধ হয়। ওর মতো টিপ করার জন্য বাপীরও চেষ্টা বা নিষ্ঠায় ফাঁক নেই। ফারাক ঠিক করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গাছের মোটা-সরু ডাল লক্ষ্য করে প্রায়ই টিপের মহড়া দিতে হয়। এই করে করে তারও হাতের টিপ মন্দ নয় এখন.। কিন্তু আবু রব্বানীর ধারে কাছে নয় তা বলে।

বাপী কোনো সময়ই বৃষ্টি পছন্দ করে না এমন নয়। লোকে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলে তারপর দুটো কাঁটাই ফেলে দেয়। বাপীরও তেমনি স্কুলে রওনা হবার আগে ভাগে বৃষ্টি এনে স্কুল কামাই করার তাড়না। তারপর বৃষ্টি আর স্কুল দুইই চুলোয় যাক। যেমন আজকের এই দিনটায় এই রকমই হবে আশা করেছিল। পড়ার বই সামনে রেখে সকাল থেকে নটা পর্যন্ত জানলা দিয়ে ঘন ঘন আকাশ দেখেছে। সকাল ছটা থেকে আটটা পর্যন্ত ওই আকাশ মেঘে কালি। কালো কালো মেঘের চাঙড়ে হিমালয়ের পেট-বুক ঢাকা। গলা উঁচিয়ে না পড়লে বাবা আর পিসী ভাবে পড়ায় ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। মেঘের সাজ দেখে আনন্দে বাপীর গলা আপনি চড়ছিল। ওই মেঘ হুড়মুড় করে আজ গোটা বানারজুলির ওপর ভেঙে পড়বেই।

কিন্তু বেলা সাড়ে নটার আগে ভাঙুক এটা চায় না। চান-খাওয়া সেরে ঘড়ি ধরে রোজ পৌনে দশটায় এক গাদা বই-খাতার ঝোলা কাঁধে ফেলে স্কুলে রওনা দিতে হয়। স্কুল বসে বেলা এগারোটায়। পাঁচ মাইল দূরে সেই বানারহাটে স্কুল। অত পথ হাঁটার ধকল কিছু নয়, রাস্তায় একে একে আরো অনেক ছেলে জোটে। হৈ-হৈ করে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু আসলে স্কুলটুল ভালো লাগে না। ক্লাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকার চিন্তাতে গায়ে জ্বর আসে। সকালে ঘুম ভাঙলেই স্কুলে না যাওয়ার নানা ফন্দি মাথায় জট পাকাতে থাকে। সকালের জলখাবার খেতে খেতে পিসীকে প্রায়ই শুনিয়ে রাখে, এই এই কারণে আজ স্কুলে যাবে কি যাবে না ঠিক নেই। কিন্তু হাসতে-মানা বাবাটি সামনে এসে দাঁড়ালেই সব ফন্দি-ফিকির মাথা থেকে উধাও হয়ে যায়।

কিন্তু আজকের আকাশ আর পাহাড় দেখে স্কুল ফাঁকির চিন্তা থেকে মাথাটাকে বিশ্রাম দেওয়া গেছে। আজকের দিনের ব্যবস্থা যা হবার ওখান থেকেই হচ্ছে। অল্প বৃষ্টিতে বাবা যদি ছাতা নিয়ে স্কুলে যেতে বলে, পিসী সে হুকুমও বরবাদ করে দেয়। বৃষ্টিকে বড় ভয় পিসীর। এখানকার ভাষায়

'ম্যালেরিয়া' জ্বর ঘরে ঘরে লেগে আছে। তার ওপর ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার না কি এক ঘোড়ার ডিমের ব্যামোয় জঙ্গলের আর আশ পাশের চা-বাগানের কতগুলি লোক ধপাধপ মরল। পিসীর ধারণা জলে ভেজার থেকেই যত রাজ্যের ব্যামোর উৎপাত।

কিন্তু ঘড়িতে যখন নটা, বারো বছরের বাপীর মেজাজের তখন বারোটা। ওই আকাশ তার সঙ্গে একটা বড় রকমের বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মেঘ এখনো গোটা আকাশ জুড়ে আছে বটে, কিন্তু এখন আর তেমন ঘন গভীর নয়। পাহাড়ের বড় গাছগুলোও একটু একটু দেখা যাচ্ছে। মেঘ-বিশারদ না হলেও অনেক লক্ষ্য করার ফলে বাপী মোটামুটি ওদের হালচাল জানে। হলপ করে বলতে পারে ঘণ্টাকতকের মধ্যে এই মেঘ আর বর্ষাবে না।

মেজাজটাই খিঁচড়ে গেল। হাতের বই চটাস করে টেবিলে ফেলে উঠে দাঁড়ানোর ঝাঁজে বসার বেতের চেয়ারটা পিছনে ওলটালো। ওটার ওপর আর একটা লাথি ঝেড়ে গটগট করে সোজা হেঁসেলে পিসীর কাছে।—আমি আজ স্কুলে যাচ্ছি না—কক্ষনো যাচ্ছি না।

এরকম শুনে পিসীর দু কান অভ্যস্ত। মুখ না ফিরিয়ে বললেন, আজ আবার কি হল, আজ তো আরো কষ্ট কম হবে, ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় চলে যাবি—

রাগের চোটে ভেংচে উঠল বাপী।—ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় চলে যাবি— ঠাণ্ডার জন্যে পাঁচ মাইল রাস্তা কমে দু মাইল হয়ে যাবে? হাঁটতে হাঁটতে পায়ের সুতো ছিঁড়ে যায়, ফেরার সময় জিভ বেরিয়ে পড়ে— তবু একটা সাইকেল কিনে দেবে না—আর ছ' মাস ধরে ভোলানা হচ্ছে সাইকেল হবে! আজ আমি যাব না, যাবই না! বাবাকে বলে দাও আমার পা দুটো আজ সকাল থেকে টনটন করছে।

এতটুকু ছেলের পাঁচ-পাঁচ দশ মাইল হেঁটে যাওয়া-আসা পিসীর চোখেও অত্যাচারের সামিল। চা-বাগানের অনেক বাবুর বাড়িতেই সাইকেল আছে। তাদের ছেলেরা বেশির ভাগ সাইকেলে স্কুল যাতায়াত করে। আবার অনেক সমবয়সী তাদের ক্যারিয়ারে বসে যায়। বাপী ছোট বলে তাদের কাছে খুব একটা পাত্তা পায় না। তাছাডা ওর নিজেরও দয়া চাইতে ইচ্ছে করে না। সাইকেল চড়া শেখার আন্তরিক অভিলাষ একমাত্র আবুর কাছে ব্যক্ত করেছিল। আবু বলেছিল, শিখে কি হবে, তোর বাবা কিনে দেবে?

বাপী বলেছে, পিসীর পিছনে লেগে থাকব, তার তাগিদে বাবা একদিন না একদিন কিনে দেবেই।

এরপর আবু চা-বাগানের কোন্ এক পিওনের কাছ থেকে একটা ঝর্ঝরে সাইকেল যোগাড় করে এনেছিল। চালাতে শেখা এক দিনেই হয়ে গেছল। তারপর কিছু দিন ওই নেশায় পেয়ে বসেছিল তাকে। ছুটির দিনে ঘণ্টা কতকের জন্য একটা সাইকেল তার চাই-ই। পিসীর কাছ থেকে চার আনা আট আনা আদায় করে আবুর হাতে দিত। আবু কখনো পিওন কখনো আরদালিকে ঘুষ দিয়ে সাইকেল যোগাড় করত। কারো কাছে ভালো সাইকেল দেখলে লোভে দু চোখ চকচক করে ওঠে বাপীর। চুরি করে পার পেলে আপত্তি হত না বোধ হয়। বড় সাধ, ওরও একদিন ঝকঝকে একটা সাইকেল হবে।

কিন্তু এক বছরে আশা অনেক ফিকে হয়ে এসেছে। পিসীর কথা বাবা কানে তোলে না। পিসীর দরদ আছে। দুধের ছেলের অত পথ হাঁটাটা তার বুকে লাগে। নিজের উদ্যোগে ভাইপোর সাইকেল চড়াটা শেখা হয়ে গেছে যখন, সাইকেল একটা ওকে কিনে দেওয়াই উচিত। এই উচিত কথাটা বাবাকে অনেকবার শুনিয়েছে পিসী। গোড়ায় গোড়ায় বাবা কোনো জবাবই দেয়নি। আড়াল থেকে বাপী কখনো তাকে ভুরু কোঁচকাতে দেখেছে, কখনো না শোনার মতো করে পাশ কাটতে দেখেছে। কিন্তু পিসীর তাগিদে কামাই নেই। কারণ পিসীর ওপর বাপীর না-ছোড় জুলুম। শেষে বাবা একদিন মহা বিরক্ত। তেতে উঠে পিসীকে বলল, প্রথম যেদিন বলেছ সেদিনই তোমার কথা আমার কানে গেছে। আমার কি মাটির তলায় টাকা পোঁতা আছে যে ভাবছ ইচ্ছে করে দিচ্ছি না? শুনে রেখেছি, সুযোগ-সুবিধে যদি হয় কখনো—দেব। রোজ তোমার এই এক বায়না নিয়ে আসার দরকার নেই।

বাস, সেই থেকে পিসীরও আর তাগিদ দেওয়ার সাহস নেই।

ডালের কড়া নামিয়ে সুধারাণী ভাইপোর মুখখানা দেখলেন একবার।—সকাল থেকেই বুঝি স্কুলে না যাবার ফন্দি আঁটছিস—তোর বাবা সাইকেল কিনে না দিলে আমি কি করব—আমার টাকা আছে?

বাপীর চোখে পিসীর টাকা না থাকাটাও অপরাধ।—টাকা নেই তো স্কুলে পাঠানোর এত গরজ কেন? আমার কষ্ট হয় না? আজ আমি স্কুলে যাব না—যাবই না।

পিছনে বাবার চটির আওয়াজ কানে আসতে সচকিত। তাঁরও চানে যাবার সময় এটা। খেয়েদেয়ে দশটার মধ্যে হরিনারায়ণবাবু দপ্তরে গিয়ে বসেন।

অধস্তনদের কাছে তিনি কেরানীবাবু। অন্যদের কাছে শুধু হরিবাবু। সকালের কাজ সেরে দিদিকে কাঠের আলমারির চাবি দিতে এসেছেন। ওই আলমারিতে দরকারী কাগজপত্র থাকে।

ছেলের কথা কানে যায়নি, চড়া গলা শুনেছেন। মুখ দেখেই কিছু একটা ঝকাঝকির আঁচ পেলেন।—কি হয়েছে ?

বাপী পালাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু বাবা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সুধারাণী সামাল দিতে চেষ্টা করলেন, ওর আজ পা কনকন করছে, অত পথ হেঁটে স্কুলে যেতে চাইছে না—

বাপীর মনে হল চোখ দুটো দিয়েই বাবা ওর কান টেনে ধরল। কথাগুলো ঠাস ঠাস করে দু-গালে দুটো চড় পড়ার মতো।—দশ মিনিটের মধ্যে চান সেরে খেতে বোস্—

বাপী পাশ কাটালো। বাবার ওপরেই সব থেকে বীতশ্রদ্ধ। আড়াল থেকে পিসীর গলা কানে আসতে সাগ্রহে কান পাতল।

—তোর সবেতে বেশি বেশি, ওইটুকু ছেলের রোজ অত পথ হাঁটতে কষ্ট তো হয়ই—একটা সাইকেল কিনে দিবি-দিবি করেও তো দিলি না।

বাবার চাঁচাছোলা জবাব।—ওর থেকে ঢের বেশি কষ্ট আমরা করেছি—এখনো করছি। অত বেশি আসকারা দিও না, গরিবের ছেলে গরিবের মতো বাড়তে দাও। একটা সাইকেল কিনতে অনেক টাকা লাগে, বুঝলে ?

ঠক করে কাঠের মেজেতে চাবি ছুঁড়ে দেওয়ার শব্দ। তা সত্ত্বেও পিসীর গলা কানে এলো আবার, তুই তো কেবল আসকারা দিতেই দেখিস—কবে পাঁচ-পাঁচ দশ মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে স্কুলে গেছিস এসেছিস—বাড়ির দোরগোড়ায় স্কুল ছিল। নতুন না পারিস, দেখে-শুনে একটা পুরনো কিনে দে না—

আড়ালে বাপীর উৎফুল্ল মুখ। পিসীর সাহস আছে বলতে হবে। বাবার ফটফট চটির আওয়াজেই মেজাজ বোঝা যায়। বাপী আড়াল থেকে হাওয়া।

খেয়ে দেয়ে সময় মতো কাঁধে বইয়ের থলে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। এই মেঘলা দিনে স্কুলে যেতে হচ্ছে। মুখ ভার। কিন্তু পিসীর ওপর আর রাগ করা সাজে না। বাইরে বেরিয়ে সরোষে আকাশের দিকে তাকাতে মেজাজ আরো বিগড়লো। নীল আকাশের বুক-জোড়া মস্ত একখানা কালচে অথচ হালকা মেঘের চাদর বিছানো। গা-পোড়ানো রোদের ছিটে-ফোঁটা নেই। ঠাণ্ডা, মিষ্টি বাতাস। বাঁধানো রাস্তার পাশ ঘেঁষে জঙ্গল। অদূরের লম্বা-লম্বা

গাছগুলো এখন থেকেই গম্ভীর। বাপীকে স্কুলে যেতে হচ্ছে বলে ওরাও যেন মনমরা। সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল বাবা বলে কোনো মানুষ যদি দুনিয়ায় না থাকত।

—কি রে, স্কুল চললি? পিছন থেকে কাঁধের কাছে মাঝারি জোরের চাপড় একখানা। আবু রব্বানা। ওর হাতে নিজের মাথার থেকেও এক হাত লম্বা সেই পাকা-পোক্ত লাঠি—যেটা দেখলে বাপীর দু চোখ জুড়িয়ে যায়। আবুরও সব থেকে পিয়ারের জিনিস ওইটি। লাঠির এক-দিকে রুপোর মতো ঝকঝকে বড়সড় একটা ইস্পাতের ফালা গোঁজা। ওটা দিয়ে শাপ-খোপ ছেড়ে মাঝারি সাইজের জন্তু-জানোয়ারকেও অনায়াসে ঘায়েল করা যায়। ঘায়েল করার দৃশ্য বাপী নিজের চোখেই কম দেখেনি। কিন্তু বাইরে থেকে ইস্পাতের ধারালো ফালা দেখা যায় না। লোহার প্যাঁচঅলা ক্যাপে ঢাকা। যেন এক-দিকে লোহা বাঁধানো পাকা-পোক্ত লাঠিই একটা। আবুর হাতে ওই লাঠি দেখেই বাপী বুঝে নিল ও এখন জঙ্গল চুঁড়তে যাচ্ছে।

—পড়্, পড়্, ভালো করে লেখা-পড়া না শিখলে মানুষ হবি কি করে। লেখা-পড়া শিখে বাবু হবি, এই আবুই তখন আবার তোকেও সেলাম ঠুকবে—

পর পর অনেক বার ফেল করে আবু এ বছরই স্কুল ছেড়েছে। নইলে এবারে বাপীর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তে হত। মুখে বিকার নেই। কথাগুলোও গম্ভীর। বাপীর তবু মনে হল ঠাট্টাই করছে। এই দিনেও স্কুলে যেতে হচ্ছে ঠাট্টা করবে না তো কি। লাঠি হাতে আবুকে দেখেই স্কুলের বিতৃষ্ণা আরো বুক ঠেলে বেরিয়ে আসছে। জিজ্ঞাসা করল, তুমি জঙ্গলে যাচ্ছ বুঝি?

—তা ছাড়া কোন চুলোয় আর যাব। বাপের হুকুম সকাল-বিকেল এখন জাঙল ঠেঙাতে হবে। মতলবখানা বুঝলি না, এরপর তোর বাপকে ধরা-করা করে বীটম্যানের খাতায় আমার নামটা ঢোকাতে চেষ্টা করবে।

বাপীর বিবেচনায় সেটা মস্ত ভাগ্যের কথা। বাবার মতো কেরানীবাবু হওয়ার থেকে বীটম্যান হওয়া ঢের ভালো। একটা বড় নিঃশ্বাস ঠেলে বার করে সখেদে বলল, আমার আজ একটুও স্কুলে যেতে ইচ্ছে কচ্ছিল না—বাবার গুঁতোয় যাচ্ছি।

আবুর সঙ্গে আবুর মতো করেই কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করে বাপী।

ঢিমেতালে চলতে চলতে তাচ্ছিল্যভরে আবু জবাব দিল, ইচ্ছে না করলে কোন বাপ আবার ঠেলে পাঠাতে পারে—মন না চায় যাব্বি না।

লোভ বাড়ছে। আবার ভয়ও।—বাবা টের পেয়ে গেলে?

—ভোঁতা মাথা হলে টের পাবে আর গায়ের ছাল ছাড়াবে। সময়ে স্কুলে রওনা হয়েছিস, আবার সময়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘরে ফিরবি—টের পাবে কেমন করে ?

চাপা উত্তেজনায় বাপীর বুক তুরুতুরু। তার পরেই আবার হতাশা।—অ্যাবসেন্ট হলে কাল যে আবার দরখাস্ত দিতে হবে স্কুলে, তখন টের পাবেই।

দাঁড়িয়ে গিয়ে আবু ঘাড় বেঁকিয়ে ওর বুদ্ধির বহর দেখে নিল। তারপর হাল-ছাড়া গলায় বলল, তুই বরং স্কুলেই চলে যা। কি করে যে পাশটাশগুলো করিস বুঝি না—এক বাবা ছাড়া পিরথীবিতে আর গার্জেন নেই ? পাঁচ দিন সাত দিনের জন্য বাপ অন্য জঙ্গলের কাজে গেছে বললে মাস্টাররা কি যাচাই করে দেখতে আসবে নাকি ? বাপ না থাকলে তখন পিসী সই করলে চলবে না ? পিসীর সই করা মানে বাঁকা-চোরা করে তোর সই করা—

বুকের ভিতরে আবার তুরু তুরু বাপীর।

—শোন্, তোকে ধরার তালেই ইদিক দিয়ে এলাম। আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ছি—ইচ্ছে থাকে তো তুইও ফাঁক বুঝে ঢুকে পড়। মেঘলা দিনে আবার জন্তু-জানোয়ারগুলোর প্রেম বেশি চনমন করে ওঠে—

লোভের শেষ আস্ত রাজভোগখানা ছুঁড়ে দিয়ে আবু হনহন করে খানিক পথ ভেঙে জঙ্গলে ঢুকে গেল। বাপী সেখানেই মিনিট খানেক ঠায় দাঁড়িয়ে। এই লোভ সামলানোর সাধ্যি আর নেই। পিছনের জঙ্গলের মধ্যেই আবুদের মেটে-ঘর। ওকে ধরার জন্যেই এই পথ ধরে এসেছে। ওটুকুই সব বাধা আর সব নিষেধ তুচ্ছ করার মতো যথেষ্ট। তার ওপর মেঘলা দিনে জন্তু-জানোয়ার-গুলোর প্রেম চনমন করে ওঠার কথা।

পিছনে ঘুরে দেখে নিল। কেউ আসছে না। চোখের পলকে সে-ও ওখান থেকেই জঙ্গলের আড়ালে।

প্রেম বলতে বাপী এতকাল পিসীর মুখে রাজপুত্র রাজকন্যার প্রেমের কথাই শুনে এসেছে। রূপকথার রাজপুত্র মেঘ-বরণ চুল রাজকন্যার খোঁজে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে জঙ্গল পাহাড় টপকে সাগর পেরিয়ে রাক্ষসের দেশ থেকে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসছে। পাশা খেলে ডাইনী পাশাবতীর দফা রফা করে, নয়তো একডুবে কাজলদীঘির তলা থেকে সোনার কৌটো তুলে তলোয়ারের ঘায়ে ভোমরা-ভোমরি দুখানা করে এক-একটি রাজপুত্র এক-একটি সোনার বরণ রাজকন্যাকে ঘরে এনে ধুমধাম করে বিয়ে করছে। পিসীর মুখে

ওইসব গল্প শুনেও বুকের রক্ত টগবগ করে ফোটে, উত্তেজনায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়। খানিকক্ষণের মধ্যে বাপী নিজেই সেই সব রাজপুত্র বনে যায়।

কিন্তু জঙ্গলের জীবগুলোর প্রেম একেবারে অন্য ব্যাপার। কোন্‌টা ওদের ভালবাসা-বাসি আর কোন্‌টা মারামারি খেয়োখেয়ি এখনো ভালো বুঝতে পারে না। এই ব্যাপারে আবু ইদানীং ওকে একটু-আধটু পাঠ দিচ্ছে। একটু একটু করে ভারী মজাদার নিষেধের জগতের পর্দা সরাচ্ছে। নইলে আগে চোখে দেখতে পেলেও বাপী কি কিছু বুঝতে পারত! এখনো পারে না, আবু বলে দিলে ঠকে শেখে। ভালবাসা-বাসি করতে হলে জীবগুলোরও একটা মেয়ে, আর একটা পুরুষ দরকার হয়, তা-ই জানত না।

এই পাঠ শুরু মাস দুই আগে। দূরে একটা বন-মোরগকে ছুটে আর একটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে বাপী হাতের পাথর তুলেছিল। দুটোকেই একসঙ্গে শেষ করবে। আবু থামালে।—দাঁড়া, প্রেম করছে দেখছিস না, এ-সময় মারতে হয়!

বাপী হাঁ।—মারামারি করছে না?

আবু হেসে সারা। তারপর এযাবৎ আশপাশের অনেক জানোয়ারেরই প্রেম করাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে ওকে। এমন কি খরগোশ বা কাঠ-বেড়ালীর প্রেমও বাপী এখন একটু-আধটু আঁচ করতে পারে। তবু গেল রোববারেই তো এক তাজ্জব ব্যাপার দেখে ঠকেছে।

···সেদিন জঙ্গলে পাশাপাশি চলতে চলতে আবু কি দেখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেছল। তারপরেই সেই অদ্ভুত দৃশ্যটা বাপীও দেখেছে। দুটো সাপ একটা আর একটাকে জড়িয়ে পাকিয়ে লেজে ভর করে একেবারে ভুঁয়ে পোঁতা লাঠির মতো দাঁড়িয়ে আছে। দুটোর ফণাও মুখোমুখি, লাগালাগি।

আবুর সঙ্গে আড়ালে সরে গিয়ে তাজ্জব দৃশ্যটা অনেকক্ষণ ধরে দেখেছে। আবু ফিস ফিস করে বলেছে, প্রেমে বাগড়া দিলে ক্ষেপে গিয়ে দুটোই একসঙ্গে তাড়া করবে। সাবধান, জোরে নিঃশ্বাসও ফেলবি না!

হাঁ করে বাপী দেখেছে আর বুঝেছে, এ-ও প্রেম। সেই দিনই পরে আবুর মুখে বাঘের প্রেমের গল্প শুনে বাপীর গায়ে কাঁটা! প্রেম করার সময় হলে বাঘিনী নাকি ডেকে ডেকে কাছাকাছির বা দূরের বাঘকে জানান দেয়। সেই প্রেমের ডাক আবু নিজের কানে শুনেছে। ওই ডাক শুনে কখনো আবার একটার বেশি পুরুষ বাঘ এসে হাজির হয়। বাঘিনীকে পাবার জন্য দুই বাঘের মধ্যে তখন যাকে বলে একেবারে খতমের লড়াই।' যে জিতবে বাঘিনী তার।

আর, বাঘিনীর প্রেমের ডাকে সাড়া দিয়ে যদি একটাই বাঘ আসে তো সে ব্যাটাও নিজের বীরত্ব দেখিয়ে বাঘিনীর মন পাবার জন্য একগাদা পশু মারবে—যা খাবে না তার থেকেও ঢের বেশি।

কদিন ওই প্রেমের পাঠ শুনে আর নিজের চোখেও অনেক দেখার পর বারো বছরের বাপীর ধারণা, জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারের ভালোবাসাবাসিটা রূপ-কথার রাজপুত্র রাজকন্যার মতো নয়। ঝাঁপাঝাঁপি ঝকাঝকি জড়াজড়ির ব্যাপার। তার চোখে দেখা বানারজুলির মানুষ বা মেয়েমানুষেরা রূপকথার ছেলে-মেয়ের মতো নয়। আবার জঙ্গলের জীবজন্তুর মতোও নয়। অথচ আবু বলে, মেয়ে-পুরুষের ভালবাসা-বাসি না হলে কেউ জন্মাতোওই না—বাপী না, আবু না, পৃথিবীর কেউ না। অবাক কথা। বাপী যেটুকু বোঝে তার থেকে বেশী অস্পষ্ট থাকে। কেউ বলে দেয়নি, নিজের ভিতর থেকেই কেমন করে জেনেছে এসব দেখাশোনা বা বোঝাটা ভয়ানক গোপনীয় ব্যাপার। আবার এত গোপনীয় বলেই জানার ভীষণ লোভ।

আজকের মতো এমন দিন হয় না। বাবার ভয়-ডর উবে গেছে। এমন ছুটির স্বাদ আলাদা। কেবল একটু আফসোস হাতে নিজের লাঠিটা নেই। জঙ্গল থেকে সরু একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে মনের আনন্দে ছোট গাছ আর ঝোপঝাড় পেটাতে পেটাতে আবুর পাশাপাশি চলেছে। কাঁধের বই-খাতার থলের বোঝাটা একজন বীট-ম্যানের কুঁড়েতে জিম্মা রেখে নিশ্চিন্ত। ঘরে ফেরার সময় তুলে নিয়ে যাবে।

মেঘলা আকাশের ঠাণ্ডা অথচ ঝিমুনো ছোঁয়াটা জঙ্গলে সেঁধিয়েছে। এ রকম হয় বলেই বাপীর ভালো লাগে। আজ অনেক দূরে চলে যাবার ইচ্ছে। একেবারে পাহাড়-ঘেঁষা বাঘ বা চিতার ডেরার দিকে না হোক, এক-আধটা ভালুক-টালুকের মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে। বিপাকে না পড়লে এখানকার ভালুক মানুষ তাড়া করে না, উল্টে পালায়। আবু অনেক দেখেছে। ও নাকি ভালুকের ভালবাসা-বাসিও দেখেছে।

কিন্তু কিছুটা যেতে যে জিনিসটা চোখে পড়ল সে অন্য ব্যাপার। খুব সুন্দরও। একটা বড় ময়ূর রং-বেরঙের বিশাল পেখম মেলে দাঁড়িয়ে আছে। আর ঘুরেফিরে এক-একবার ঢং করে নাচছে। ওটার সামনেই আর একটা পেখমছাড়া ময়ূর পোকামাকড় খুঁটে খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে পেখমমেলা বড় ময়ূরটাকে দেখছে।

আবু মন্তব্য করল, কেমন প্রেম করছে ছাখ—

বাপী দাঁড়িয়ে গেল। মেঘলা দিনে পেখম ছড়ানো ময়ূর অনেক দেখেছে। নাচতেও দেখেছে। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারটা মাথায় আসেনি।

—সামনের ওই কুচ্ছিতটা মেয়ে ময়ূর?

—না তো কি। নেচে নেচে রূপের বাহার দেখিয়ে ওকে ভোলাচ্ছে।

বাপীর আরো খানিক দাঁড়িয়ে দেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আবু তাড়া দিল, এসব তো দুধের খোকারা দেখবে—আয়।

ঘণ্টা দুই আড়াই জঙ্গলখানা মন্দ চষা হল না। এরকম তো কতদিন কতবার করেছে, কিন্তু আনন্দটা সব সময় আনকোরা নতুন। বাপীর একটু খেদ বড় জানোয়ার একটাও চোখে পড়েনি। বাপী আর এক দিকের গভীরে খানিক এগোতে চেয়েছিল। আবু বাধা দিয়েছে, ওদিকে নয়, বুনো শূয়োর বেরোতে পারে।

দাঁতাল বুনো শূয়োর কি ভয়ংকর জীব বাপীর শোনা আছে। ভালুকের মতো নয়, দেখলে সোজা তেড়ে আসে। এ জায়গাও নিরাপদ খুব নয়, এসে হাজির হলেই হল। তখন চটপট কোনো গাছে উঠে পড়লে বাঁচোয়া। এদিকে সেরকম গাছের অভাব নেই।

আবু আর ঘুরতে রাজি নয়। তার খিদে পেয়েছে, ঘরে যাবে। বাপীকেও আসতে বলল। যা আছে ভাগ করে খাওয়া যাবে। তারপর ফের জঙ্গলে এসে আড্ডা দাও বা যত খুশি ঘোরো।

কিন্তু দু কদম না এগোতেই ঝমঝম চেনা শব্দ। তারপর যে কাণ্ড দুজনারই খিদে-টিদে শিকেয়। দিব্বি বড়সড় সজারু একটা। ওদের দেখেই পালাচ্ছে। ওটাকে দেখামাত্র চাপা উত্তেজনায় আবুর অন্য মুখ। ফলে বাপীরও। চোখের পলকে ছিটকে গিয়ে আবু ওটার পিঠে ডাণ্ডার গোটাকতক পেল্লায় ঘা বসিয়ে দিল লোহামোড়া দিকটা দিয়ে। সারা গায়ের এক বিঘৎ মোটা মোটা কাঁটাগুলো মেলে দিয়ে সজারুটা দাঁড়িয়ে পড়ছে, আবার গর্তের দিকে ছুটছে। ওর গর্ত সামনের ওই চারা গাছগুলোর বেড-এর দিকে।

আবু ছুটে গিয়ে সেই গর্তটা বার করে তার মুখ আগলালো। ওকে চেঁচিয়ে হুকুম করল, হাতে পাথর তুলে নে, ওদিক দিয়ে না পালায় তুই ছাখ—একটা সজারু মারার সাধ অনেক দিনের—এ শালাকে আজ মারবই। বলতে বলতে লাঠি থেকে লোহার খাপ খুলে ইস্পাতের ঝকঝকে ধারালো ফলাটা বার করে লাঠি বাগিয়ে ধরল।

কিন্তু অত বড় সজারু মারা সহজ নয়। ওই বড় বড় কাঁটার আড়ালে

আসল জীবটিকে পাওয়া ভার। না চলে লাঠি, না পাথর। ওটার যেমন প্রাণপণ বাঁচার লড়াই এদের তেমনি মারার। ইস্পাতের ফলার খোঁচায় কাঁটাগুলো রক্তাক্ত। লাঠি আর পাথরের ঘায়ে ভেঙেছেও অনেকগুলো। শেষে ওটা ঝিমিয়ে পড়তে আবু অনেক কাছে গিয়ে ধারালো ফলার দিকটা মোক্ষমভাবে বসাতে পারল। ওরকম বার কয়েকের চেষ্টায় ওটার ভবলীলা সাঙ্গ।

এই উত্তেজনার ফাঁকে কম করে ঘণ্টা-সোয়াঘণ্টা পার। বাপীর হাঁপ ধরে গেছে। ধুলোমাখা রক্তাক্ত জীবটাকে দেখে গাও ঘুলোচ্ছে। কিন্তু আবু ফুর্তিতে টইটম্বুর। পকেটে ধারালো ছোরা একটা থাকেই। গাছ থেকে দড়ির মতো একটা লম্বা ঝুরি কেটে এনে তার এক মাথা দিয়ে ওটার গলার দিকটা শক্ত করে বাঁধল। তারপর টেনে নিয়ে চলল। আবুর কথা শুনে বাপীরও গা-ঘুলনো ভাবটা গেছে। অত বড় সজারুটা মারার জন্য আবু নাকি জঙ্গল আপিস থেকে এক টাকা বা দু টাকা প্রাইজ পাবে। সজারু চারাগাছের বেড-এর নরম মাটির তলা দিয়ে লম্বা গর্ত করে চারাগাছের বারোটা বাজিয়ে দেয়। তাই সজারু মারলে পুরস্কার। তাছাড়া সজারুর মাংস খেতে চমৎকার। কম করে সাত-আট সের মাংস হবে ওটার। আবুর বাড়িতে আজ ভোজ লাগবে। বাপীর নেমন্তন্ন তো বটেই। আর বড় সজারুর কাঁটাও ফেলনা নয়। ড্রইং করার কলম হয় ওই দিয়ে। আবু হেসে উঠল।—আচ্ছা ওরা প্রেম করে কি করে বল তো, নড়লে চড়লেই তো বড় বড় কাঁটা!

মাথা ঘামিয়ে বাপীও ভেবে পেল না।

আধ ঘণ্টা ধরে পালা করে ওটাকে হিঁচড়ে টেনে জঙ্গলের বাইরে পাকা রাস্তায় এনে ফেলল। টানিতে সুবিধে, কেরামতিটাও লোকে দেখবে। আনন্দে বাপী স্কুল পালানোর বিপদও ভুলেছে। কারণ এত বড় একটা বাহাদুরির পিছনে সেও আছে। রাস্তার লোকেরা জীবটাকে দেখছে আর ওদেরও দেখছে। কেউ কেউ আবার দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করছে—কোথায় পেল, বা কি করে মারল।

লম্বা রাস্তাটা বাঁক নিতে সামনের দিকে চেয়ে দুজনেই অবাক। খোদ বড় সাহেবের ছবির মতো সুন্দর বাংলোর সামনে মালবোঝাই ট্রাক একটা। তার পিছনে জিপ।

সেখানে ছোট সাহেব অর্থাৎ ফরেস্টার, ফরেস্ট গার্ড, কেরানীবাবু অর্থাৎ বাপীর বাবা, আবুর বাবা হেড বীটম্যান কালু, তার সঙ্গে আরো কয়েকজন

বীটম্যান পিওন—সকলেই ব্যস্তসমস্ত। নীচের কর্মচারীরা ট্রাকের দড়ি খুলে মাল নামানোর তোড়জোড় করছে।

বানারজুলি জঙ্গলের সর্বময় কর্তা রেঞ্জ অফিসারের বাংলো ওটা। বড় সাহেবের বাংলো। অবাঙালী বড়সাহেব বদলি হবার ফলে প্রায় তিন সপ্তাহ বাংলোটা খালি পড়ে ছিল।

আবু বলল, নতুন বড়সাহেব এলো বোধ হয়। শিগগীর আয়—

বাঁধা সজারুটাকে টানতে টানতে প্রায় ছুট লাগালো আবু। সেখানে আব্বা আছে, কেরানীবাবু আছে, ছোটসাহেব আর বীটম্যানরা আছে—সকলের সামনে খোদ বড়সাহেবকে কেরামতিটা দেখাবার এমন মওকা আর পাবে কোথায়?

পায়ে পায়ে বাপীও এগিয়ে এসেছে। স্কুল পালানোটা আর মনেই নেই। জিপটার দিকে চোখ। ফরেস্টার সাহেব আর বাবা যাকে তোয়াজ করছে ওই ছিপছিপে সুন্দরপানা সাহেবটিই নিশ্চয় নতুন রেঞ্জ অফিসার। তার দু হাত দূরে ঝকমকে শাড়ি পরা মেমসাহেব। বেশ সুন্দর দেখতে। মেমসাহেবের সামনেই একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। ছেলেটা বড়। পরনে ধপধপে সাদা হাফপ্যান্ট আর হাফশার্ট। আর চকচকে রঙিন ফ্রক পরা মেয়েটার একমাথা ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল, ফুটফুটে ফর্সা রং, ফোলা ফোলা লালচে গাল·· পুতুল পুতুল মুখ।

বাপী হাঁ করে মেয়েটাকেই দেখছে।

আবুর বরাত খারাপ। লতার দড়ি-বাঁধা ওই পেল্লায় মরা সজারু এনে ফেলতে সকলে যখন সচকিত, খোদ বড়সাহেবের বিরক্ত মুখ। মেমসাহেব আঁতকে ওঠার দরুন হতে পারে। আরদালি পিওন ফরেস্ট-গার্ড বীটম্যানরা দুচার মিনিটের জন্য অমনোযোগী হল বলেও হতে পারে। এতে হয়ত দণ্ডমুণ্ডের মালিকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার গুরুত্বে ঘা পড়ল। তার ওপর মেমসাহেবের নাক-মুখ কোঁচকানো বিরক্তি।—মাগো, কি বিচ্ছিরি—সরিয়ে নিতে বলো!

আবুর ভেবাচাকা মুখ। ছেলের কেরামতি দেখে ওর বাবা কালুর দু চোখ আনন্দে চকচক করে উঠেছিল। বড়সাহেবের বাহবা আশা করেছিল। মেমসাহেবের কথা শুনে আর বড়সাহেবের মুখ দেখে রক্ত জল। আগুন চোখে ছেলের দিকে ফিরে তাকানোর আগেই ত্রস্ত আবু তার সজারু সমেত

রাস্তার ওধারে জঙ্গলে নেমে গেল। সব থেকে বেশি ঘাবড়েছে ও-ই।

ফুটফুটে মেয়েটা সভয়ে মায়ের তিন পা পিছনে চলে গেছল। দেখার জন্য এবারে রাস্তার এধারে এগিয়ে এলো। তার দাদাকে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে খানিকটা নেমে দাঁড়াতে দেখে এগিয়েছে। তবু সাহস দেখে বাপীর হাসি পাচ্ছে। মেয়েটা বলছে, এই দাদা, আর নামিস না—

জঙ্গল থেকে রাস্তা অনেকটা উঁচু। মরা সজারুটাকে টেনেহিঁচড়ে আবু ততক্ষণে ঝোপঝাড়ের আড়ালে। বাপীর বরাত ভাল, তার ব্যস্তসমস্ত বাবা তখন মাল রাখার তদারকির কাজে বাংলোর ভিতরে। এই অপ্রিয় ব্যাপারটা দেখলে বা জানলে দুর্ভোগ হত। ঘর্মাক্ত কলেবরে এবারে বাইরে আসতে ছেলের দিকে চোখ গেল। বাপী জঙ্গলের দিকে মুখ করে সাহেবের মেয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে।

কাঁধের নীচে বাবার হাতের হ্যাঁচকা টান পড়তে মুহূর্তের জন্য মুখ আমসি। পরের মুহূর্তে অবাক। ঘাম-ঝরা হাসিমাখা মুখ বাবার। স্কুল-ফুল ভুলে গেছে। ওকে বড়সাহেবের সামনে টেনে বলল, প্রণাম কর্—

সাহেবের ধুলোমাখা বুটে প্রণাম ঠুকে ওঠার ফাঁকে আবার বাবার চিনি-গলা কথাই কানে এলো।—মা-মরা এই একটাই ছেলে আমার স্যার, আশীর্বাদ করুন—

বড়সাহেব সামান্য মাথা নাড়লেন। বাবার হুকুমে মেমসাহেবকেও স্যাণ্ডাল-পরা পা ছুঁয়ে প্রণাম সারুতে হল। তাদের মেয়ে এদিকে ঘাড় বেঁকিয়ে ওকে দেখছে।

বাবার ভাবনা গেছে। হাল্কা পায়ে বাপী আবার মেয়েটার কাছে এসে দাঁড়াল। আগের আধ-বুড়ো খোট্টা বড়সাহেবের ছেলেমেয়ে ছিল না। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলার লোভ খুব। চেষ্টার দরকার হল না; ও-ই কথা বলল।

—ওটা কি মেরে এনেছিল?

—সজারু।

—কি করে মারলে?

—লাঠি পাথর আর লাঠির মধ্যে ইস্পাতের ফলা গোঁজা আছে—তাই দিয়ে।

—তুমি মারতে দেখেছ? শুনেই গা শিরশির করছে যেন মেয়েটার।

—আমি আর আবুই তো মারলাম ওটা।

এবারে বড় বড় চোখ করে ওকে ভালো করে দেখার দরকার হল যেন। —ভয় করল না ?

—নাঃ।

—ওটা তাড়া করল না ?

—তাড়া করবে কি, ভয়ের চোটে গর্তে ঢুকতে চাইছিল। আবু গর্তের মুখ আগলে ছিল।

মেয়েটার চোখেমুখে অবিশ্বাস। আর একবার ওকে ভালো করে দেখে নিল।—তুমি এইটুকু ছেলে, তুমি মেরেছ না আরো কিছু—

ওকে বিশ্বাস করানো যেন বাপীর দায়।—আবুকে জিগ্যেস করে দেখো, ও তো আর মিথ্যে কথা বলবে না।

বিশ্বাস করা তবু সহজ নয়।—তোমার নাম কি ?

—বাপী।

হেসে উঠল। সার বাঁধা ছোট দাঁতের সারির ঝিলিক।—বাপি তো বাবাকে বলে—ওই তো বাপি।

হাত তুলে বাবাকে দেখালো।

মজার কথায় বাপীরও মজা লাগল একটু। জিজ্ঞাসা করল, তোমাব নাম কি ?

—মিষ্টি।

এবারে বাপী হাসল।—মিষ্টি তো লোকে খায়—

মেয়েটা প্রতিবাদ করল, যেমন বুদ্ধি তোমার, আমি মিষ্টি দেখতে বলে দাদু নাম রেখেছিল মিষ্টি—আমার ভালো নাম মালবিকা নন্দী—তোমার ভালো নাম নেই ?

মনে মনে বাপী বলল, মেয়ের অহংকার দেখো, নিজেই বললে মিষ্টি দেখতে। কিন্তু মিষ্টি যে সত্যি ভারী মিষ্টি দেখতে অস্বীকার করার উপায় নেই।

—বিপুলনারায়ণ তরফদার।

—মা-গো, কি বিচ্ছিরি নাম—তোমাদের জংলা দেশে বুঝি এ-রকম সব বড় বড় নাম হয় ?

নাম নিয়ে বাপী কখনো মাথা ঘামায় নি। শুনে রাগ হলেও প্রকাশ করার উপায় নেই।—এর আগে তোমরা জঙ্গলে ছিলে না ?

—ছিলাম তো, ময়নাগুড়ির জঙ্গলে ছিলাম। সেখান থেকে এখানে

বদলি হয়ে এলাম।

বাপীর হাসিই পাচ্ছে, যেন ও-ই রেঞ্জ অফিসার, এক জঙ্গল থেকে আর জঙ্গলে বদলি হয়ে এলো। বলল, তাহলে তুমিও তো জংলা দেশের মেয়ে।

তক্ষুনি মুখ-মচকানো জবাব।—এঃ, আমার কলকাতায় জন্ম—বুঝলে? সেখানে মায়ের বাবা থাকে, দাদুর কাছে ছ বছর ছিলাম আমরা—তুমি কলকাতা দেখেছ?

দেখেনি যখন বাপীর মাথা নাড়া ছাড়া উপায় কি। মেয়েটা মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিল, বাবা-মা বাংলোর ভিতরে চলে গেছে, দাদাও রাস্তায় নেই।

—কলকাতা দেখনি আবার ফটফট করছ—তুমি জংলি ভূত একটা—

খিল খিল করে হাসতে হাসতে বাংলোর দিকে ছুট।

বাপীর রাগ হবার কথা। কিন্তু একটুও রাগ হচ্ছে না। অবাক চোখে বাংলোটাকেই দেখছে। ওই আঙিনায় ঢোকার তাগিদ কখনো বোধ করে নি। আজ করছে। ঢুকলে সাহেব মেমসাহেবের কথা জানে না, বাবা যে তেড়ে আসবে এটুকু বোধ আছে।

রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে নামল। আবুর টিকির দেখা নেই। এতক্ষণে তার ঘরের কাছাকাছি চলে গেছে হয়তো। বেচারা আবুর এমন একখানা সজারু মারার কদর হল না। ওই মেমসাহেবের জন্যেই হল না। একেবারে ননীর শরীর, দেখেই মূর্ছা গেলেন। না, দেখতে ভালো হলেও মেমসাহেবকে ওর একটুও ভালো লাগেনি। ওদের ছেলেটারও দেমাক খুব, একটা কথাও বলল না। কিন্তু মিষ্টি মেয়েটা কি মিষ্টি কি মিষ্টি! হাসলে সুন্দর, মুখ মচকালে সুন্দর, আবার সজারু দেখে ভয়-পাওয়া মুখখানাও সুন্দর। কথা শুনে এক-একবার রাগ হচ্ছিল বাপীর। কিন্তু তাও বেশ লাগছিল। চা-বাগানের বাবুদের ছোট-বড় আরো অনেক মেয়েকে খুঁটিয়ে দেখেছে, কিন্তু মিষ্টির মতো কেউ না। আর তাদের এত দেমাক যে কেরানীবাবুর ছেলের সঙ্গে কথাই বলে না। বড়সাহেবের মেয়ে মিষ্টি সেধে কথা বলেছে। কত কথা আর মিষ্টি মিষ্টি কথা।

জঙ্গলের পথ ছেড়ে আবার রাস্তা ধরল। বাড়ি। বই-খাতা সেই বীটম্যানের ঘরেই পড়ে থাকল তাও মনে নেই। ঘরে ঢোকার মুখে মনে পড়ল। পিসী সামনে নেই, জেরায় পড়তে হল না।

—পিসী! মিষ্টি এসে গেছে—!

ভিতরের দাওয়ায় বসে ওর জন্যেই জলখাবারের রুটি বেলছিলেন সুধারাণী।

অবাক হবারই কথা, বাইরে থেকে মিষ্টি কখনো কেউ আনে না। কখনো-সখনো তিনিই ঘরে তৈরি করে দেন।

—কোত্থেকে এলো, কে আনল?

বাপীর মুখে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি।—জঙ্গলের বড়সাহেব এলো আজ, আর তার সঙ্গে মেমসাহেব এলো—তাদের সঙ্গে মিষ্টি এলো।

ভালোমানুষ পিসী প্যাঁচ বুঝবে কেমন করে।—তোদের জন্যেও দিল বুঝি? কি মিষ্টি?

—বড়সাহেব আর মেমসাহেবের মেয়ে মিষ্টি। পিসীকে ঠকাতে পেরে বাপী হেসে উঠল।—নাম মিষ্টি দেখতে মিষ্টি কথাও মিষ্টি—আমার খেয়েই নিতে ইচ্ছে করছিল গো।

সুধারাণী বুঝলেন এবং ভাইপোর বজ্জাতির কথা শুনে না হেসেও পারলেন না।—শুনলে তোর নোলা ছিঁড়ে দেবে একেবারে—কি পাজী হয়েছিস তুই। যা মুখ হাত ধুয়ে আয়, আমি রুটি কখানা করে দিই চট করে—

পেটের আগুনও জ্বলছে এতক্ষণে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই ঘুরে এসে পিসীর সামনে দাওয়ার ওপরেই বসে পড়ল। থালায় খাবার দেখে আর পিঁড়ি পাতার তর সইল না।

জঙ্গলের নতুন মনিবের খবর নেবার কৌতূহল সুধারাণীর। মনিব ভালো মানুষ হলে ভাইয়ের ভাগ্য। নইলে অনেক হেনস্থা। যখন-তখন ডাক পড়ে, কথায়-কথায় শাসায়। কেরানীবাবু-টাবুরা ঘরের কেনা গোলাম।—সাহেব মেমসাহেবকে কেমন দেখলি?

রুটি তল করতে করতে বাপী জবাব দিল, সাহেবের হুমো গম্ভীর মুখ, মেম-সাহেব আর তার মেয়ে মরা সজারু দেখে ভিরমি খায়। দৃশ্য মনে পড়তেই হাসি। সোৎসাহে সজারু মারা, আর আবুর সেটা সাহেব মেমসাহেবকে দেখাতে আনার ফলখানা বলে ফেলল।

গালে হাত দিয়ে শুনছিলেন সুধারাণী। শোনার পরে খটকা।—তুই স্কুলে ছিলি তো সজারু মারলি কি করে?

রুটি গলায় ঠেকার দাখিল। ফলে স্বর চড়া এবং বিরক্তি ভরা।—মাঝে মধ্যে স্কুল হাফ-হলিডে হয়ে যেতে নেই—বারো মাসই পুরো স্কুল হয়?

আর কাছে বসে থাকা নিরাপদ নয় বাপীর সে-জ্ঞান টনটনে। পিসীর চোখে ধুলো দিয়ে বই-খাতার ঝোলাটা নিয়ে আসতে হবে। শেষ আস্ত রুটি আর তরকারিটুকু একবারে মুখে পুরে উঠে পড়ল।

পরের দশটা দিনের মধ্যে দুটো রবিবার,, দুটো শনিবারের হাফ-ডে, আর কি এক পরব উপলক্ষে এক দিন ছুটি গেছে। সেই পাঁচটা দিনের বেশির ভাগ সময় বাপীর রেঞ্জ অফিসারের বাংলোর সামনে আর আশপাশে ঘুর ঘুর করে কেটেছে। স্কুলের দিনেও বিকেলে একবার করে পা দুটো ওকে এ-দিকে টেনে এনেছে। বাংলোর ভিতরের চত্বরে আর সামনের ওই চেয়ার-টেবিল সাজানো কাঠের বারান্দায়ও পা দিয়েছে। পরবের ছুটির দিনের সমস্ত দুপুরটা মিষ্টির সঙ্গে গল্প করে কেটেছে। ওর বাবা ভিতরে ঘুমুচ্ছিল। দীপুদা চা-বাগানের কোন্ নতুন বন্ধুর বাড়ি টহল দিতে বেরিয়েছে। বাইরের টেবিলে মিষ্টির একটা পাতলা বই, খাতা আর পেনসিল।

দুপুরেও মেয়ের পড়ায় কি মন—রাস্তার ঠিক পরেই ওদের গেটের মুখোমুখি ছোট গাছটার একটা ডালে গ্যাঁট হয়ে বসে বাপী মজা দেখছিল।...মিষ্টি পড়ার টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে কাঠের মেঝেতে বার কয়েক ঝাঁপ খেল। প্রতিটি ঝাঁপের পরে ঘাড় বেঁকিয়ে ঘরের দিকে তাকাচ্ছে। অর্থাৎ মা-বাবা ভিতর থেকে টের পেল কিনা। শব্দ না করে ঝাঁপ খাওয়ার কেরামতিটাই রপ্ত করছে মনে হল বাপীর। সে-খেলা শেষ হতে হাতের রাবার মেঝেতে ফেলে ফেলে এক পা তুলে টেবিল-চেয়ারের চারদিক ঘুরে এক্কা-দোক্কা খেলা চলল খানিক। তারপর লালচে মুখে খানিক এগিয়ে এসে গেট বরাবর মুখ করে দাঁড়িয়ে একটু একটু হাঁপাতে লাগল।

বাপী এই মওকায় কোকিলের ডাক ডেকে উঠল একটা। তারপর আরো একটা। কানা মেয়ে এদিক-ওদিক তাকালো। গাছটাও দেখল। কিন্তু পা ঝুলিয়ে বসে থাকা সত্ত্বেও ওর দিকে চোখ গেল না।

বাপী অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিল। অবাধ্য পা দুটো এর পর ওই গেট পেরুতোই, কিন্তু মনের তলায় মেমসাহেবের ভয়। মুখে কিছু না বললেও ওর আসাটা যে পছন্দ নয় সেটুকু বাপী গেল দিনই আঁচ করতে পেরেছিল। বিকেলে মিষ্টির ডাকেই ভিতরে ঢুকেছিল, তারপর সামনের আর পিছনের বাগানে মিষ্টির সঙ্গে ছোটাছুটি করে খেলা করছিল। এই মেয়ে ওর সঙ্গে ছুটে পারবে কেন। দশ গজ এগিয়ে দিয়েও ওকে হারিয়ে আগে গিয়ে বুড়ী ছুঁয়েছে। বারান্দার চেয়ারে বসে আগেও মেমসাহেব ওদের ছোটাছুটি লক্ষ্য করেছে। তার মুখখানা বাপীর অপ্রসন্ন মনে হয়েছে। গেল দিনে সব থেকে বেশি মনে হয়েছে। বার বার হেরে আদুরে মেয়ের মেজাজ খারাপ হচ্ছিল। এবারে তার অর্ধেকের বেশি এগিয়ে দাঁড়িয়ে ওকে হারানোর গোঁ। কিন্তু বাপী এমন অজ্ঞান

হারা হারতে রাজি নয়।

এই থেকে কথা কাটাকাটি। মেমসাহেব তখন বারান্দার এ-মাথায় এসে কড়া গলায় মেয়েকে চলে আসতে হুকুম করল। আর ওর দিকে এমন করে তাকালে যে বাপীর পা দুটো আপনা থেকেই গেটের দিকে। ফলে ভিতরের তাড়না সত্ত্বেও এ-দিনের দুপুরে ওই ছোট গেট পেরুনো নিরাপদ হবে কিনা ভাবছিল।

কোকিলের ডাকে কাজ হল না দেখে বাপী একটু জোরেই বার-দুই হাত-তালি দিল। গাছের ডালে এবারে ওকে আবিষ্কার করতে পেরে মেয়েটা পলকের জন্য হাঁ। তারপর একমুখ হাসি। এমন মজার ব্যাপার আর যেন হয় না। তরতর করে কাঠের সিঁড়ি টপকে ছুটে গেটের কাছে এলো।

বাপী হাতের ইশারায় ওকে কাছে আসতে বলল। ঘুরে দাঁড়িয়ে মিষ্টি একবার ওদের ঝিমুনো বাংলোটা দেখে নিল। তারপর আস্তে আস্তে গেটের আগুটা সরিয়ে তিন-চার লাফে রাস্তার এধারে।

সামান্য গলা চড়িয়ে বাপী বলল, এক ঘণ্টা ধরে বসে আছি, টেবিল থেকে লাফালি, ধেই ধেই করে নাচলি, আর এদিকে একবার তাকালি না।

এর মধ্যে বাপী অনায়াসে তুমি থেকে তুই-এ চলে এসেছে। মিষ্টির কানে সেটা একটুও লাগে নি। হি-হি করে হেসে উঠল।—গাছের ওপর তোমাকে ঠিক হনুমানের মতো লাগছে।

রাগ হতে পারত, কিন্তু মিষ্টির হাসি দেখতে বেশি মজা। কাঠবেড়ালের মতো তরতর করে গাছ থেকে নেমে এলো।—জঙ্গলের ভেতরে যাবি? চল, খুব ভাল লাগবে—

ভয়ে ভয়ে মিষ্টি জঙ্গলের ভিতরদিকে চোখ চালাল একবার। লোভ একটু হচ্ছে। বাবার লোকজনের সঙ্গে ময়নাগুড়ির জঙ্গলে গেছে। মজা লাগে আবার গা ছমছমও করে।—তুমি একলাই জঙ্গলের ভিতরে চলে যাও?

—হরদম যাই। তোর ভয় করছে?

—ভয় করবে কেন, মা জানতে পারলে বকবে না? তাছাড়া বারোখানা অঙ্ক করে রাখতে বলেছে, না হলে দেবে একেবারে—

—কি অঙ্ক?

—কঠিন কঠিন অঙ্ক, দেখবে এসো না?

—তোর মা রাগ করবে না?

—রাগ করবে কেন, আমাকে বাইরে দেখলে বরং রাগ করতে পারে।

তাছাড়া মা তো এখন ঘুমুচ্ছে—

অগত্যা বাপী ওর সঙ্গে কাঠের বারান্দায় চলে এলো। মিষ্টির কঠিন কঠিন অঙ্ক দেখে হাসিই পেয়ে গেল। পুচকে পুচকে যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ।—এই অঙ্ক তোর! বারো মিনিটও লাগবে না, আমি উত্তর বলছি তুই লেখ—

এই প্রস্তাব পছন্দ। চটপট কাজটা সারা হয়ে গেলে গল্প করার সুবিধে। কিন্তু বই থেকে অঙ্কগুলো ঠিক-ঠিক খাতায় তোলার ঝামেলা আছে। চেয়ারে বসলে টেবিল বেশি উঁচু। মিষ্টি দাঁড়িয়েই কাজে মন দিল। বাপীও ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। একটা হাত মিষ্টির ঝুঁকে পড়া পিঠের ওপর দিয়ে টেবিলের ওদিকে। মেয়েটা জানতেও পারছে না ওই হাতটা ওকে আরো কাছে আগলে রাখতে চাইছে। এত কাছাকাছি লাগালাগি হয়ে থাকতে এত ভাল লাগে দু মিনিট আগে বাপীও কি জানত! মিষ্টির গায়ে আর ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলে ভারী একটা মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ। গন্ধটা আরো ভাল করে নিতে গিয়ে নিজের গালের সঙ্গে ওর মাথাটা ঠেকেই গেল একবার।

—আঃ, সরো না! কাঁধ আর কোমর দিয়ে মিষ্টি ওকে ঠেলে দিল একটু। মন দিয়ে সব কটা অঙ্ক আগে খাতায় তুলে ফেলছে।

সরতে একটু হল বটে কিন্তু বাপীর অবুঝ একটা ইচ্ছে আরও বেড়ে গেল। ইচ্ছেটা ঠিক যে কি নিজেও জানে না।

অঙ্কগুলো এরপর টকাটক হয়ে গেল বটে। এত তাড়াতাড়ি যে মিষ্টি ভারী অবাক। বাপী চোখ দিয়ে দেখে, আর ওকে লিখতে বলে। মিষ্টির মনে হল বাপীর মত এমন অঙ্ক-বিশারদ আর হয় না। অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞাসা করল, সব রাইট?

—রাইটের বাবা।

মিষ্টি খুব খুশি। চুপি চুপি এও এক মজার খেলা সাঙ্গ হল যেন।—তুমি বলে দিয়েছ মা যেন কক্ষনো জানতে না পায়, তাহলে দুজনকেই ধরে দেবে—

মুখোমুখি চেয়ার পেতে গল্প করতে বসল দুজনে। বাপীর গল্প মানে জঙ্গলের গল্প। জঙ্গলে ঘুরতে কেমন লাগে। কাছাকাছির মধ্যে হামেশা কোন্ কোন্ জীবের দেখা মেলে। তাড়া করলে ওরা কিভাবে পালায়। কোন্গুলোকে অনায়াসে পাথর ছুঁড়ে মারা যায়। ও কত মেরেছে। মিষ্টি ওর সঙ্গে জঙ্গলে গেলেই দুই-একটা মেরে দেখাবে।

ফাঁক পেলে এর পর মিষ্টিকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাবার মতলব। এই

জন্যেই লোভ দেখানো।

—আর ওরা কেমন জোড় বেঁধে খেলা করে জানিস? কক্ষনো দুটো পুরুষ আর দুটো মেয়েতে খেলা করে না। একটা পুরুষ আর একটা মেয়ে—

মিষ্টি হাঁ করে ওর কথা শুনছে।

—বুঝলি না বোকা মেয়ে! যেমন ধর একটা পুরুষ খরগোশ আর একটা মেয়ে খরগোশ, একটা পুরুষ ময়ুর আর একটা মেয়ে ময়ুর, একটা পুরুষ সাপ আর একটা মেয়ে সাপ—

সাপ শুনেই মিষ্টির গায়ে কাঁটা দিল।—সাপেরাও খেলা করে? তুমি দেখেছ?

—দেখিনি আবার! এই সেদিনই তো দেখলাম দুটো পেল্লায় সাপ একটা আর একটাকে পেঁচিয়ে লেজে ভর করে লাঠির মত দাঁড়িয়ে আছে।…এটা অবশ্য ঠিক খেলা নয়, তুই বুঝবি না…।

মিষ্টির দু চোখ বড় বড়।—মারামারি?

—দূর বোকা। না, আমার বলতে লজ্জা করছে…

সাপের কথা বলতে লজ্জা করবে কেন মিষ্টি ভেবে পেল না। লজ্জার কথা শুনে আরো কৌতূহল।—মারামারি না হলে কি বলো না?

—ভালবাসা-বাসি।

শুনেই মিষ্টি হেসে সারা। হাসির চোটে একঝাঁক চুল মুখের ওপর এসে গেল। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে সেগুলো সরাতে সরাতে তেমনি হাসি আর অবিশ্বাসে ভেঙে পড়ে বলল, সাপ আবার ভালবাসে নাকি?

চুল সরানো মুখখানা রসে টইটম্বুর ফলের মত টুপটুপ করছে। গাল দুটো ধরে টিপে দিতে ইচ্ছে করছে বাপীর।

—একটুও যদি বুদ্ধি থাকত তোর, সাপ মেয়ে-সাপকে ভালবাসবে না কেন—এ কি মানুষ নাকি যে দেখলেই ছুবলে দেবে! আমার সঙ্গে জঙ্গলে এলে কত কি দেখতে পাবি।

—না বাবা, মিষ্টি মাথা দোলাল, আমার সাপ শুনেই ভয় করছে।

—আচ্ছা ভীতু মেয়ে তো, ও-সব সাপ-টাপ বা পাজী জানোয়ার সব বেশি জঙ্গলে থাকে, বুঝলি? তাছাড়া আমি সঙ্গে থাকলে আর ভয় কি!

বাপীর বিশ্বাস ভুলিয়ে-ভালিয়ে দুই একবার জঙ্গলে নিয়ে ঢোকাতে পারলে মিষ্টিও ওই জঙ্গলটাকে ওর মতই ভালবেসে ফেলবে। বানারজুলির জঙ্গল কেউ ভাল না বেসে পারে না।

কিন্তু সব উৎসাহের মুখে বড় রকমের হোঁচট খেতে হল। বেলা যে চারটে গড়াতে চলল, বাপী বা মিষ্টি কারোই খেয়াল ছিল না। দুপুরের ঘুমভাঙা ফোলা-ফোলা মুখে মেমসাহেব ঘর থেকে বেরুল। সঙ্গে সঙ্গে চোখে কাঁটা বিঁধল। দুটো চেয়ার মুখোমুখি লাগানো। আর তাতে মুখোমুখি আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে দুজনে।

মেমসাহেবের ভ্রূকুটি দেখেই চোরের দায়ে ধরা পড়ল বাপী। নড়া-চড়া ভুলে শুকনো মুখে একটা শাস্তির অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

ঝাঁঝালো গলায় মেমসাহেব প্রথমে মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, অঙ্ক হয়েছে?

মেয়েও ভয়ে-ভয়ে মাথা নাড়ল। হয়েছে। তার ভয়, কি করে হয়েছে মা না সেটা বুঝে ফেলে।

এবারে বাপীর পালা। মেমসাহেবের ভুরুর ভাঁজ সোজা হয় নি তখনো। —তোর বাড়ি কোথায়?

একটা হাত তুলে বাপী শুধু রাস্তার দিকটাই দেখিয়ে দিল।

আরও ঝাঁঝালো গলায় মেমসাহেব বলে উঠল, মেয়েদের সঙ্গে তোর এত কি খেলা আর গল্প—যা বাড়ি যা—আর কক্ষনো যেন এভাবে না দেখি।

গেটের বাইরে পা দিয়ে বাপী হাঁপ ফেলে বাঁচল বটে, কিন্তু তার পরেই যত রাগ তেতো দুঃখ। একটু আড়াল নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাংলোটাকেই দেখল খানিক। মিষ্টি তার মায়ের সঙ্গে ঘরে চলে গেছে। নিজের দোষেই এমনটা হল। খেয়াল করে ওই মহারাণীর ঘুম ভাঙার আগে সটকান দিলে এই গণ্ডগোল হত না।

পরের দুটো দিন সকালে আর স্কুল-ফেরত বাড়িতে না ঢুকে বাংলোটার সামনের রাস্তায় কতবার ঘোরাঘুরি করেছে, হিসেব নেই। বাইরের ওই কাঠের বারান্দায় সাহেব বা মেমসাহেবকে দেখলে সরে যায়। মিষ্টি ঠাণ্ডা মেয়ে নয় একটুও, যে ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকবে। ওর দেখাও অনেক বার করে মেলে। আর বাপীর পা দুটো তখন ওই গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকতে চায়। মেমসাহেব না থাকলে গেটের কাছাকাছি এগিয়েও আসে। মিষ্টি তখন ওকে ঠিক দেখতে পায়। ওর সঙ্গে খেলা করতে বা গল্প করতে যে ভাল লাগে মিষ্টির, বাপী সেটা মুখ দেখলেই বুঝতে পারে। ফাঁক বুঝে হাতের ইশারায় বাপী ওকে গেটের বাইরে চলে আসতে বলেছিল। জবাবে মেয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে হাতের ছোট্ট বুড়ো আঙুল নেড়ে যা বোঝাবার বুঝিয়েও দিয়েছে। অর্থাৎ ওর আসাটা বা বাপীর সঙ্গে খেলা করাটা মা বরদাস্ত করবে না। ফিক্-ফিক করে

হেসেওছে আবার। বাপী জ্বলতে জ্বলতে ফিরে গেছে।

একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। বড়সাহেব আর মেমসাহেবের ভাঁটের ছেলে দীপুদার মন পেলে আবার ও-বাড়ির গেট দিয়ে ঢোকা সহজ হতে পারে। সুদীপ নন্দী। বাবা-মায়ের আদরের নাম দীপু। একই স্কুলে ওর থেকে তিন ক্লাস ওপরে অর্থাৎ ক্লাস নাইনে পড়ে দীপুদা। বছরের চার মাস কেটে গেলেও স্কুলে ভর্তি হতে অসুবিধে হয় নি। বাপীর ধারণা বড়লোকের ছেলে বলেই হয়নি। জঙ্গলের জিপে চড়ে স্কুলে যায় জিপে চড়ে ফেরে। মিষ্টি তো কাছের চা-বাগানের মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বাপী ভাবে খুব মজা ওর। সকাল আটটায় স্কুল, বারোটায় ছুটি। সমস্তটা দুপুর হাতের মুঠোয়। দীপুকে জিপে চেপে স্কুলে যেতে দেখে বাপীরও জিপে ওঠার লোভ খুব। কিন্তু এত দিন সাহস করে বলতে পারে নি।

তোয়াজ কি করে করতে হয় বাপীর একটু-আধটু জানাই আছে। বাবাকে দেখেছে, আবুর বাবা কালুকে দেখেছে, চা-বাগানের অনেক বাবুদেরও সায়েবকে তোয়াজ তোষামোদ করতে দেখে আসছে।

সেদিন স্কুল-গেটে জিপটা থামতেই বাপী ছুটে গেল। জিজ্ঞেস করল, তোমার বইখাতাগুলো আমি ক্লাসে দিয়ে আসব দীপুদা ?

কেরানীবাবুর ছেলেকে দীপু বেশ চেনে। বাড়িতে বোনের সঙ্গে খেলা করতেও দেখেছে।

—কেন ?

—তোমার কষ্ট হবে। তাই···।

তোয়াজটুকু মন্দ লাগল না। কিন্তু ধমকের সুরে মুখে বলল, ভাগ – ।

মুখ কাঁচুমাচু করে টিফিনের সময় ফাঁক বুঝে আবার দীপুদার সামনে।—পিসী চমৎকার আমসত্ত্ব বানায় দীপুদা, আজ তোমার কথা বলতে অনেকটা দিয়ে দিয়েছে—আর পাকা কামরাঙাও আছে, খুব মিষ্টি—খাবে ?

তার এক হাতে মস্ত একটা লোভনীয় কামরাঙা আর অন্য হাতে সোনা-রঙ আমসত্ত্ব খানিকটা।

ও-দুটো নিয়ে দীপু ওকে কৃতার্থ করল। খেতে খেতে মন্তব্য করল, বেশ তো···। কাল আবার আনিস –

পর দিনও ওই একই ঘুষ। সঙ্গে একটা বাড়তি টোপ।—আমাতে আবুতে জঙ্গল থেকে বন-মোরগ বা খরগোশ মেরে বাড়িতে দিয়ে আসব দীপুদা ?

আবুকেও দীপুদার চেনা হয়ে গেছে।—দিস্। মাকে বলব'খন আবুকে বখশিশ দেবে। তুই-ই খুব ভালো খেতে…

বাপীর বলার ইচ্ছে, আবু বখশিশ-টখশিশ নেয় না। বলা গেল না।

—তোর কোন্ ক্লাস রে?

—ক্লাস সিকস…!

এই মওকাতেই বুকের দম আটকে বাপী বলে ফেলে, রোজ পাঁচ মাইল করে হেঁটে আসতে-যেতে আমার খুব কষ্ট হয় দীপুদা, তোমাদের জিপে করে যদি আমাকে একটু—

কথাটা আর শেষ করে উঠতে পারল না। তার আগেই দীপুদা কট কট করে বলে উঠল, ও··এই মতলবে আমার মন ভেজানো হচ্ছে। সাহস তো কম নয়, তোর সঙ্গে আমি এক জিপে আসব-যাব?

বাপী চুপসে গেল। কিন্তু আমসত্ত্ব কামরাঙার লোভে হোক বা বন-মোরগ খরগোশ ভেটের আশায় হোক, দীপুদা একেবারে অনুদার হতে পারল না। বলল, আচ্ছা, এক কাজ করিস, আসার সময় মাইলটাক হেঁটে এসে রাস্তার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকিস, আমি তুলে নেব—আবার স্কুলের আধ-মাইলটাক আগে নেমে যাবি। ফেরার সময় হেঁটেই যেতে হবে, উঁচু ক্লাসের এত ছেলের সামনে তোকে সঙ্গে নিতে পারব না।

বাপীর পিত্তি জ্বলে গেল। ও যেন চার পয়সা ভিক্ষে চেয়েছে আর বড়লোকের ছেলে দয়া করে একটা পয়সা দিলে। ওই জিপের দিকে বাপী যদি জীবনে আর ফিরেও তাকায়।

সাহেব বাংলোর দিকে মনটা পড়ে থাকার ফলে আবুর সঙ্গে কদিনের মধ্যে দেখাও হয় নি। সেই নজারু-ভোজের সন্ধ্যার পর থেকে। ওকে দেখেই আবু ঠেস দিয়ে বলল, কি রে, সাহেবের মেয়ের সঙ্গে এত ভাব-সাব যে ইদিক মাড়াতেও ভুলে গেলি?

দোষটা প্রায় স্বীকার করে নিয়েই বাপী জিজ্ঞাসা করল, তুমি জানলে কি করে?

—সেদিন ও-দিক দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম বাগানে মেয়েটার সঙ্গে খুব হুটোপুটি করছিস।

বিমর্ষ মুখে বাপী বলল, আর যাই না, বারণ করে দিয়েছে—

মুখ দেখে আর কথা শুনে আবুরও কৌতূহল।—কে বারণ করল?

—মেমসাহেব মহারাণী—আবার কে!

আবু হাসতে লাগল।—তুই হলি গিয়ে ওদের চোখে একটা কাক—পেখম লাগিয়ে মহরম-মহরম করতে যা আরো!

কাকের ময়ূরপুচ্ছ পরার গল্পটা বাপীও জানে। তবু আবুর কথায় মন খারাপ হয়ে গেল। বলল, আমার ভাল লাগে যে—

—কি ভাল লাগে?

এবারে লজ্জা-লজ্জা মুখ বাপীর।—তুমি কাউকে বলবে না?

আবু মাথা নাড়ল। বলবে না।

—আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

আবুর হাঁ হবার পালা এবার।—কাকে রে?

—ওই মিষ্টিকে।

—বলিস কি রে। ওই পুঁচকে মেয়ের যে চোখই ফোটে নি এখনো!

শুনে শুনে আবুর ঠাট্টা এখন বুঝতে পারে বাপী। আর আবুর কাছে লজ্জা-সরমেরও ধার ধারে না। বলল, হলই বা ছোট—বড় হবে তো?…ওর গায়ে আর চুলে কি মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ, আর হাতটাতগুলো যা নরম না!

—বা বা বা বা! এরই মধ্যে এতটা এগিয়েছিস! হাসতে হাসতে আবু বেশ জোরেই পিঠ চাপড়ে দিল।—লেগে থাক, লেগে থাক—ও মেয়ে বড় হলে খাসা দেখতে হবে ঠিকই, আর পছন্দ হলে তখন তোকে একটা বেয়ারা-টেয়ারা করে নেবে।

আবুর এই ঠাট্টায় বাপীর যথার্থ রাগ হয়ে গেল। ওর ডাকে সাড়া না দিয়ে হন-হন করে চলে এলো।

বাংলোর সামনের রাস্তায় পা ফেলতে গিয়েও পিছু হটে সেই গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।…বারান্দায় সাহেব মেমসাহেব আর মিষ্টি। সাহেব মেমসাহেব কথা কইছে। মিষ্টি এক পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে হাত দুটো দু পাশে পাখির ডানার মত ছড়িয়ে বন-বন করে দফায় দফায় পাক খাচ্ছে। আর থেকে থেকে নিজের মনেই হাসছে।

বাপী দেখছে।

…বাংলোটা ওর চোখে রূপকথার দেশের কোন নিষেধের বাড়ির মত। ক'দিন ধরে সেই রকমই মনে হচ্ছে। মিষ্টিকে কিন্তু কোন রূপকথার রাজকন্যা ভাবা মুশকিল। রূপকথার মেয়েরা কখনো ফ্রক পরেছে শোনে নি, তাই মেলে না। না মিললেও ছুটে যেতে ইচ্ছে করে। আর সাহেব-মেমসাহেবকে রাক্ষস-রাক্ষসীর মত কেটে কুচি কুচি করে ফেলতে ইচ্ছে করে।

…রাক্ষস-রাক্ষসী কেটে ফেললে রূপকথার মেয়েরা খুশি হয়। হাসে। কিন্তু বাবা-মাকে কাটলে মিষ্টি বোকা মেয়ের মতো ভ্যা-ভ্যা করে কাঁদবে।

সেই অবুঝপনার জন্যেই গাছের আড়ালে বাপীর দু চোখ রাগে বোঝাই।

হাতির নাম বনমায়া। বানারজুলি জঙ্গলের পোষা হাতি। কাঠ টানে। আর জিপ চলে না এমন জায়গায় যেতে হলে জঙ্গলের বাবুরা ওর পিঠে চাপে। পিঠে তখন হাওদা লাগানো হয়। বনমায়াকে বাপী জন্ম থেকে দেখে আসছে। ওর পিঠে চেপেওছে কত। বনমায়া নামটাও খুব মিষ্টি লাগে। চা-বাগানের সাহেব বাংলোয় একটা নেপালী মেয়ে কাজ করত। তার ওই নাম ছিল। বছর তিনেক আগে ওই মেয়েটাকে নিয়ে কি একটা হুজ্জত হয়েছিল খুব। এখানকার অনেক লোক সাহেবদের ওপর ক্ষেপে গেছল। আর তারপর থেকে সেই মেয়েটা একেবারে হাওয়া। বাপী তখন আরো কত ছোট। ভালো করে কিছু বুঝতেই পারে নি।

কিন্তু বাপীর মাথা এখন আর অত কাঁচা নয়। বনমায়া নাম থেকে নিজেই বুঝে নিয়েছে এটা মেয়ে হাতি। আবু হেসে হেসে বলে বনমায়ার রূপ খুব। ওকে দেখলে চা-বাগানের আর জঙ্গলের কণ্ট্রাকটরদের মর্দা হাতি দুটো নাকি ছোঁক ছোঁক করে কাছে আসতে চায়। কিন্তু বনমায়ার রূপ যেমন দেমাক তেমন। কাউকে পাত্তাও দেয় না। রূপের কথা বনমায়ার মাহুত ভীম বাহাদুরও বলে। ভীম বাহাদুরের সঙ্গেও বাপীর মন্দ খাতির নয়। মাস গেলে মাইনেটা তো বাপীর বাবার হাত থেকেই নিতে হয়। তা বনমায়ার রূপ নিয়ে ভীম বাহাদুরেরও খুব গর্ব। এদিককার সব নেপালী আর অবাঙালী মেয়ে-পুরুষই মোটামুটি পরিষ্কার বাংলা বলে। ভীম বাহাদুরের জন্ম-কর্ম সব এখানেই। বনমায়ার মাথা চাপড়ে ভীম বাহাদুরকে বাপী নিজের কানে বলতে শুনেছে, তোর মরদ খুঁজে বার করতে হলে আমাকে আফ্রিকার জঙ্গল ঢুঁড়ে আসতে হবে।

আবুও শুনেছিল। সে হেসে সারা। কিন্তু বাপীর মাথায় কিছুই ঢোকে নি। পরে আবু খোলসা করে বলতে কিছু কিছু বুঝেছে।… বনমায়ার বয়েস নাকি মাত্র কুড়ি। আশী-নব্বুই একশ দেড়শ বছর পর্যন্তও বাঁচে হাতিরা। তা এই বয়সেই বনমায়ার সর্ব অঙ্গে রূপ চুয়ে পড়ছে। আর স্বাস্থ্যখানাও তেমনি হয়েছে। প্রায় দশ ফুট উঁচু, পাঁচ ফুটের মতো শুঁড়। ওর খুপ্যি বর

সে-রকম জাঁদরেল মরদ হাতি এখানে কোথায় জুটবে? বরের খোঁজে তাই আফ্রিকায় যাবার কথা বলছিল ভীম বাহাদুর। এখানকার কোনো পোষা মরদ হাতির হাতে ও নাকি কখনো ওকে ছেড়ে দেবে না।

হাতির বর শুনে বাপীর হাসি পেয়ে গেছল। হাতির রূপ কাকে বলে অতশত বোঝে না। একটা হাতির সঙ্গে আর একটা হাতির তফাতও ভালো করে আঁচ করতে পারে না। তবে অনেক দেখার ফলে ছাড়া অবস্থায় একলা চড়ে বেড়ালেও বনমায়াকে ঠিক চিনতে পারে। আর বনমায়া তো ওকে চেনেই। দেখলেই শুঁড় উঁচিয়ে সেলাম ঠোকে। কেরানীবাবুর ছেলেকে সেলাম করাটা ভীম বাহাদুর শিখিয়েছে।

রূপ না চিনলেও বনমায়ার মতো সভ্যভব্য ঠাণ্ডা জীব বাপী আর দেখে নি। হাজার দৌরাত্ম্যেও ওর মেজাজ গরম হয় না। শুঁড় ধরে ঝুলে পড়লেও ও মজা পায় আর দোলা দেয়। কলা বেল আখ শুঁড়ের কাছে ধরে বার বার সরিয়ে নিলে পিটপিট করে তাকায়, তারপর ঝাঁ করে ঠিক এক সময় কেড়ে নেয়। বাপী তখন রাগ দেখিয়ে চড়চাপড় ঘুষি বসিয়ে দেয়। কিন্তু বনমায়া তখন সাত চড়ে রা নেই এমন ঠাণ্ডা।

দেড় মাস আগে, আবুর কথায় যাকে বলে এই বনমায়ার নামেও কলঙ্কের ঢি ঢি পড়ে গেছল একেবারে। সেই বিষম ঘটনার আগের রাতে জঙ্গলের এ-ধারের আর আশপাশের অনেকেই একটা বুনো হাতির ডাক শুনেছিল। সে নাকি সাংঘাতিক ডাক। দল ছাড়া ক্ষ্যাপা বুনো হাতি ভয়ঙ্কর জীব। কাছে ঘেঁষবে কে?

দূরের জঙ্গলে বা পাহাড়ী এলাকায় দল-বাঁধা বুনো হাতির উপদ্রব নতুন কিছু নয়। ছোট পাহাড়ী নদীগুলোর নাম খোল। সেই খোলে ওরা জল খেতে আসে। একসঙ্গে অনেকগুলো পাহাড়ের দিক থেকে নেমে এসে এক-এক সময় জঙ্গল তছনছ করে, চাষের খেত মুড়িয়ে দেয়। ওদিকের লোকেরা তখন দল বেঁধে মশাল জেলে ঢাক ঢোল কানেস্তারা বাজিয়ে হাতি তাড়ায়। ওদিকের ফরেস্ট গার্ডকেও তখন বন্দুক নিয়ে ছুটতে হয়। কিন্তু হাতির দঙ্গল এদিকের জঙ্গলে বা লোকালয়ে আসে না। আবু বলে, বুনো হলেও ওরা বুদ্ধি ধরে। চা-বাগান আর জঙ্গলের সব বাংলোগুলোতেই বন্দুক আছে। এদিকে এলে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে সে ওরা বেশ জানে। ক্ষ্যাপা হাতির কথা আলাদা। ক্ষেপে গেলে কারই বা কাণ্ডজ্ঞান থাকে। সেদিন ওটার হাঁকডাক শুনে জঙ্গলের কুঁড়েতে যারা থাকে তাদের রক্ত জল। ওটা হানা দিয়েছিল চা-বাগানের দিকে।

ওটাকে ভয় পাওয়ানোর জন্য বাগানের সাহেবরা তখন এক-ধার থেকে জঙ্গলের দিকে রাইফেল ছুঁড়েছে। হৈ-হৈ কাণ্ড যাকে বলে। দূরে হলেও থমথমে বেশি রাতের সেই গুলির শব্দ আর হাতির ডাক বাপীরও শোনার কথা। কিন্তু বাপী বিছানায় গা দিল কি ঘুমে কাদা।

পরদিন সকালে সকলের চক্ষু ছানাবড়া। বনমায়ার পায়ের শেকল ছেঁড়া। বনমায়া হাওয়া। ভীম বাহাদুরের মাথা খারাপ হওয়ার দাখিল। পাগলের মতো বনমায়ার খোঁজে তামাম জঙ্গল চষে বেড়াল। সব দোষ এসে চাপল ওরই ঘাড়ে। বুনো হাতির ডাক শুনে ও কেন আগে থাকতে বন্দুক-অলা ফরেস্ট গার্ড এনে বনমায়াকে পাহারা দিল না। ভীম বাহাদুর যত বলে, বুনো হাতি এসে বনমায়ার শেকল ছেঁড়ে নি—তাহলে বনমায়াও চেঁচিয়ে একাকার করত, আসলে বনমায়াই নিজে শেকল ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে—আগের বড়সাহেব ততো রেগে যায়। চাকরি তো গেলই তার ওপর ওর বিচার হবে। একটা হাতি খোয়ানো কম ব্যাপার নয়।

আবু চোখ টিপে হেসে হেসে বলেছিল, ভীম বাহাদুরের কথাই ঠিক। ওটা ছিল বুনো মস্তির প্রেমের ডাক। বনমায়া সাড়া না দিয়ে পারে নি।

তার আগেই ওর কাছ থেকে বাপীর বুনো জীব-জন্তুর প্রেমের পাঠ নেওয়া শুরু হয়ে গেছল। কিন্তু তখন পর্যন্ত মস্তি কথাটা শোনে নি। মস্তি কি?

আবু বলেছে, মরদ হাতির মাথায় প্রেম জাগলে বিষম ব্যাপার। তখন সঙ্গিনী না পেলে ক্ষেপে যায়। সেই সময় ওদের মাথায় আপনা থেকেই এক রকমের রস গড়ায়। ওই দশার সময় ওদের মস্তি বলে। কিন্তু দলছুট মস্তি সঙ্গিনী পাবে কোথায়? তখন আরো ক্ষ্যাপা দশা। পোষা হাতিনী দেখলে শিকল ছিঁড়ে দাঁতের ঘা মেরে মেরে ওটাকে টেনে নিয়ে যাবেই। না গেলে মেরে ফেলবে। আবুর মতে বনমায়ার দুর্জয় সাহস। নিজে থেকে নিঃশব্দে শেকল ছিঁড়ে ওই বুনো মস্তির সঙ্গে পালিয়েছে। পোষমানা মেয়ে হাতিরা তো বুনো মস্তিকে সাংঘাতিক ভয় করে।

সব জানা আর শোনার পর বাপীর বনমায়ার জন্য খুব চিন্তা হয়েছিল। বুনো মস্তি শেষ পর্যন্ত ওটাকে মেরেই ফেলে কিনা কে জানে। আর ভীম বাহাদুরের জন্য বেজায় দুঃখ হয়েছিল। পাগলার মতো ও তখনো বনমায়াকে খুঁজেই চলেছে।

তিন সপ্তাহ বাদে আবার এক দারুণ ব্যাপার। আর সেই ব্যাপারের নায়ক কিনা বাপী নিজেই। বনের পশু-পাখির কিছু ভালবাসাবাসি দেখার তাড়নায়

ছুটির সেই নির্জন দুপুরে একলাই জঙ্গলে ঢুকেছিল। হঠাৎ দেখে দশ গজের মধ্যেই একটা হাতি! ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। ভালো করে দেখবে কি, ভয়ে গায়ের রক্ত জল।

তার পরেই কি কাণ্ড। ও যে বনমায়া! ওই তো শুঁড় উঁচিয়ে সেলাম করল ওকে! বাপী বিশ্বাস করবে না স্বপ্ন দেখছে?

আনন্দে আর উল্লাসে পাগলের মতো নাচই শুরু করে দিয়েছিল বাপী। আর ওর শুঁড় ধরে টানাটানি করে বলেছিল, চল শিগগীর চল, তোর জন্যে এদিকে কত কাণ্ড!

কিন্তু বনমায়া কম বজ্জাত নয়। পাছে একলা গেলে মার-ধর খেতে হয়, বাপীর ধারণা সেই জন্যেই শুঁড়ে পেঁচিয়ে ওকে মাথায় তুলে বসিয়ে নিয়ে তারপর চলল।

কি মজাই না হল তারপর। যে দেখে সে হাঁ। বনমায়ার মাথায় চড়ে বাপী আসছে! কাতারে কাতারে লোক ছুটে আসতে লাগল। আর ভীম বাহাদুর তো বনমায়াকে দেখে কেঁদেই ফেলল। প্রথমেই রাগের চোটে ওর শুঁড়ে দুমদাম কটা ঘুষি। তারপর কান্না। শেষে সকলের সামনে বাপীকে জড়িয়ে ধরে কি আদর কি আদর!

শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে সেই বনমায়া আসছে জঙ্গল ধরে। ওর পিঠে হাওদায় তাতে মিষ্টি বসে, দীপুদা বসে আর বন্দুক হাতে ফরেস্ট গার্ড দেবকী দাস বসে। মাথার ওপর ঘাড়ের দিকে ভীম বাহাদুর।

পরের রবিবারে সকালে জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে বড়সাহেবের বাংলোর দিকেই আসছিল বাপী। এই দৃশ্য দেখে পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল।

বনমায়া গলা দিয়ে ঘোঁৎ করে একটু আনন্দ জানিয়ে শুঁড় উঁচিয়ে বাপীকে সেলাম ঠুকলে। তাই দেখে মিষ্টি আর দীপুদা অবাক। আনন্দে হাততালি দিয়ে মিষ্টি বলে উঠল, কি মজা দাদা, বাপীকে তুলে নে না, ও জঙ্গলের কত কি জানে—ও লোভ দেখিয়েছিল বলেই তো বাবা-মাকে ধরে আজ জঙ্গলে আসা হল—

দাদার হুকুমের পরোয়া না করেই ভীম বাহাদুর সানন্দে ডাকল, জলদি উঠে এসো বাপী ভাই, আজ বহুত মজা হবে।

রক্ত নেচে উঠলেও বাপী নড়ছে না। জিপে করে স্কুলে যেতে চাওয়ার অপমান ভোলে নি। দীপুদার মুখ দেখে মন বোঝার চেষ্টা।

জঙ্গলে ঢুকতে যাচ্ছে বলেই দীপুদার আজ উদার হতে বাধল না। একজন

বাড়লে জোরও একটু বাড়ে। বলল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, উঠে আয়—

না, ওর ওঠার জন্য বনমায়াকে ওয়েট করানোর দরকার নেই। বাপী ওর শুঁড় বেয়ে তরতর করে উঠে এলো। ভীম বাহাদুরকে পেরিয়ে হাওদায় মিষ্টির গা ঘেঁষে বসে পড়ল। ওর বরাত বটে একখানা আজ। আনন্দের চোটে গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো, দুর্গা দুর্গা—

মিষ্টির আবার খিলখিল হাসি।— দুর্গা দুর্গা কেন, আমরা কি শিকারে চলেছি?

বাপীর মাথায় দুষ্টুমি খেলে গেল তক্ষুনি। বলল, তা না, নাম নিলে যাত্রা ভালো হয়, গাছ থেকে তো অনেক সময় সাপ-টাপও লাফিয়ে পড়তে পারে—

—অ্যাঁ? শিউরে উঠে বাপীর সঙ্গে একেবারে লাগালাগি হয়ে বসল মিষ্টি।

দীপু এদিকের জঙ্গল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় তেমন। অস্বস্তি তারও, চোখ পাকালো—তুই ওকে ভয় দেখাচ্ছিস?

বাপীর মুখ আমসি। এক্ষুনি না ওকে আবার নেমে যেতে বলা হয়। সামাল দিল দেবকীনন্দন, কিছু ডর নাই ছোট হুজুর, তার আগেই আমি গুলি করে খতম করে দেব।

ফাঁড়া কাটল। বনমায়া হেলে দুলে চলেছে। আর তাইতে মিষ্টির ছোট্ট শরীর ওর গায়ে কেবলই ঠোক্কর খাচ্ছে। তাছাড়া লেগেই বসে আছে ওর সঙ্গে। মেয়েটার শরীরের হাড়গোড়সুদ্ধু নরম। চুরি করে বেশ বড় বড় নিঃশ্বাস টানছে বাপী। মিষ্টির গায়ের গন্ধ, আর চুলের গন্ধ।

দেবকীনন্দন কত রকমের জানোয়ার আছে এই জঙ্গলে দীপুদাকে শোনাচ্ছে। নটখট জানোয়ারের মধ্যে চিতাবাঘ, ভালুক, বুনো শুয়োর, বুনো হাতি, বন-বেড়াল - ঢাউস সাপ—এই সব।

চকিতে বাপীর মাথায় আবার এক মতলব খেলে গেল—দীপুদা, আবুকে তুলে নিই চলো। তাহলে দারুণ হবে— ভালুক-টালুক এসে গেলে ও কেমন নেমে গিয়ে তাড়া করে দেখবে—কোথায় কোন্ রকমের জানোয়ার থাকে ও সব জানে। সঙ্গে সঙ্গে আরো লোভের টোপ ফেলল, তাহলে আজই খরগোশ বা বন-মোরগও ঠিক পেয়ে যাবে—

আবু ছেলেটা যে ডাকসাইটে দীপুর জানা হয়ে গেছে। এখানকার নতুন বন্ধুদের মুখে শুনেছে। প্রথম দিনের সেই সজারু মেরে আনাটাও ভোলে নি। তাছাড়া ওর বাবা কালু তো ওকে তার বড়সাহেবের কাছে বাংলোতে এনে

হাজির করেছিল। সাহেবকে ছেড়ে আবু দীপুকেও বুকে মাথা ঠেকিয়ে আদাব জানিয়েছিল। একটা দুটো বনমোরগ নিয়ে বাংলোয় ফিরলে বাবা-মাও খুশী হবে। এদিকে বনমোরগ মারার মজাটাও মন্দ হবে না। তাছাড়া অচেনা জঙ্গলে তার মতো একটা ছেলে থাকলে আরো নিশ্চিন্দি।

তবু ইতস্তত ভাব একটু—তুলে এনে বসাবি কোথায়, এই হাওদার মধ্যে আর গাঁজাগেঁজি হয়ে বসতে পারব না।

বাপী বুঝল আসলে বাবুর মানে লাগছে। ব্যস্ত হয়ে বলল, সে তুমি কিচ্ছু ভেব না দীপুদা, আবু ঠিক ভীম বাহাদুরের পাশে জায়গা করে নেবে।

আবুকে তুলে নেওয়ার কথায় ভীম বাহাদুরও তক্ষুনি সায় দিল। বলল, হাঁ, ঠিক হোয়ে যাবে ছোট সাব, বনমায়া কি ছোট মেয়ে।

নিজের নাম শুনেই হাতিটা কান খাড়া করল। আর ছোট মেয়ে শুনে মিষ্টির খিল-খিল হাসি। হাসলেই ওর ঝাঁকড়া চুলের মাথাটা বাপীর বুকে ঠেকছে।

দীপুই কর্তাব্যক্তি এখানে। আবেদন মঞ্জুর করল, ডেকে নে তা হলে, কতদূর?

হাতিতে চেপে গেলে কি আর দূর, ভীম বাহাদুর চলো। সোনায় সোহাগা গোছের আনন্দ বাপীর।

আবু কতটা খুশী মুখ দেখে বোঝা ভার। সাহেবের ছেলে সঙ্গে আসতে বলেছে শুনে তেরছা চোখে বাপীর দিকে তাকালো। মিষ্টির দিকেও। উল্লাস মাখা চোখ দুটো দিয়েই বাপীর ওকে টেনে আনার তাগিদ। ঘর থেকে নিজের লাঠিখানা নিয়ে আবু এসে হাতির শুঁড়ে চেপে বসল। সকলের আনন্দ ষোল কলায় পূর্ণ।

আনন্দের হুল্লোড়ের মধ্যে তিনটে ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল। আবুকে নিয়ে বাপীর গর্ব সার্থক। দীপুদা আর মিষ্টি দুজনেই ওর তারিফ করেছে। আবুর কথামতো হাতি নিয়ে এক এক দিকে হানা দেবার ফলে ওরা দু'দুটো ভালুক পালাতে দেখেছে। একটা বুনো শূয়োর দেখেছে। বুনো শূয়োরটার বেজায় রাগ, আবুর দিকে তেড়ে এসেও শেষে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে জঙ্গলে ঢুকে গেল। আবু তখন হাতির শুঁড় ঘেঁষে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। একলা পেলে ওই বুনো শূয়োর ওকে আস্ত রাখত না। হাওদায় বসে থাকলেও মিষ্টির গা ছমছম করছিল, ভালুক আর ওই শূয়োর দেখে এক হাতে বাপীকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরছিল। বরাতজোরে একটা বাঘ-টাগ যদি বেরিয়ে পড়ত,

নিদেনপক্ষে কাছাকাছির মধ্যে কোথাও বাঘের গর্জন-টর্জনও যদি শোনা যেত, মিষ্টি তাহলে দু' হাতেই ওকে জাপটে-মাপটে ধরত বোধ হয়। লাগালাগি হয়ে তো বসেই আছে, তাছাড়া আনন্দের ফাঁকে ফাঁকে মিষ্টির অজান্তে কতবার যে ওর গায়ে পিঠে কোমরে হাত দিয়েছে বাপী, সে শুধু ও নিজেই জানে।

বুনো শূয়োর দেখার পর দেবকীনন্দন আর ঘন জঙ্গলের দিকে যেতে রাজি হয় নি। বড় সাহেবের বকুনির ভয় আছে। ফেরার সময় আবুর সঙ্গে বাপীও কিছু কেরামতি দেখাতে পেরেছে। তিন-তিনটে বন-মোরগ মারা হয়েছে, তার মধ্যে হাতির পিঠ থেকে নেমে একটা ও মেরেছে। বাকি দুটো আবু। খরগোশ মারা গেল না। দীপুর একটা হরিণ মারার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সাহেবের হুকুম ভিন্ন দেবকীনন্দন রাজি হল না। শিকারের ব্যাপারে রিজার্ভ ফরেস্টের আইন-কানুন সে-সময়েও ছিল। কিন্তু শিকারীরা সে-সময় আইনের পরোয়া বড় একটা করত না। কিছু টাকা খসালেই ফরেস্ট গার্ডের মুখ শেলাই। কিন্তু খোদ বড়সাহেবের ছেলের সঙ্গে এসে দেবকীনন্দন আইন অমান্য করে কি করে।

সকলের সঙ্গে এইদিন বাপীও নির্ভয়ে বড়সাহেবের বাংলোয় ঢুকতে পেরেছে। বন-মোরগ নিয়ে দীপুদা যেন দিগবিজয় করে ঘরে ফিরেছে। তিন-তিনটে বন-মোরগ দেখে মেমসাহেবও খুশি। তার মধ্যে একটা বাপী মেরেছে মিষ্টি সে-খবরও তার মাকে জানিয়ে দিল। বাপী আশা করেছিল, মেমসাহেব একটা মোরগ অন্তত ওকে আর আবুকে দিয়ে দেবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি।

বাপীর তা বলে আফসোস নেই খুব। বাধা নিষেধ ঘুচল ভেবে আনন্দে আটখানা। মিষ্টিকে এক ফাঁকে জানিয়ে দিল, দুপুরে খেয়ে-দেয়ে আবার সে আসছে। বলেই ছুট। আবু আগেই বেরিয়ে এসেছিল। তাকে ধরল।

আবু ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালো ওর দিকে। গম্ভীর। কিন্তু ভিতরে হাসছে বোঝা যায়। একটা চোখ ছোট করে বলল, কি রে, খুব মজা লুটলি বুঝি আজ —মেয়েটাকে তো কোলে সাপটে নিয়ে বসেছিলি দেখলাম—

বারো বছরের জীবনে বাপী এত আনন্দ আর পেয়েছে কিনা জানে না। অচেনা গোছের ভারী অদ্ভুত স্বাদ এ আনন্দের। শরীরটার ভেতর পর্যন্ত নরম-নরম একটা স্পর্শ এখনো ছড়িয়ে আছে। আবুর কথা শুনে লজ্জা পেল। এক ও ছাড়া আর সকলের চোখে ধুলো দিতে পেরেছিল। এমন কি ওই বোকা মেয়েটার চোখেও।

আবু এবারে নিজে থেকেই মন্তব্য করল, তোর স্বভাবচরিত্তি আমার থেকে

ভালো বলতে হবে—

আবুর কোনো কথাই বাপীর কাছে হেলা-ফেলার নয়। ঠাট্টা হলেও না। মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা।—কেন?

—একটা দুধের মেয়েকে নিয়ে দিব্বি মেতেছিস। তোর মতো বয়সে আমার ষোল-আঠারো বছরের মেয়েগুলোকে ভালো লাগত।

বাপী বিমূঢ় একটু। আবু এখন বড় জোর সতের পেরিয়েছে। বাপীর বয়েসে মানে বারো বছব বয়সে ষোল-আঠারোর মেয়েদের ভালো লাগত। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে এখন?

—এখন কি?

—এখন কোন্ বয়সের মেয়েদের ভালো লাগে?

ফোঁস করে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল আবু।—আর বলিস না, আমার বারোটা বেজে গেছে। বয়েস-টয়েসের ধার ধারি না, ভালো এখন শুধু একটা মেয়েকেই লাগে—কিন্তু ভীম বাহাদুর টের পেলে আমার মুখ থেঁতো করে দেবে—

শুনে বাপী হাঁ একেবারে।—কেন? কোন্ মেয়েকে ভালো লাগে তোমার?

—বনমায়াকে। মানুষের মেয়ে-টেয়ে আর ভালো লাগে না। অমন ভাকাবুকো প্রেম ওই বজ্জাতের মতো আর কোনো মেয়ে জানে না। ডর-ভয়ের মাথা খেয়ে একুশ দিনের মধ্যে একটা বুনো মস্তিকে ঠাণ্ডা করে ঘরের মেয়ে আবার ঘরে ফিরে এলো—চাট্টিখানি কথা!

বাপী এরপর হেসে বাঁচে না! ঘরে ফিরেও আবুর হাতি-মেয়ের প্রেমে পড়ার কথা যতবার মনে এসেছে, কেবল হেসেছে।

কিন্তু আবুর ঠেসের কথায় বাপী একটুও হতাশ হয় নি। মিষ্টিটা ছোটই বটে। কিন্তু যে মিষ্টিকে ওর খুব ভালবাসতে ইচ্ছে করে সে যেন ঠিক অত ছোট নয়। বাপী নিজেও তো সকলের চোখে কত ছোট, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ও কি আর তেমন ছোট? মিষ্টিরও দেখতে দেখতে আর একটু বুদ্ধিসুদ্ধি হবে। আর, আবু তো নিজেই বলেছে বড হলে ওই মেয়ে খাসা দেখতে হবে।

পিসীর চোখে ধুলো দিয়ে সময় হিসেব করে বাপী দুপুরে আবার মিষ্টিদের বাংলোর সামনে হাজির। কিন্তু সামনের বারান্দা ফাঁকা। এই হিসেবে গরমিল দেখেই বাপীর মেজাজ গরম। দুটো বেজে গেছে, চারটের মধ্যেই তো ওর মা

মহারানী দিনের ঘুম সাঙ্গ করে হেলে দুলে ওই বারান্দায় এসে দাঁড়াবেন। গেটটা ধরে বাপী শূন্য কাঠের বারান্দার দিকে চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু ঘরের জানলা দিয়ে মিষ্টি ওকে ঠিকই দেখেছে। বাবা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ও দিকে মায়েরও পাকা ঘুমের ঘন নিঃশ্বাস। মিষ্টির ওপরেও মায়ের আজ একটু ঘুমোনোর হুকুম ছিল। দাদা যে ছুটির দিনে আড্ডা দিতে বেরোয় সেটা কিছু নয়। ঘুম-টুম ধারে কাছে নেই মিষ্টির। উপুড় হয়ে শুয়ে মুখ তুলে জানলা দিয়ে গেটের দিকে দেখছিল।

পা টিপে বিছানা থেকে নেমে এলো। তারপর বারান্দায় এসেই ফিক করে হাসি। এই লুকোচুরির দেখাশুনার মধ্যে বেশ মজা আছে।

মজার ছোঁয়া বাপীর মুখেও। হাত তুলে মিষ্টিকে কাছে আসতে ইশারা করল। মিষ্টি দ্বিধায় পড়ল একটু। ওর ইচ্ছে বাপী আসুক। কিন্তু গেল সপ্তাহে ওকে এখানে এনে বসানোর ফলটা ভালো হয় নি মনে আছে। দেড় দু' ঘণ্টা এখন আনন্দে কাটানোর ইচ্ছে ওরও।

গেটের কাছে আসতে এ-ধার থেকে বাপী জিজ্ঞাসা করল, কি কচ্ছিলি?

—মায়ের কাছে শুয়ে ছিলাম, আর তুমি আস কিনা জানলা দিয়ে দেখছিলাম—

—মা কি কচ্ছে?

—মা-বাবা দু'জনেই ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে—ভারী খাওয়া হয়েছে তো।

—খুব মুরগির মাংস সাঁটালি বুঝি?

মিষ্টির মুখে এখনো জল গড়ানোর দাখিল।—কি সুন্দর খেতে, মা নিজে রান্না করল। দাদা তো নিজে পেট ঠেসে খেয়ে টিফিন বাক্সয় করে তার বন্ধুর জন্যেও নিয়ে গেল—

বাপী এবারে ঠেস দিতে ছাড়ল না। বলে উঠল, আমরা মেরে এনে দিলাম আর নিজেরাই স্বার্থপরের মতো খেলি—আমাদের কথা একবার মনেও পড়ল না?

মিষ্টি বিপাকে পড়ল। বাপী বলার পরে মনে হল ওদেরও দেওয়া উচিত ছিল। বলল, মা না দিলে আমি কি করব...এখনো আছে বোধ হয়, মা ঘুম থেকে উঠলে তোমাকে দিতে বলব?

—আমার খেতে বয়ে গেছে, আমি কি ভিখিরি? শব্দ না করে শেকল সরিয়ে আস্তে আস্তে গেটটা খুলল।—নে, বেরিয়ে আয় চট করে, জঙ্গলের মধ্যে

ঢুকে পড়ে খেলা করিগে চল্।

কিন্তু মিষ্টির অত সাহস নেই।—মা জানতে পারলে রক্ষে রাখবে না।

—তুই আচ্ছা ভীতু। মা জানছে কি করে, তার ঘুম ভাঙার ঢের আগেই তুই চলে আসবি। তোকে নিয়ে কি আমি দূরে যাব নাকি, কাছেই খেলা করব—জঙ্গলের মতো মজা আর কোথাও আছে নাকি, নিজেই তো দেখলি!

মিষ্টি তবু ভয় পাচ্ছে দেখে এবারে রেগেই গেল।—মায়ের পাশে শুয়ে তুইও তাহলে ঢেপসির মতো ঘুমোগে যা—মুরগির মাংস খুব ভালো হজম হবে'খন—স্বার্থপর মেয়ে কোথাকারের, আর কক্ষনো যদি আসি।

গেট ছেড়ে বাপী রাস্তাটার ওপারে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ভাবখানা এক্ষুনি ও একলাই জঙ্গলে নেমে যাবে।

বাপীকে অন্তত না দিয়ে নিজেদের মুরগির মাংস খাওয়াটা যে স্বার্থপরের কাজ হয়েছে মিষ্টি এখন আর সেটা অস্বীকার করে কি করে। তাছাড়া সকালে ওই ছেলের সঙ্গে জঙ্গলে ঘোরার মজাটাও কম হয় নি। ও চলে গেলে সত্যি খারাপ লাগবে। রাগ করে যদি আর না আসে তাহলে আরো খারাপ লাগবে।

একটা হাত তুলে বাপীকে দাঁড়াতে বলল। তারপর হালকা পায়ে ছুটে বাংলোয় উঠে গেল। বাবা মা কেমন ঘুমোচ্ছে উঁকি দিয়ে দেখে নিল। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ছুটে চলে এলো। সন্তর্পণে গেটের শিকলটা তুলে দিয়ে সেও রাস্তার এ-ধারে। উত্তেজনায় বুকের ভিতরে টিপটিপ।

মিষ্টির একটা হাত বাপীর দখলে। তরতর করে রাস্তার ঢল বেয়ে নেমে চোখের পলকে দু'জনে জঙ্গলের আড়ালে। মিষ্টির গা ছমছম করছে। এখন তো আর বড় কেউ সঙ্গে নেই। ভিতরে পা দিয়েই মনে হল জঙ্গলটা কি ভীষণ নিরিবিলি এখন।

বাপীর বুঝতে দেরি হল না। হাতির পিঠে বসেই ভালুক আর বুনো শুয়োর দেখে ওই মেয়ে ওকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরছিল। ওর যেন সুবিধেই হল।

—ভয় করছে বুঝি?

মিষ্টির স্বীকার করতে আপত্তি, আবার একেবারে অস্বীকারও করতে পারছে না।

—দূর বোকা মেয়ে, আমি তো সঙ্গে আছি। হাত ছেড়ে বাপী এবারে ওর কাঁধ ধরে নিজের গায়ের সঙ্গে আগলে নিয়ে পা বাড়ালো।

ভয়-ডর কিছুক্ষণের মধ্যেই মিষ্টিরও উবে গেল। দুটো রঙ-চঙা প্রজাপতির পিছনে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। পাথর হাতে করে গাছের ডোরা-কাটা কাঠবিড়ালিও তাড়া করল দু'জনে। একটা খরগোস ও-দিক ফিরে গাছের কচি পাতা খাচ্ছিল, একেবারে একটুর জন্যে বাপীর ঢিলে থেঁতো হবার হাত থেকে বেঁচে গেল।

এ এক ভিন্ন রোমাঞ্চ। ছোটাছুটির ফলে মিষ্টি অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। বাপীব চোখে তাও মিষ্টি মিষ্টি লাগছে। ফোলা ফোলা গাল দুটোতে এখন যেন আলগা রং লেগেছে। চুলের গোছা মাঝে মাঝেই মুখে এসে পড়ছে। বাপী লক্ষ্য রাখছে, ফাঁকে পেলে ওর আগে নিজে হাত বাড়িয়ে সেগুলো পিছনে সরিয়ে দিচ্ছে।

এরপর একটা গাছের বুক-সম'ন নীচু মোটাসোটা ডাল বেছে নিয়ে বাপী দু'হাতে ভর দিয়ে সেটার ওপর লাফিয়ে উঠে বসল। তারপর ঝোলানো পা দুটোকে শক্ত করে একটু ঝুঁকে মিষ্টির হাত দুটো ধরে হুকুম করল, নে, পায়ের ওপর পা দিয়ে উঠে চলে আয়।

মিষ্টির এখন সবেতে আনন্দ। গাছের ডালে কখনো চড়ে নি বা বসে নি। বাপীর হাত ধরে ওর পা বেয়ে উঠতে চেষ্টা। খিল খিল হাসি। ওঠা হল, এখন হাত ছেড়ে বাপীর পাশে গাছের ডালে বসে কি করে?

কি কবে বলবে বাপী সেটা ভালোই জানে। একটা হাত ছেড়ে কোমরের কাছটা জড়িয়ে ধরে নিজের কোলের ওপর টেনে নিয়ে এলো ওকে। মুখে মুখে ঠেকল, মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি। তারপর দু'হাতে একরকম জাপটে ধরেই পাশে ডালের ওপর বসিয়ে দিল।

মিষ্টি আনন্দে আত্মহারা। আর আনন্দের সঙ্গে বাপীর হাড় মাংসের মধ্যে আরো অচেনা কিছুর ঝিলিক। গাছে বসার পরেও এক হাতে নিজের গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে আছে ওকে।

কিন্তু মিষ্টির এখন সাহস খুব।—আঃ, সাপটে ধরে আছ কেন, ছাড়ো না!

জবাবে একটু ধমকের স্বরে বাপী বলল, হ্যাঃ, পড়ে গেলে তখন? তোর কি অভ্যেস আছে? পড়ে গিয়ে ওই ননীর শরীর একটু ছড়ে গেলে তোর মা আস্ত রাখবে আমাকে? গাছে একটা বাঁদর-টাদর এসে বসলেই তো তুই ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবি।

মিষ্টি সভয়ে গাছের ওপরটা দেখে নিল একবার।—বাঁদর এসে বসবে নাকি?

বাপী যথাসম্ভব গম্ভীর।—আমি থাকলে ভয় নেই, এখানকার বাঁদরেরা আমাকে ওদের হেডমাস্টার ভাবে।...বাড়ির থেকে এখানে তোর ভালো লাগছে কিনা বল্—

সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টির অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস।—খু-উ-ব ভালো লাগছে। সকালেও ভালো লেগেছিল। বাড়িতে কিচ্ছু মজা নেই।

সোৎসাহে বাপী বলল, তাও তো এখন পর্যন্ত কিছুই দেখিস নি তুই। জঙ্গলে জীব-জন্তুরা যে কি-কাণ্ড করে না!

ওদের ভাল-বাসাবাসির ব্যাপারটা বলতে গিয়েও বলল না। হাঁদা মেয়ে বাড়ি গিয়ে যদি আবার কাউকে বলে দেয় তাহলে চিত্তির। জোরে শ্বাস টানল বার কয়েক। মিষ্টির চুলের গন্ধ আর গায়ের গন্ধ। সকালে আবু ঠাট্টা করে বলছিল, হাওদার ওপর ও নাকি মিষ্টিকে কোলে সাপটে নিয়ে বসেছিল। না অতটা পারেনি। ওকে গাছে টেনে তোলার সময় বরং ঢের বেশি চালাকি করা গেছে। সেই চালাকির ঝোঁকটাই মাথায় চেপে বসছে আবার।

—তোর চুলে আর গায়ে সুন্দর গন্ধ...কি করে হল রে? কি মাখিস?

মিষ্টি বলল, চুলে মা গন্ধ তেল মেখে দেয়, চানের সময় গায়ে সাবান ছাড়া আর তো কিছু মাখি না—

বাপী ওর গলার নীচে নাক ঠেকিয়ে জোরে দু'বার শ্বাস নিল। তারপর মন্তব্য করল, তোর গায়েও সুন্দর গন্ধ।

নিজের বুকে চিবুক ঠেকিয়ে মিষ্টি বুঝতে চেষ্টা করল কি-রকম সুন্দর গন্ধ! তারপর বলল, আমি তো পাচ্ছি না।

বাপী বলল, নিজেরটা নিজে পাওয়া যায় না বোধ হয়, আমার পাস কিনা দেখ্ তো।

মিষ্টি ওর বুকে নাক ঠেকিয়ে জোরে শ্বাস টেনেই মুখটা বিকৃত করে ফেলল।—

এঃ, বিচ্ছিরি ঘামের গন্ধ!

রাগ না করে বাপী হাসতে লাগল। বলল, আমি তো ছেলে, বুঝলি না—ছেলেদের গায়ে কি মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ মানায়!

আনন্দে যত বিভোর হোক, আজ সময়-জ্ঞান ভোলেনি বাপী। ধরা পড়লে আজকের আনন্দ তো মাঠে মারা যাবেই, পরেও আর কোনো আশাই থাকবে না। লাফিয়ে ডাল থেকে মাটিতে নেমে পড়ল। তারপর দু'হাত

বাড়িয়ে মিষ্টিকে ডাকল, আয়।

ওর মতো লাফিয়ে নামতে পারে কিনা মিষ্টি একবার দেখে নিল। লোভ হচ্ছে, কিন্তু খুব ভরসা পাচ্ছে না। সেটা বোঝায় সঙ্গে সঙ্গে বাপীর গলায় শাসনের স্বর।—হাতে পায়ে লেগে গেলে জঙ্গলে ঘোরার মজা একদিনেই শেষ —চলে আয়।

দু'দিকের পাঁজর ধরে বাপী নিজের বুকের ওপর টেনে নামালো ওকে। তারপর তক্ষুনি মাটিতে না নামিয়ে সেই ভাবেই দশ বারো পা এগিয়ে গেল। বুক ছেড়ে মুখের সঙ্গেও মুখ ঠেকে আছে। এবারে মিষ্টির অস্বস্তি।—মাটিতে নামাচ্ছ না কেন।

—দাঁড়া, পিঁপড়ের ডাঁই-ফাই দেখেছিলাম ও-দিকটায়। দাঁড়িয়ে গেল। মুখে হাসি।—আমার গায়ে কত জোর জানিস, তোকে আমি এমনি করে ওই রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি—যাব?

—না—না। মিষ্টি এবারে হিঁচড়ে নেমে এলো।—আমি কি ছোট, কেউ দেখে ফেললে?

মাটিতে নেমে গেলেও বাপী ওর হাতের ওপর দখল নিতে ছাড়ল না। রাস্তার কাছাকাছি এসে হাতও ছাড়ল।—শোন্, বাড়িতে কাউকে কিছু বলবি না কিন্তু, খবদ্দার!

ঠোঁট উল্টে মিষ্টি জবাব দিল, কি বুদ্ধি তোমার, বললে তো মা আমাকেই আগে ঠেসে বকুনি লাগাবে।

ছুটে রাস্তায় উঠে গেল। বাপীও এগিয়ে এসে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে। সন্তর্পণে গেট খুলে আবার শেকল লাগিয়ে দিয়ে মিষ্টি চোরের মতোই বাংলোয় উঠে গেল। ঘরের মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে এক-মুখ হেসে আবার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো। গাছের আড়াল থেকে বাপীও গলা বাড়িয়েছে। হাত নেড়ে মিষ্টি বুঝিয়ে দিল, বাবা-মা এখনো ঘুমোচ্ছে।

বাপী হাওয়ায় ভেসে বাড়ি চলল। আবুটা শুনলে কি বলবে ভাবছে আর হাসছে। সেই সঙ্গে একটা অবুঝ আনন্দ ভিতর থেকে উপছে পড়তে চাইছে। এটা কি রকমের আনন্দ বা এ-রকম কেন হয় বাপীর কাছে এখনো খুব স্পষ্ট নয়।

...তবে আবুর একটা কথা ঠিক, মিষ্টিটা এখনো বড্ডো ছোট। আজ এত্ত কাণ্ড হয়ে গেল, ও কিছু বুঝতেই পারল না। তাই ওর এই আনন্দের এক ফোঁটাও ভাগ পেল না।

··বাপীর যদি সে-রকম মন্ত্র-টন্ত্র কিছু জানা থাকত, মিষ্টিটাকে তাহলে রাতারাতি আর একটু বড় করে ফেলত।

ঠিক এক বছরের মাথায় বনমায়াকে নিয়ে আবার একপ্রস্থ হৈ-চৈ। আর তার এক মাসের মধ্যে ওর মাহুত মন-মরা ভীম বাহাদুরের আশা আর ভবিষ্যদ্বাণী দুই-ই তাক লেগে যাওয়ার মতো সফল।

বনমায়া আবার পালিয়েছে। এক মাস না যেতে ঠিক আগের বারের মতো একা নিজেই আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু ওর এবারের পালানোটা একেবারে অন্যরকম। এবারে আর জঙ্গলের কেউ বা আশপাশের বন্দুক-অলা সাহেবদের কেউ দ্বিতীয় কোনো বুনো হাতির হাঁকডাক শোনে নি। এদিকে প্রথমবার পালানোর ফলে বনমায়ার পায়ের শেকল বদলে ঢের শক্ত-পোক্ত শেকল আনা হয়েছিল। পেল্লায় শালগুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা সেই শেকল ছেঁড়া একলা বনমায়ার কর্ম নয়। একলা যে ছেঁড়ে নি তারও প্রমাণ মিলেছে। আগের রাতে অল্প অল্প বৃষ্টি হয়েছিল। সেখানকার মাটিতে বনমায়া ছাড়া আরো একটা হাতির পায়ের ছাপ দেখা গেছে। আর জঙ্গল থেকে দূরের পাহাড়ের দিকে পাশা-পাশি দুটো হাতি চলে যাওয়ার হদিসও মিলেছে।

মোট কথা, এটা স্পষ্ট বোঝা গেছে, বুনো মরদ হাতিটা এবারে নিঃশব্দে এসেছে। দুজনে মিলে শিকল ছিঁড়ে তেমনি নিঃশব্দে একসঙ্গে পালিয়েছে। এই পাহাড়ী জঙ্গল এলাকায় একটু বৃষ্টি হলেই দিব্বি ঠাণ্ডা পড়ে। সাহেব-সুবোরা বিলিতি আর জঙ্গল বা চা-বাগানের নিচের ধাপের জোয়ান-বুড়োরা দিশী মদ টেনে পাকা ঘুম লাগায়। বড় রকমের হাঁক-ডাক না হলে এমনিতে তাদের অসময়ে ঘুম ভাঙার আশা কম।

বড়সাহেব সন্দীপ নন্দী গেল বছরের হাতি পালানোর ফিরিস্তি শুনেছেন। এবারে এমন নিঃশব্দে পালানোর ব্যাপারটা নিজে চাক্ষুস তদারক করে ভীম বাহাদুরের খুব একটা দোষ খুঁজে পেলেন না। কিন্তু মরা হাতির দাম যেখানে লাখ টাকা, সেখানে পোষা জ্যান্ত হাতি পালালে সরকারি কৈফিয়তে দোষ-ত্রুটি তো কিছু বার করতেই হবে। হাতি তার প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েছে অতএব কারো দোষ নেই এ-কথা লিখতে পারেন না। ও-দিকে চোখের জল ফেলে আর দু-হাত জোড় করে ভীম বাহাদুর যা বলছে তাতে তড়িঘড়ি শাস্তি দেওয়া দূরের কথা, গম্ভীর থাকা দায়। তার আর্জির সার কথা, সাহেব যেন

নারাজ না হন, সে নিরপরাধ হলেও দোষ মেনে নেবে যদি না বনমায়া ফিরে আসে। গা জুড়োলেই বনমায়া ফিরে আসবে। আসবেই।

ওর সমব্যথী ফরেস্ট গার্ড আর বীটম্যানদেরও সেই বিশ্বাস। অতএব বড়সাহেব তদন্তসাপেক্ষ রিপোর্ট দিয়ে বিচার স্থগিত রেখেছেন। আর মুখে ভীম বাহাদুরকে বলেছেন, ভালো করে তল্লাসি চালিয়ে যেতে, না পেলে মুশকিল হবে।

ভীম বাহাদুরের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি প্রমাণ করে গেলবারের মতোই, এক মাসেরও আগে বনমায়া যেমন নিঃশব্দে গেছল তেমনি নিঃশব্দে আবার ফিরে এসেছে। আর রাগের চোটে এবারে ভীম বাহাদুর পাগলের মতো কাণ্ড করেছে। ঘর থেকে ডাঙশটা এনে ওর মাথায় চেপে বসে এলোপাথারি মার শুরু করেছিল। বনমায়াও তেমনি গাঁ-গাঁ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। ভীম বাহাদুরের একটা পা ধরে টেনে আবু ওকে হিঁচড়ে নামিয়েছে। তারপর ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছে, কি বুদ্ধি তোমার, প্রেম মাথায় চড়লে ও পালাবেই, কিন্তু এরকম মার খেলে আর ফিরে আসবে?

ওর যুক্তির কথা শুনে বনমায়াকে ভীম বাহাদুরের এরপর সে-কি আদরের ঘটা।

কত কি আছে যা ভাগ না করলে ভোগের আনন্দ বাড়ে না। বাপীরও সেই গোছের খেদ। খেদ কেন, রাগই বলা যেতে পারে। রাগ মিষ্টির ওপর, মিষ্টির মায়ের ওপর, এমন কি কলকাতায় কারা সব ঘোড়ার ডিমের আত্মীয় আছে ওদের, তাদের ওপরেও। এক মাসের ওপর হয়ে গেল ছেলেমেয়ে নিয়ে মিষ্টির মা কলকাতায় গেছে কোন্ আত্মীয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে। মহারাণীর এখনো ফেরার নাম নেই। আসলে ছেলেমেয়ের অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেছে, পরীক্ষার ফল বেরুলেও নতুন ক্লাস এখনো শুরু হয় নি, তাই ফেরার তাড়াও কম। কিন্তু বনমায়াকে নিয়ে এ-দিকে এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল আবার, মিষ্টি জানতেও পারল না।

এই একটা বছরে বাপীর বুদ্ধিশুদ্ধি আরো পেকেছে। ওর জন্যেই জঙ্গলে বেড়ানোর নামে মিষ্টির এখন জিভে জল গড়ায়। আগের থেকে ওর সাহসও অনেক বেড়েছে। ছুটির দিনের দুপুরে ও-ই বরং বাপীর অপেক্ষায় ঘর বার করে এখন। খরগোস কাঠবেড়ালি বা বন-মোরগ তাড়া করার ঝোঁকে বাপী যে এক-একদিন ওকে নিয়ে কতটা দূরে চলে যায় মিষ্টি ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারে না। আবু সঙ্গে থাকলে তো কথাই নেই। মিষ্টি তখন নিজের খুশিতেই

একটু দূরে পা বাড়াতে চায়। বাপীর বোল-চালের ফলে হোক বা আবুর হাব-ভাব দেখেই হোক, মিষ্টির এখন বিশ্বাস বাঘ-ভালুক সামনে পড়ে গেলেও আবু ওদের কলজে ফুটো করে দেবে। আবু নিজেই বলে, তোমাদের যেমন দেবতা আছে, জঙ্গলের তেমনি অপ-দেবতা আছে। আমি হলাম গিয়ে সেই অপ-দেবতা, আমি সঙ্গে থাকলে তোমার কোনো ভয় নেই খুকুমণি।

কিন্তু বাপীর নিজের দোষেই মিষ্টি একটা জিনিস ইদানীং বুঝে ফেলেছে। ফাঁক পেলেই ওর এই সুন্দর শরীরটার ওপর ও হামলা করে। চালাকি করে গায়ে পিঠে হাত দেয়, মিথ্যে ভয় দেখিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে। নিজে এখন অনায়াসে উঠতে পারলেও বুকের সঙ্গে সাপটে ধরে গাছের ডালে বসায় নয়তো ডাল থেকে নামায়। একদিন তো ডাল থেকে নামার সময় ইচ্ছে করেই ওকে নিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেল। এমনি করল যেন টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেছে। মিষ্টির অবশ্য লাগে নি, লেগে থাকে তো ওরই একটু-আধটু লেগেছে। কারণ মিষ্টি ওপরে আর ও নীচে। কিছু বুঝুক না বুঝুক, মিষ্টির এরকম হামলা করতে দিতে আপত্তি। আগেও বলেছে—দাদা মারলে মা দাদাকেই বকে, মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে হয় না, বুঝলে? আর তুমি কেবল আমাকে পেলেই ধরে টানাটানি করো। এরকম করলে মাকে আমি বলে দেব।

বাপীর রাগ যেমন ভয়ও তেমনি। হেসেই ওকে ভোলাতে চেষ্টা করেছে, তুই যেমন বোকা, মেয়েদের মারতে নেই বলে গায়ে হাত তুলতে নেই—আমি কি তোকে মারার জন্যে গায়ে হাত দিই?

—তবে কেন দাও?

বাপী ভয়ে ভয়ে খুব মোলায়েম করে বলেছে, আমার ভালো লাগে।

—আমার বিচ্ছিরি লাগে। তুমি ও-রকম করলে আমি আর আসবই না।

বাপী কথা দিয়েছিল ও-রকম আর করবে না। কিন্তু তার পরের ছুটির দিনেই ইচ্ছে করে গাছের ডাল থেকে নামানোর সময় ওকে নিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছে। মিষ্টি আর কিছু না বুঝুক, এটুকু বুঝেছে ওর শরীরের ওপর হামলা করতে ওই পাজী খুব মজা পায়।

এরপর কলকাতায় যাবার আগে মাত্র দুটো ছুটির দিনে জঙ্গলে এসেছিল। দুদিনই মিষ্টি বেঁকে বসেছিল, আসবে না। দাদার বন্ধু দাদাকে বলেছে, চা-বাগানের এক দুষ্টু লোক একটা মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছিল, সেই জন্য রেগে গিয়ে অন্য লোকেরা ওই লোকটাকে মেরেছে। মিষ্টির মা বলেছে, বেশ করেছে মেরেছে, ও-রকম অসভ্য লোককে মারাই উচিত।—জঙ্গলে গেলে তুমিও

অসভ্যের মতো করো, তোমার সঙ্গে যাব না!

নিরুপায় বাপী তখন নিজের কান মলেছে। বলেছে, ও-রকম করাটা যে অসভ্যতা ও ঠিক জানত না—আর কক্ষনো ও-রকম করবে না।

এরপর মিষ্টি এসেছে। বাপী ওর হাত ধরেছে তাতে খুব আপত্তি হয় নি। হাত ধরাটা তো আর গায়ে হাত দেওয়া নয়। পরের বারেও মিষ্টি আগে থাকতে গায়ে হাত না দেবার কড়ার করে তবে জঙ্গলে ঢুকেছে। বাপীর তাতেই প্রচণ্ড রাগ হয়েছে, হাত দুটো আরো বেশি নিশপিশ করেছে। আর অতটা বাড়াবাড়ি করে ফেলার জন্য মনে মনে নিজেকেই গালাগাল করেছে।

রাগ বাপীর ওই বড়সাহেবের বাংলোর সকলের ওপরেই। মিষ্টির বাবা-মা, দীপুদা সকলের ওপর। ও-বাড়িতে ঢুকতে হলে আবুর সঙ্গে খরগোস বা বন-মোরগ নিয়ে, আম জাম-জামরুল-পেয়ারা খেজুর নিয়ে, ঝুড়ি ভরতি শাল-পলাশ নিয়ে, বা চাক-ভাঙা মধু নিয়ে যেতে হয়। আবুর আশা মেমসাহেবের নেক-নজরে পড়লে সে বীট-ম্যান হবে। আর বাপীর আশা, মেমসাহেব বা দীপুদার কাছে ওর একটু আদর হবে, যার ফলে যখন-তখন এই বাংলোয় আসাটাও সহজ হবে। কিন্তু একটা বছরে এটুকু ভালোই বুঝে নিয়েছে, আদরের আশা দূরে থাক, এই বাংলোর মানুষেরা ওদের মানুষই ভাবে না। জিনিস-টিনিস পেলে এমন ভাব দেখায় যেন এসব তাদের পাওনা। এমনিতে মিষ্টির সঙ্গে একটু গল্প করার লোভে বাংলোয় পা দিলেই মেমসাহেবের দুই ভুরুর মধ্যে বিরক্তির ভাঁজ পড়ে। সকালে জিনিস দেবার পর বিকেলে এলেও এমনিই অখুশি মুখ দেখে মেমসাহেবের। আর একদিন আবুর সঙ্গে এক ভাঁড় চাক-ভাঙা মধু নিয়ে এসে মেমসাহেবের মুখে হাসি দেখে সাহসে ভর করে তার সামনেই মিষ্টিকে ডেকে বলেছিল, মিষ্টি, একটা কথা শুনে যা—

সঙ্গে সঙ্গে মেমসাহেবের ফোঁস-মূর্তি।—এই ছেলে, অসভ্যের মতো তুই-তুকারি করিস কেন? ফের শুনি তো কান ছিঁড়ে দেব—

অপমানে বাপীর মুখ কালি একেবারে। বাইরে এসে আবু আবার তার ওপর হেসে হেসে নুন ছড়িয়েছে।—কি রে, ওই মেয়ের সঙ্গে আর প্রেম করবি না কি এরপর ওর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে পেন্নাম ঠুকবি?

রাগের চোটে বাপী জ্বলে উঠেছিল, ওই মিষ্টিকে একদিন আমি একেবারে গিলে খাব দেখে নিও।

পিঠ চাপড়ে দিয়ে আবু বলেছিল, এই তো মরদের মতো কথা।

মেমসাহেব তো তবু মুখে বলেছে কান ছিঁড়ে দেবে। দীপুদা যখন-তখন

কান টেনেই ধরে, আর মাথায় খট-খট করে গাঁট্টা বসিয়ে দেয়। সব ছুটির দিনেই একলা মিষ্টিকে নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার সুযোগ হয় না। কোনো কোনো ছুটির দিনে ওদের বাংলোয় অতিথি আসে, কোনদিন বা দীপুদা এমনিই বেরোয় না। তখন একলা মিষ্টিকে নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার আশায় ছাই। বাপী তখন ছুটে গিয়ে আবুকে ধরে নিয়ে আসে। আবুকে দেখলে দীপুদার জঙ্গলে বেড়াতে আপত্তি নেই। বাড়িতে লোকজন দেখে বেরুবার আশায় এই লোভটা মিষ্টিই একদিন দাদাকে দেখিয়েছিল, আর বাপীকে বলেছিল আবুকে ডেকে আনতে। তারপর থেকে ঘরে থাকলে আবুও জঙ্গলে ঘোরার রস কিছু পেয়েছে। এক-একদিন নিজেই ওকে ডেকে বলে দেয়, আবুকে ডেকে নিয়ে আসিস—

এক জায়গায় বেশি দিন থাকলে ভয়-ডর আপনা থেকেই কমে আসে। মিষ্টি এখন সামনের রাস্তা পেরিয়ে একলা জঙ্গলে নামলে আর খুব কাছাকাছির মধ্যে ঘোরাঘুরি করলেও ওর মা বকা-ঝকা করে না। কেবল বলে দেয়, খবরদার দূরে যাবি না, এখান থেকে ডাকলে যেন শুনতে পাস—

ছেলে আর আবু সঙ্গে থাকলে কিছুই বলে না। তার ধারণা কাছাকাছির মধ্যেই থাকে ওরা। সে-সময় দীপুদার মাতব্বরি আর শাসন দেখে বাপীর গা জ্বলে যায়। জঙ্গলটা যেন ওদের সম্পত্তি। ইচ্ছে মতো বাপী এদিক ওদিক ছুট লাগালে চোখ পাকাবে। পশু-পাখি টিপ করে পাথর ছুঁড়লেও এক-এক সময় আচমকা গাঁট্টা। কি, না আমি মারতে যাচ্ছিলাম, তুই আগে মেরে বসলি কেন? ওর সঙ্গে ছুটতে গিয়ে মিষ্টি হোঁচট খেয়ে ব্যথা পেল কি পেল না, দীপুদার চড়-চাপড়টা এসে পড়ল ওর ওপর। বাপীর সব থেকে বেশি অপমান হয় এসব যখন আবু দেখে আর তেরছা চোখে ওর দিকে তাকায়। যেন বলতে চায়, ভালবাসার আর কত দাম দিবি, এরপর কি জুতোপেটা শুরু হলে আক্কেল হবে?

সেই এক বছর আগে মিষ্টিকে ভালবাসতে ইচ্ছে করার কথাটা বোকার মতো আবুকে যদি না বলে ফেলত, তাহলে এতটা খারাপ লাগত না। মিষ্টির মা বা দীপুদা শাসন করলেও আবু এভাবে তাকিয়ে মজা পেত না, বা ঠাট্টা-ঠিসারা করত না। ওই বাংলোর মহারাণী আর তার ছেলের ওপর কত যে রাগ বাপীর সে শুধু ওই জানে। রাগ বড়সাহেবের ওপরেও। বাপীর বাবার থেকে এত ওপরের একজন না হলে ওকে এত হেলা-ফেলা কেউ করত না। আর রাগ সময় সময় তাদের আদুরে মেয়ের ওপরেও। ওই মিষ্টির থেকে, বনমায়া ঢের ভাল। পায়ে শেকল বাঁধো আর যা-ই করো, ভালবাসার পুরুষ

হাতি এলে সব ভয়-ডর বিসর্জন দিয়ে ও তার সঙ্গে চলে যাবেই। মিষ্টি যদি বনমায়ার মতো হত।

বনমায়াকে নিয়ে আবুর সঙ্গে অনেক রসের কথা হয়েছে বাপীর। সে-সব কথা মিষ্টিটাকে বলাও যাবে না। এক বছরেই বাপী ভিতরে ভিতরে যেমন ধা-ধা করে বড় হয়ে গেছে, ও তো আর অতটা হয় নি। আর আবুর তো কথাই নেই, আঠেরো বছর পার—জঙ্গলের যাকে বলে বুক-চিতানো মরদ একখানা। ওকে দেখলেও বাপীর চোখ জুড়োয়।

কিন্তু মিষ্টিরা নতুন বছরের ছুটির মধ্যে এখানে না থাকাতে জন্ম থেকে দেখা এই বানারজুলির জঙ্গলটাকেই আরো চেনা আরো জানার সুযোগ হয়েছে বাপীর। অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ, ছুটির আগে রেজাল্টও বেরিয়ে গেছে। নতুন ক্লাসের বইপত্রই কেনা হয় নি এখন পর্যন্ত—বই নিয়ে বসার তাড়াই বা দেয় কে? তার ওপর স্কুল ছুটি।

সকাল দুপুর বাপীর আবুর সঙ্গেই কাটছে। আঠেরো পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবুর বীটম্যান হওয়ার দাবী। এতদিন স্কুল ছাড়া সার্টিফিকেটে ওর বয়েসটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চাকরির জন্য আবু এখন কোমর বেঁধে তৈরি। ওর বাবা কালুকে নিয়ে বাপীর বাবার সঙ্গে দেখা করে দরখাস্ত পেশ করেছে। বাবা দরখাস্ত রেখেছে, আশাও দিয়েছে। চাকরি দেওয়া না দেওয়ার মালিক বড় সাহেব—মিষ্টির বাবা। সেটা সকলেই জানে। কিন্তু তার কাছে সুপারিশ তো কাউকে করতে হবে। বাপীর বাবা সেই সুপারিশের আশ্বাস দিয়েছে।

আবুকে মুখে কিছু না বললেও এখানেই বাপীর যা একটু সংশয়। বড় সাহেবকে দশ গজের মধ্যে দেখলেই বাবার চোখ-মুখের যা অবস্থা হয় তার দ্বারা ধরা-করার ব্যাপারটা কতদূর হবে কে জানে। তবে আবুকে অন্য দিক থেকে একটু আশার কথা শোনাতে পেরেছে বাপী। বাবা ওর দরখাস্ত বড়সাহেবকে দিলেই ও মিষ্টিকে ধরবে। মিষ্টি বাপের আদুরে মেয়ে, তার ওপর আবুকে ওরও ভারী পছন্দ। তাছাড়া এটা ওটা ভেট দিয়ে দিয়ে আবু মেমসাহেবকেও খুশি রেখেছে। আবুর চাকরি তাহলে হবে না কেন?

কিন্তু আবু কোনো চিন্তা-ভাবনার ধার ধারে না। নিজের কাছে ও পাকাপোক্ত বীটম্যান একজন হয়েই বসেছে। বাপ অর্থাৎ হেড বীটম্যান কালুর চার ভাগের তিন ভাগ কাজ ও-ই করছে এখন। বীটম্যানদের প্রথম কাজ জঙ্গল টহল দেওয়া। বাপী তার সেই টহলের দোসর এখন।

জঙ্গলের মধ্যেই মাটির ঘরে থাকে ওরা। সব বীটম্যানরাই তাই।

অনেকটা দূরে দূরে ওদের ঘর। ভাড়া গুনতে হয় না, এমনিতেই থাকতে পায়।

সকালে মুখে কিছু গুঁজেই বাপী ছোটে আবুর ওখানে। দেরি হলে আবু একলাই বেরিয়ে পড়বে। কারণ কালু তো এখন আর সকালের মুখ দেখে না। পড়ে পড়ে ঘুমোয় বা ঝিমোয়। বাপীর ধারণা ছেলে অনেক কাজ বুঝে নেবার পর থেকে ওর নেশার মাত্রা বেড়েছে। আবু নিজে থেকে কিছু বলে না বলে বাপীও মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করে না।

টহল দেবার সময় বীটম্যানদের হাতে পাকানো বাঁশের লাঠি থাকে। কিন্তু আবু নিজের পিয়ারের সেই লোহার খাপ আঁটা ইস্পাতের ফাল বসানো লাঠিটা সঙ্গে নেয়। বাপীর হাতেও থাকে তার নিজের ছোট লাঠি। শাল শিশু অর্জুন জারুল দেবদারু ইউক্যালিপটাস গাছগুলোয় ঘা মারতে মারতে এগোয় তারা। ফুর্তি করার জন্য ঘা মারা নয়। কোনো গাছে পোকা ধরল কিনা ঘা মারার শব্দ থেকে সেটা বোঝা যায়। বাপী বুঝতে পারে না. কিন্তু আবু ঠিক বুঝতে পারে। গাছের শত্রু উই, গান্ধীপোকা, গঙ্গাফড়িং, পঙ্গপাল। কোন্ শত্রু নিকেশের জন্য কি ওষুধ দরকার আবু তাও জেনে ফেলেছে। কোনো গাছে পোকা ধরলে বা শত্রুর সন্ধান পেলে বীটম্যানের কাজ ওপরঅলার কাছে রিপোর্ট করা।

ফাঁকি না দিলে বীটম্যানের আরো অনেক কাজ। চারাগাছের বেড নিয়ম করে পরীক্ষা করা একটা বড় দায়িত্ব। জলের নালা দিয়ে ঠিক মতো জল আসছে কিনা, বেশি জল আসছে কিনা, ওর কাছাকাছি সজারু গর্ত খুঁড়ল কিনা, এইসব। বুনো শূয়োরও কত সময় চারাগাছ মুড়িয়ে দিয়ে যায়। সেরকম সম্ভাবনা দেখলে লোকজন ডেকে লাঠি আর টিন কানেস্তারা নিয়ে আশপাশের বড় গাছের ডালে বসে পাহারা দিতে হয়। পাহারা মানে টিন-কানেস্তারা পিটে জানোয়ারদের ভয় দেখানো।

কিন্তু আবুর সেরকম পাহারাদার হতে ইচ্ছে করে না। বীটম্যান হলেই ও একটা বন্দুক পেতে চেষ্টা করবে। ওর বাপের যদি সেরকম হিম্মত থাকত তাহলে ঠিক একটা বন্দুক আদায় করতে পারত। কিন্তু রাত হলেই তো নেশায় পেয়ে বসে বাপটাকে। তার হাতে বন্দুক দেবে কে? না, বাপের ওপর খুব একটা শ্রদ্ধাভক্তি নেই আবুর। বাপীর বাবা মানে কেরানীবাবু নেহাত ভালোমানুষ বলে ওর বাপের দোষত্রুটি ধামাচাপা দিয়ে রাখে—এ কথা আবু নিজের মুখে ওকে বলেছে।

জঙ্গলের মধ্যেই একটা ভাটিখানা আছে বাপী এতদিন সেটা জানত না। একদিনের অভিজ্ঞতায় তাও জানা হয়ে গেল। বেশ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই যাচ্ছিল দুজনে, হঠাৎ কোত্থেকে একটা বড়সড় হরিণ ঝড়ের মতো ওদের পাশ দিয়ে ছুটতে লাগল। ওটার গায়ে একটা তীর বেঁধা। ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে।

ব্যাপার ভালো করে বোঝার আগেই বাপী দেখে আবুর দুচোখ ঝলসে উঠেছে, চোয়াল কঠিন। হ্যাঁচকা টানে বাপীকে টেনে নিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল। কিন্তু তীর ধনুক হাতে উল্টোদিকের ছুটন্ত লোক দুটো দেখেই ফেলল ওদের। থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

আবু তারস্বরে একটা বিকট চিৎকার করে লোক দুটোকে তাড়া করল। জঙ্গল-চোর বা অন্য কোনো বিপদআপদ দেখলে বীটম্যান অন্য বীটম্যানদের বা ফরেস্ট গার্ডদের এমনি চিৎকার করে জানান দেয়।

লোকদুটো চোখের পলকে উধাও। আরো কয়েকবার চিৎকার করেও আবু অন্য কোনো বীটম্যানের সাড়া পেল না। ওর যতো উত্তেজনা ততো রাগ। মাল বা পলিয়া জঙ্গল-চোরদের এই কাজ। ফাঁক পেলে তীর ধনুক দিয়ে তারা হরিণ মারে, রাতে কাটা গাছের কাঠ সরায়।...হরিণটা নিশ্চয় কোথায় মরে পড়ে থাকবে। তখন প্রথম দোষটা পড়বে ওর বাবার ঘাড়ে। এ-এলাকায় তার নিজের টহল দেবার কথা, অন্য লোকও মোতায়েন রাখার কথা। আর এ-দিকের ফরেস্ট গার্ডের কাছেও জবাবদিহি করতে হবে।

আবু তার বাবার খোঁজে ছুটল। পিছনে বাপী। কিন্তু কালু ঘরে নেই। দাঁত কড়মড় করতে করতে হনহন করে আবু আবার জঙ্গলের আর এক দিকে চলল।

গাছ-গাছড়ার আড়ালে একটা মাটির ঘর। সেখানে আসতেই একটা বিচ্ছিরি গন্ধ নাকে এলো বাপীর। সামনেই পেল্লায় কড়ার মধ্যে ফুটছে কি। উৎকট গন্ধটা সেদিক থেকে আসছে। এদিকটায় মাটির ওপরেই বসে আছে আবুর বাবা কালু, তার সঙ্গে আরো তিন-চারজন। সকলের হাতেই মাটির ভাঁড়।

আবু ঝাঁঝালো গলায় খবরটা কালুকে দিল। কালু বসে বসে দুলছিল। ঘোলাটে চোখ। জঙ্গল-চোরের উদ্দেশ্যে একটা বিচ্ছিরি গাল দিয়ে উঠল সে। তার সঙ্গীরা আরো কিছু গালাগাল যোগ করল। কালু ছেলেকে হুকুম করল, চোর দুটোকে গাছের সঙ্গে কষে বেঁধে রাখ্—আমরা যাচ্ছি। আর বলল,

খুঁজেপেতে মরা হরিণটাকে ঘরে নিয়ে যেতে—রাতে ভোজ হবে।

বাপীর হাত ধরে টেনে আবু রাগে গজগজ করতে করতে ফিরল আবার। অভিসম্পাতও করল, দিনের বেলায়ই বেহেড মাতাল হয়ে আছে—মরুক—ধরা পড়ে মরুক সব!

বাপী সেই প্রথম জানল ওটা ভাটিখানা। চুরি করে মদ চোলাই হয় ওখানে। সকলেই জানে, পাহারাদাররাও জানে। কিন্তু ভাবখানা দেখায় যেন কেউ কিচ্ছু জানে না।

বাপী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, হরিণ মারার ব্যাপারটা ধরা পড়লে তোমার বাবার শাস্তি হবে?

আবু ঝাঁঝালো জবাব দিল, হওয়া তো উচিত। কিন্তু শাস্তি দেয় কে—এখানে ছোট থেকে বড় সব শালা চোর!

বাপী ঘাবড়েই গেল।—আমার বাবাও?

—না, তোর বাবার অত সাহস নেই—তা বলে তোর বাবার বাপ-খুড়োরা কেউ কম যায় না—বুঝলি?

বাপীকে হাঁ করে থাকতে দেখে রাগের মুখেও আবু হেসে ফেলেছিল। তারপর চুরির ব্যাপারটার ব্যাখ্যাও করেছিল। বাপীর বাবার বাপ খুড়ো বলতে জঙ্গলের বড় মাঝারি ছোট সাহেবরা। এবারের বড়সাহেব অর্থাৎ মিষ্টির বাবা আসার পর থেকে জঙ্গলের চুরি নাকি আগের থেকেও বেড়ে গেছে। কণ্ট্রাকটারদের গাছ ইজারা দেওয়ার সময় মোটা ঘুষের টাকা ওই সাহেব-সুবোদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। অনেক শিশুগাছে ইচ্ছে করেই চিহ্ন দেওয়া হয় না। চিহ্ন না থাকা মানেই সরকারী হিসেবে সে গাছ নেই। শিশুগাছ খুব দামী। ভালো কাঠ আর তক্তা হয়। টাকা খেয়ে বড়সাহেব মেজ সাহেবরা সেই সব মার্কা ছাড়া গাছ কাটতে দিলে কে আর ধরবে? কার বুকের পাটা আছে যে বলে দেবে? তাছাড়া ঘুষ দিয়ে বেআইনী শিকারও কম হচ্ছে নাকি এখন এখানে?

মিষ্টির বাবা পর্যন্ত এরকম খারাপ কাজের মধ্যে আছে শুনে বাপীর মুখে কথা সরে না। কিন্তু কাউকে বলার জো নেই, এমন কি পিসীকেও না। আবু সাবধান করে দিয়েছে, খবদ্দার কাউকে বলবি না—তোর বাবার কানে গেলে উল্টে তোকেই ধরে পিটবে। আর বড়সাহেব মেজসাহেবদের কানে গেলে তো তোর আমার বাবারই চাকরি নট।

মুখে না বলতে পারুক, এত সব জানার ফলে বাপীর ভিতরে ভিতরে রাগ

খুব। জঙ্গলটা একটু আদর-যত্ন আর দেখা-শুনার আশায় মানুষের মুখ চেয়ে আছে, আর মানুষই কিনা সব থেকে বেশি হামলা করছে তার ওপর।

বড়সাহেবের বাংলোয় ওই আদুরে মেয়ের দেখা পাওয়া গেল স্কুল খোলার ঠিক আগের দিনটিতে। এসেছে বাপী তাই জানত না। তবে রোজই একবার করে এদিকটায় টহল দিয়ে যায়।

সকালে মিষ্টিকে বারান্দায় দেখেই আনন্দে বুকের ভিতরটা দাপাদাপি করে উঠল। কিন্তু ডাকবে কি, বড়সাহেব এই বারান্দায় বসেই কাগজ পড়ছে।

ডাকতে হল না, মিষ্টি নিজেই দেখল ওকে। ঘাড় বেঁকিয়ে বাপকে একবার দেখে নিয়ে ও গেটের কাছে চলে এলো।

বাপী গেট-এর ওধারে।

—জানো, আমি ফার্স্ট হয়েছি—বাবা বলল। দাদাও পাশ করেছে—

ফার্স্ট বা পাশের ধার ধারে না বাপী, ওকে দেখেই খুশিতে টইটম্বুর।—কবে ফিরলি?

—কাল বিকেলে। ছুটির মধ্যে তুমি আর আবু খুব জঙ্গল চষলে তো?

—খুব। বাপী কথা বলবে কি প্রায় দেড় মাস বাদে মিষ্টিকে দেখে চোখে পলক পড়ে না। মিষ্টির বয়েস এখন মাত্র নয়, কিন্তু এই দেড়টা মাসের মধ্যে ও যেন দিব্বি বড়সড় হয়ে উঠেছে। মাথায় বেড়েছে, মুখ আরো ফর্সা হয়েছে। বলল, এদিকে কত কি কাণ্ড হয়ে গেল তুই জানিসও না—দুপুরে জঙ্গলে আসবি তো? সব বলব—

—মিষ্টি!

পিছনের বারান্দা থেকে ধমকের সুরে মায়ের আচমকা ডাক। তার হাতের কাচের গেলাসে দুধ। অপ্রসন্ন চাউনি।

জবাব দেওয়া হল না। মিষ্টি ঘুরে আবার বারান্দার দিকে ছুট। বাপীরও আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস নেই। মহারাণীর মুণ্ডুপাত করতে করতে বাড়ির দিকে চলল। ফিরে আসা হয়েছে জানলে বাপী ঠিক হাতে করে কিছু না কিছু নিয়ে আসত। শুধু কর্তা কেন, ঘুষ ছাড়া গিন্নীরও খুশি মুখ দেখা যায় না। এখন কতক্ষণে দুপুর হবে আর কতক্ষণে একলা পাবে মিষ্টিকে ঠিক নেই।

ঠিক সময়েই দুপুর হল। মিষ্টিকেও একলাই পেল। কিন্তু এতদিন বাদে জঙ্গলে বেড়ানোর সুযোগ পেয়েও মেয়েটার হাব-ভাব অন্য রকম। গেট পর্যন্ত

ছুটে চলে আসারও তাড়া নেই। নেহাত গেট-এর কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে বলেই আসা।

বাপীর সবুর সয় না। আবার ওর মুখ দেখে শংকাও একটু। গলা চেপে জিজ্ঞাসা করল, তোর মা ঘুমোয়নি ?

—ঘুমিয়ে কাদা। আর বাবাও বাড়ি নেই।

—তাহলে কি হল, জঙ্গলে যাবি না ?

মিষ্টি একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল ওকে। এরকম করে দেখাটাও নতুন ঠেকছে বাপীর।

—আবু কোথায় ?

—আবুকে দিয়ে কি হবে ? সে জঙ্গলে ঘুরছে কি বাড়িতে ঘুমুচ্ছে কে জানে।

কড়ার করে নেওয়ার সুরে এবারে মিষ্টি বলল, জঙ্গলে ঢুকে তুমি আমার গায়ে হাত দেবে না ?

এতদিন বাদে এসেও সেই পুরনো কথাই আগে বলবে বাপী ভাবেনি। বলার ফলে রাগের সঙ্গে ওই লোভটাই ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে লাগল।—তোর কি ননীর শরীর নাকি যে হাত দিলে গলে যাবি ? হাত দেব না সে তো সেই কবেই বলেই রেখেছি !

গেট খুলে আর বন্ধ করে মিষ্টি বেরিয়ে এলো। কত দিনের মধ্যে জঙ্গলে পা দেয়নি। বেরুনোর তাগিদ তারও কম নয়। জঙ্গলে ঢুকে বাপী ওর হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠে হাত ছাড়িয়ে নিল।

—ফের ?

বাপী থতমত খেল একদফা। দেড় মাসের মধ্যে কতটা বড় হয়ে গেছে ঠাওর করে উঠতে পারল না।—হাত ধরতেও দিবি না ?

—না। কলকাতার সোনাদি বলেছে তুমি একটা অসভ্য ছেলে, তোমার সঙ্গে একলা জঙ্গলে আসতেই বারণ করেছিল। বলেছিল, তোমার মতলব খারাপ।

বাপী হতভম্ব।—সোনাদি কে ?

—আমার এক দূর-সম্পর্কের মাসির মেয়ে। তারও এখন তোমার মতো তেরো বছর বয়েস।

—সে আমার কথা জানল কি করে ?

—সোনাদির কাছে তোমার সঙ্গে চুপিচুপি জঙ্গলে বেড়ানোর গল্প করেছি

না? আমাকে একলা পেলে তুমি কত রকমের দুষ্টুমি করো তাও বলেছি। তাই শুনেই তো সোনাদি আমাকে সাবধান করে দিল—আমি কি অত বুঝতাম?

বাপীর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। আবার ভয়ও কম নয়।—আর তোর সোনাদি তোর মাকেও বলে দিল?

ঠোঁট উল্টে মিষ্টি জবাব দিল, হুঁঃ, সোনাদি অত বোকা কিনা। ওদের বাড়ির পাশের এক বজ্জাত ছেলে, এক সন্ধ্যায় চুপি চুপি ছাদে উঠে গিয়ে সোনাদিকেই পিছন থেকে জাপটে ধরেছিল—সোনাদি সেকথাই তার মাকে আজ পর্যন্ত বলেনি—তারপর সেই পাজী ছেলে চুমু খেতে চেয়ে সোনাদিকে চিঠি পর্যন্ত লিখেছে—সোনাদি তাও মাসিকে বলেনি, বুঝলে?

বাপীর ভয় ডর উবে গেল। এ কথা শোনার পর একটা অজানা ইচ্ছে মুখের দিকে এগিয়ে আসছে, আর হাত দুটো আগের থেকে আরো বেশি নিশপিশ করছে। বলল, তোর সোনাদির খুব বুদ্ধি, তোর যদি সে-রকম বুদ্ধি থাকত!

সঙ্গে সঙ্গে বনমায়ার গল্পে চলে এলো সে। আগের বার বনমায়ার পালানো আর ফিরে আসার গল্প ঢের আগেই মিষ্টিকে বলেছিল। এবারেও বনমায়া কি কাণ্ড করে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তার ভালবাসার পুরুষ হাতির সঙ্গে চলে গেছল, একমাস ধরে ফুর্তিটুর্তি করে কবে আবার ফিরেছে—ওকে দেখে ভীম বাহাদুর ক্ষেপে গিয়ে কি করেছিল, আর আবু কি বলেছিল—এই সব।

এই গল্প শোনানোর ফাঁকে বাপী তখন ওর একটা হাত নিজের হাতের দখলে নিয়ে নিয়েছে, মিষ্টির খেয়ালও নেই। ও-দিকে মিষ্টিও এবারে সোৎসাহে কলকাতায় টারজানের ছবি দেখে আসার গল্প বলল। জঙ্গলের রাজা টারজান। টারজানের মতো বীর আর কাউকে হতে হয় না—গাছের ঝুরি ধরে অনেক দূরের গাছে দোল খেয়ে চলে যায়, পাহাড় থেকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে, তার সেই ভীষণ ডাক শুনলে হাতি-বন্ধু আর শিম্পাঞ্জী চলে আসে, লড়াই করে বাঘ সিংহ কুমির মেরে ফেলে। মনে করতেও গায়ে কাঁটা মিষ্টির।

ভাগ্য বটে মিষ্টিটার। কলকাতায় গিয়ে এমন ছবিও দেখে এলো। শুনেই বাপীর রক্ত নাচছে, আর টারজান হবার সাধ যাচ্ছে। হঠাৎ কি ভেবে জিজ্ঞাসা করল, জঙ্গলে টারজানের সঙ্গে কোনো মেয়ে ছিল না?

—ছিল না কি গো! টুকটুকে মেমসাহেব মেয়ে! তারও পরনে

টারজানের মতো এইটুকু চামড়ার মতো কি—আর বুক শুধু একটু ঢাকা—তাতেও কি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

বাপীর নিঃশ্বাস বন্ধ।—টারজান সেই মেয়ের গায়ে হাত-টাত দিত না?

মিষ্টির খিলখিল হাসি। দিত না আবার—দুজনে জড়াজড়ি করে গাছের শিকড় ধরে দোল খেত, টারজান মাটিতে শুয়ে থাকলে মেয়েটা তার বুকের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ত—

আনন্দে বাপী মিষ্টির দু কাঁধ ধরে বড়সড় দুটো ঝাঁকুনি দিল।—তবে? তোর সোনাদি জঙ্গলের খেলা কিচ্ছু জানে না—বুঝলি? জঙ্গলের সব অন্য রকম।

টারজানের ছবি চোখে লেগে থাকায় মিষ্টি খুব যেন সেটা অস্বীকার করে উঠতে পারল না।

নতুন বছরের শুরু থেকেই বাপীর পড়াশুনা শিকেয় উঠেছিল। সেবারের হাফইয়ারলি পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে ভালোমানুষ হরিবাবুরও মেজাজ গরম। ভালো নম্বর কিছুতে নেই, তার মধ্যে দু'পেপারে ফেল! পড়াশুনার জন্য সেই প্রথম ছেলের গায়ে হাত তুলতে গেছলেন তিনি। এক স্কুলে যাওয়া-আসা ছাড়া ঘরের বাইরে পা দিলে আস্ত রাখবেন না বলে শাসিয়েছেন।

বাপী কি করবে? দু'বেলাই বইখাতা নিয়ে সময়মতো পড়তে বসে। কিন্তু ওর চোখের সামনে কেবল জঙ্গল আর আবু আর মিষ্টি আর টারজান। পড়ার ফাঁকে তারা কখন যে এসে হাজির হয় বাপী নিজেও জানে না। তাছাড়া পড়তে বসেই দীপুদার ওপর রাগ, আবুর এই ছ'মাসের মধ্যেও চাকরি না হওয়ার জন্য বড়সাহেবের ওপর রাগ। আর সব থেকে বেশি, চাকর-বাকরের মতো ওকে হেলা-ফেলা করার জন্য মিষ্টির মায়ের ওপর রাগের যত সব কাল্পনিক ফয়েসলা মাথায় ভিড় করে আসে।

...এর মধ্যে চালাকি করে একদিন মিষ্টিকে বাড়িতেও আনা গেছল। তারপর আর একদিন মিষ্টি নিজেই এসেছে। পিসী বড়সাহেব-টাহেব পছন্দ করে না। কিন্তু বড়সাহেবের এই মেয়েটাকে পিসীরও ভালো লেগেছিল। দুদিনই আদর করে খেতে দিয়েছে। আর বাপীকে বলেছে, সুন্দরই তো মেয়েটা, আর বেশ বাড়ন্ত গড়ন।

পড়তে বসলে এ-সবও বাপীর মনে পড়ে। বাড়ন্ত গড়নের মেয়ে আরো একটু চটপট বড় হয় না কেন তাও ভাবে।

পরীক্ষার ফল নিয়ে বাবার কাছে বকুনি খাওয়ার দিন-কতকের মধ্যে আবার বিপর্যয় নেমে এলো একটা। অথচ এর উল্টো হবার কথা।

মাত্র চারদিন আগে বড়সাহেবের কাছেও আবুর একটু খাতির কদর হয়েছে। আবুটা ডাকাতই বটে। সাঁঝের আঁধারের আগে গভীর জঙ্গলে ঢুকেছিল। একা। গাছে একটা বন-বিড়াল দেখে পিছন থেকে বড় পাথর ছুঁড়ে ওটাকে পেড়ে ফেলেছিল। বন-বিড়াল এমনিতেই ভীষণ হিংস্র। পাথরের ঘায়ে ভালো মতো জখম হয়েও মাটিতে পড়ে ওটা তেড়ে এসে আবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আবুর লাঠির পেল্লায় ঘায়ে আবার মুখথুবড়ে পড়েছে। তারপর আবু লাঠিপেটা করেই ওটাকে শেষ করেছে।

এই বন-বিড়ালটাই একধার থেকে জঙ্গলের ছাগল ভেড়া আর মুরগি মারছিল। এমন দুঃসাহসের জন্য বড়সাহেব সন্দীপ নন্দী পাঁচ টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। আর চাকরির আশ্বাসও দিয়েছেন।

বাপীর আনন্দ ধরে না। বাবা যতই শাসন করুক, ছুটির দিনে ঘরে বসে থাকা ওর কুষ্ঠিতে নেই। চারদিন পরের রোববারে মিষ্টিকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছিল। আর মনের আনন্দে বেশ দূরেও চলে গেছল। আবুর এত বড় বীরত্বের পর ওদেরও যেন ভয় সাজে না।

গোঁ-ভরে একটা খরগোসের পিছনে ছুটেছিল বাপী। ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে মিষ্টি দাঁড়িয়ে গেছল।

একটু বাদে বিশহাত দূরের শিশুগাছটার দিকে চোখ পড়তে মিষ্টির ছোট্ট শরীরটা একেবারে নিস্পন্দ কাঠ যেন। সব রক্ত যেন ঠাণ্ডা জল হয়ে যাচ্ছে।

গাছের মোটা গুঁড়িটা পাকে-পাকে জড়িয়ে আছে একটা অতিকায় ময়াল সাপ। সমস্ত গায়ে ঝকঝকে কালো-সাদার ছোপ-ছোপ দাগ। তার লম্বা চ্যাপটা মুখটা সামনের দিকে টান হয়ে এগিয়ে আছে। চোখ দুটো মিষ্টির চোখের সঙ্গে আটকে আছে। একটা সোঁ-সোঁ নিঃশ্বাস যেন মিষ্টির গায়ে এসে লাগছে।

নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। সর্ব অঙ্গ অবশ। গলা দিয়ে একটু শব্দও বার করতে পারছে না।

ওকে দুচোখে আটকে নিয়ে সাপটা আস্তে আস্তে গাছের গুঁড়ি থেকে শরীরের প্যাঁচ খুলছে।

তারই মধ্যে ফিরে এসে বাপী এই দৃশ্য দেখে ভেবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল প্রথম। তার পরেই মাথার মধ্যে যা খেলে গেল ও-ই জানে।

বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে মিষ্টিকে এক ধাক্কা। সেই ধাক্কায় চার-পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়ল ও। সঙ্গে সঙ্গে বাপী ওকে টেনে তুলল।—ওঠ্! ছোট্! নইলে আস্ত গিলে ফেলবে।

পাগলের মতোই ছুটেছে দু'জনে। বাংলোয় এসেও মিষ্টির সমস্ত মুখ নীল-বর্ণ। থরো-থরো কাঁপুনি। বাপীর সেই ধাক্কার ফলে হাত-পা কেটে ছড়ে রক্তাক্ত। কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে বাইরের লোক পর্যন্ত ছুটে এসেছে। বড়সাহেব বাংলোতেই ছিলেন।

কি হয়েছে না হয়েছে তাঁর জেরায় পড়ে বাপীকে সবই বলতে হয়েছে। কোথায় কত দূরে ঘটেছে এ-ব্যাপার—তাও। আর মায়ের ধমকে ছুটির দিনে জঙ্গলে বেড়ানোটাও মিষ্টি ফাঁস করে দিয়েছে।

তারপর বাপীরও তার বুদ্ধি আর বীরত্বের পুরস্কার মিলেছে।

বড়সাহেবের থমথমে মুখ। তিনি কিছু বলেননি। মেমসাহেব সকলের চোখের সামনে বাপীর একটা কান ছিঁড়েই নিতে চেয়েছে। তারপর গালাগাল করতে করতে ঘাড় ধরে বাংলো থেকে নামিয়ে দিয়েছে।

সন্ধ্যার পর বাবার সপাসপ গোটাকতক চটির ঘা।

জীবনের সব সাধ-আহ্লাদই বুঝি শেষ বাপীর। নিঝুম রাত। পিসীর দু'হাত তফাতে সবে শুয়ে আছে। ঘুমোতেই চাইছে।···ভাবছে, রাতের ঘুম সকালের মধ্যে আর একেবারে না ভাঙলে কি হয়?

'পাথরে পাঁচ কিল'—রেগে গেলে পিসী বলত কথাটা। বলত, তোকে কিলোলে কি হবে, তার পাঁচগুণ ব্যথা নিজের হাতে ফিরে আসবে। ফাঁক পেলেই অপমানের ব্যথা ও রকম পাঁচগুণ ফিরিয়ে দেবার গোঁ এখন বাপীর। ওকে এরপর বাংলোর গেটের কাছে দেখলেই দীপুদা তেড়ে আসে। মেমসাহেব মহারাণীর সঙ্গে চোখাচোখি হলেই ভ্রূকুটি। যেন বাইরের এই রাস্তাটাও তার খাস দখলের। চাকরির লোভে আবু যখন তখন বাংলোয় যায়, মেমসাহেবকে ভেট দেয়, মিষ্টিকেও এটা সেটা দিয়ে বা জঙ্গলের গল্প বলে তোয়াজ করে। আগের মতো আবুও ওদের অত দোষ ধরে না। উল্টে ওকে উপদেশ দেয়, ভালো করে মন দিয়ে পড়াশুনা কর, মানুষ হ'—নইলে ওদের কেন—কারোই কোনোদিন পাত্তা পাবি নে।

বাপীর সব থেকে বেশি রাগ মিষ্টির ওপর। ও না থাকলে তো সাপের

পেটেই চলে যেত একেবারে। যে যা-ই বলুক, ওর তো কেনা হয়ে থাকা উচিত বাপীর কাছে। তা না, হাব-ভাব এমন, যেন দোষটা বাপীরই।

এর পরেও ছুটির দিনের দুপুরে আর সুযোগ পেলে সকালেও বাংলোর দিকে হানা না দিয়ে পারে না। বকা-ঝকা মার-ধরের পরোয়া করে না। কিন্তু মিষ্টি সহজে কাছেই আসতে চায় না, দূর থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দেয় আসবে না। বাপীর মাথায় তখনই সব থেকে বেশি আগুন জ্বলে। রাগের চোটে ভেংচি কাটে। ডবল রেগে গিয়ে মিষ্টিও জিভ ভেঙায়, তারপর মায়ের কাছে বা দাদার কাছে নালিশ করতে ছোটে। বাপী ওর রাস্তায় বেরুনোর অপেক্ষায় ওঁত পেতে থাকে।' একলা পেলে মিষ্টিকে খেয়ে ফেলার কথা বলে, মিষ্টি খেয়ে জল খাবার কথা বলে, জিভ চকচক করে ওকে শোনায় মিষ্টি খেতে কত আরাম। তার ফলে বাবার কাছে বেদম প্রহার আবার একদিন।

দিন গেলে সব শাসনের কড়াকড়ি আপনা থেকে কমে আসে, সেই হিসেব বাপীরও আছে। ওই মহারাণী কদিন আর মেয়েকে চোখে চোখে আগলে রাখবে? জঙ্গলের স্বাদ একবার পেলে বাতিল করা আর সহজ নয়। বিকেল হলে মহারাণী মেয়ের রাস্তায় আসা ঠেকাতে পারে না। আর ফাঁক পেলে ওই মেয়ে এখনো জঙ্গলে ঢুকে পড়ে—কিন্তু দূরে যায় না, খুব কাছাকাছির মধ্যেই থাকে। বাপীরও সেই সুযোগের অপেক্ষা।

ওকে দেখলেই মিষ্টি চোখ পাকায়, মা তোমার সঙ্গে মিশতে বারণ করেছে, কথা বলতেও বারণ করে দিয়েছে। ফের আমার সঙ্গে দেখলে তোমাকে রক্ষে রাখবে না বলে দিলাম।

বাপীর মাথায় রক্ত ওঠে। আর মিষ্টির মাথাটা আচ্ছা করে কোনো গাছে ঠুকে দিয়ে পালাতে ইচ্ছে করে। অথচ মনের মতো পেয়ারা কুল কামরাঙা আচার-টাচার ঘুষ পেলে মিষ্টি নিজেই স্বীকার করে বাপীর কোনো দোষ নেই—ওর জন্যেই ওকে ময়াল সাপের পেটে ঢুকতে হয় নি। একদিন এ-ও কবুল করেছে যে বাপীর সঙ্গে জঙ্গলে বেড়াতে ওর খু-উ-ব ভালো লাগে, কিন্তু মায়ের ভয়ে পারে না।

ওই মায়ের অবাধ্য হবার মতো এতটুকু সাহস নেই বলেই বাপী আরো রেগে যায়। ওকে বেইমান বলে, ভীতু বলে। বলে, ননীর পুতুল—মায়ের আঁচলের তলায় থাকগে। ধরা পড়ার ভয় না থাকলেও মিষ্টি বারান্দা ছেড়ে গেটের দিকে আসতে না চাইলে কিল চড় দেখায়, জিভ ভেঙায়। আদুরে মেয়েও বিষম রাগে ফোঁস করে উঠবেই। নিজেও যা-তা বলবে, পাল্টা কিল

চড় দেখাবে, জিভ ভেঙাবে—আর তারপর মায়ের কাছে বা দাদার কাছে নালিশও করবে। এমনি নালিশের ফলে ওর মা মহারাণী আবার একদিন ওকে ডেকে কান মলে দিয়েছিল। দীপুদাও বোনের নালিশ শুনলেই গাঁট্টা মারতে ছুটে আসে।

এমনি করেই আবার একটা বছর শেষ। বাপী নতুন ক্লাসে উঠেছে। বরাতজোরে কিনা জানে না, মোটামুটি ভালই পাশ করেছে। ফেল করলে ওর নিজের অন্তত অবাক হবার কিছু ছিল না। কারণ পরীক্ষার আগে পর্যন্তও মনের অর্ধেকটা ওই সাহেববাংলোর দিকে পড়ে থাকত। আর পরীক্ষার পরের ছুটির দিনগুলোতে তো মিষ্টিকে ধরে একেবারে ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে করত। ক্লাস পরীক্ষায় এবারও ফার্স্ট হয়েছে সেই দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না মেয়ের। বাড়ির চাকর বা বাগানের মালির সঙ্গে জঙ্গলে বেড়ারে, তবু ওর সঙ্গে নয়। তিন-চারটে মেয়ে বন্ধু হয়েছে এখন। চা-বাগানের ছোট বা মাঝারি সাহেবদের মেয়ে, সঙ্গে লোক নিয়ে ওর চোখের ওপর দিয়ে হাসতে হাসতে তাদের বাড়ি চলে যায়। ডাকলে মুখের ওপর বলে দেয়, তুমি বজ্জাতি করো, তোমার সঙ্গে মিশব না। কেবল ভালো কিছু লোভের টোপ ফেলতে পারলে একটু আধটু আসে। আর এলেও বাপীরই বেফাঁস রাগের ফলে ঝগড়া বেধে যেতে দশ মিনিটও সময় লাগে না।

এটাই যে জীবনের সব থেকে দুর্বৎসর বাপী জানত না। বছরের মাঝামাঝি সময়ে মন-মেজাজ বরং একটু ভালো হয়েছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরুতে দীপুদা কলকাতায় পড়তে চলে গেছে। বাপী অনেকখানি নিষ্কণ্টক। দাদা না থাকার ফলে ওই মেয়ে এখন অনেকটা একলা হয়ে যাবে। বাপীর আশা, ভুলিয়েভালিয়ে আবার ওকে আগের মতো জঙ্গলে টানা যাবে।

•

…সকলে ধরে নিয়েছিল এ-বছর বনমায়ার চরিত্র ভালো হয়ে গেছে। দেখা গেল তা নয়, এবারে দিনমানে ছাড়া অবস্থাতেই পালিয়েছে। গাছ পাতা খাওয়ানোর জন্য ভীম বাহাদুর ওকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছিল। ছেড়ে দিয়ে ঘণ্টা দু' ঘণ্টার জন্য নিজেও কোথায় গেছল। ফিরে এসে দেখে, বনমায়া উধাও। ডেরাতেও নেই। পরে বাপীকে আবু হেসে হেসে বলেছে, বনমায়া গেলেই দোষ, ওকে জঙ্গলে ছেড়ে ভীম বাহাদুর নিজে কোথা গেছল?

কোথা গেছল শুনে বাপীর রক্তেও দোলা লেগেছে। ভীম বাহাদুর চা-বাগানের আড়াই-পাত্তি তোলা এক কামিন মেয়ের প্রেমে পড়েছে। ওকে বিয়ে

করবে বলে টাকা যোগাড়ের চেষ্টায় আছে। ফাঁক পেলে সেই মেয়ের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করতে যায়।

বরাত ভালো, কর্তাবাবুরা এবারে আর বনমায়ার পালানো নিয়ে ভীম বাহাদুরের ওপর মারমুখী হয়ে ওঠেনি। তারাও বুঝে নিয়েছে, বছরে দেড় বছরে বনমায়া একবার করে পালাবেই আর দিন-কতক গেলে নিজে থেকে ফিরেও আসবে।

কিন্তু উধাও হবার সেই রাতেই বনমায়া তার প্রেমিক হাতিকে নিয়ে বেশ একটা রগড়ের কাণ্ড করে গেছে। আসলে ওরা বানারজুলি জঙ্গলের খুব দূরে কোথাও যায়নি তখন পর্যন্ত। বেশি রাতে দুটোতে মিলে জঙ্গলের সেই গোপন ভাঁটিখানায় এসেছে। সেখানে যে দুটো লোক ভাঁটি আগলায় প্রাণের ভয়ে তারা একটা গাছের মগডালে গিয়ে উঠেছে। বনমায়া আর তার সঙ্গী বুনো হাতি হাঁড়ি-ভরতি দারু চোঁ-চোঁ করে মেরে দিয়েছে। তারপর দুটোতে মিলে সে কি আহ্লাদ আর নাচানাচি। সেই আহ্লাদে আর নাচানাচিতে ভাঁটিখানা ভেঙে গুঁড়িয়েছে, সামনের অনেক ছোট গাছপালা মুড়িয়েছে। আবু আর বাপী ছুটে গিয়ে সেখানকার অবস্থাখানা দেখে এসেছে। বাপের আড়ালে হেসেছে শুধু আবু। নইলে ওর বাবা কালু আর অন্য বীটম্যানদের বনমায়ার ওপর সে কি রাগ!

ভালো মেয়ের মতো এবারে বনমায়া দু সপ্তাহের মধ্যেই ফিরে এসেছে। এবারে আর ভীম বাহাদুর রাগ করবে কোন মুখে? দৃশ্য দেখে বাপীর বেজায় হাসি পাচ্ছিল। বনমায়া তার খুদে চোখ দুটো বেঁকিয়ে ভীম বাহাদুরকে দেখছিল আর থেকে থেকে মাথা নাড়ছিল আর শুঁড় দোলাচ্ছিল। যেন বলছে, এমন কাজ আর কক্ষনো করব না। ভীম বাহাদুরও যেন আড়ি করে অর্থাৎ মুখখানা হাঁড়ি করে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে।

এই সময় আবুর একটা কথায় সামনে যারা ছিল সকলেই হেসে উঠেছে। এমন কি ভীম বাহাদুরও। বনমায়ার বুকের কাছে পেল্লায় দুটো আদরের চড় বসিয়ে আবু বলল, তিন বছর ধরে পালিয়ে গিয়ে রস করে আসছিস—বাচ্চা-কাচ্চা হবার নাম নেই কেন? তোর মরদটাকে ধরে এনে ডাক্তার দেখা—

সকলের সঙ্গে বাপীও হেসেছে বটে, কিন্তু এ-সব কথা শুনলেও ভিতরে ভিতরে কি-রকম হতে থাকে। সকলের অলক্ষ্যে বনমায়ার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। জন্তু জানোয়ারের প্রেম বা ভালবাসাবাসির কিছুই আর

অস্পষ্ট নয় ওর কাছে। বয়েস তো চোদ্দ গড়াতে চলল, তবু মানুষের ব্যাপারটাই যা একটু আবছা এখন পর্যন্ত। আবু অবশ্য বলে, সব এক ব্যাপার। মানুষ ওদের থেকে আরো পাজী জানোয়ার। ভালবাসাবাসির ব্যাপারে বেশির ভাগ জন্তুর সময়ের বাছবিচার আছে, বছরের মধ্যে কোনো একটা সময় ধরে ওরা মেলে। মানুষ সম্বৎসর ভোগের দাস।

এই ভোগটা ভালো করে বোঝার জন্য একটা দুর্বোধ্য তাড়না। ফাঁক পেলে এক-এক সময় চা-বাগানের দিকে চলে যায়। সেখানকার পাতা-তোলা সোমত্ত বয়সের মেয়েগুলোকে চেয়ে চেঁয়ে দেখে বিশেষ করে। এদের মধ্যে কোনটা ভীম বাহাদুরের ভালবাসার মেয়ে জানতে ইচ্ছে করে। ওরা গায়ে জামা-টামা পরে না, খাটো কাপড় একদিকের কাঁধ-বুক পেঁচিয়ে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত নেমে আসে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওদের ঢলঢলে শরীরের বাঁধুনিতে আর উঁচু বুকে কি-রকম মিষ্টি-মিষ্টি ঢেউ খেলে। চোদ্দ বছরে বাপী এখন মাথায়ও ঢ্যাঙা হয়েছে বেশ। ওর সেই হাঁ করে দেখাটাও কম-বয়সী কতগুলো মেয়ে বোধ হয় টের পেয়ে গেছে। ওর দিকে চেয়ে খিলখিল করে হাসে এক এক সময়। কালো মুখে সাদা দাঁতের সারি ঝকঝক করে। একটা ছুটো মেয়ে আবার দুষ্টুমি করে হাত তুলে কাছে ডাকেও। বাপী তক্ষুনি ছুটে পালায়। কিন্তু তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে মাথাটা ঝিমঝিম করে।

আজ আবুর ওই রসিকতার কথাগুলোই বাপীর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। আবু অন্য কাজে চলে না গেলে সঙ্গ নিত। বড়সাহেবের বাংলোর কাছে এসে পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল।

বারান্দায় দু হাত শূন্যে ঝাঁকিয়ে মিষ্টি তার বাবার কাছে কিছু একটা আব্দার করছে। ওর পরনে একটা লাল ডুরেশাড়ি। গায়ে চকচকে নতুন জামা।

বাপীর চোখে পলক পড়ে না। এই বেশে মিষ্টিকে আর কখনো দেখেনি। জামা আর শাড়ির একটা লালচে আভা মিষ্টির চোখে মুখে ঠিকরোচ্ছে। মিষ্টিরও বয়েস দশের মাঝামাঝি এখন। আগের থেকে মাথায় বেড়েছে আর আরো হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে বাপী সেটা আগেই লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু এখন ওকে দেখেই মনে হল ও হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে মস্ত বড় হয়ে গেছে। রূপকথার সেই রাজকন্যাদের মতো হয়েছে।

বাবার পিছনে মিষ্টি ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল, বাপী জোরে একটা হাততালি দেবার লোভ সামলাতে পারল না। মিষ্টি ঘাড় ফেরালো। অন্য দিন হলে

ও হয়তো জিভ ভেঙচে ঘরে সেঁধিয়ে যেত। গত পরশুও তাই করেছে। বাপীকে পাল্টা ভেঙচি কাটার সুযোগ না দিয়ে ঘরে ঢুকে গেছল। কিন্তু আজ এই নতুন সাজটা দেখানোর তাগিদে পায়ে পায়ে বারান্দা থেকে নেমে গেটের দিকে এগুলো। বাপীর অমন ভেবাচেকা খাওয়া চাউনি দেখে ওর ঠোঁটে টিপ-টিপ হাসি।

সব রেষারেষি ভুলে বাপী বলেই ফেলল, কি সুন্দর দেখাচ্ছে রে তোকে—মাইরি বলছি।

মিষ্টিরও একমুখ হাসি।—কলকাতায় দিদিমাকে চিঠি লিখেছিলাম, আমার জন্য সুন্দর দেখে একটা শাড়ি কিনে পাঠাতে—লোকের সঙ্গে কাল শাড়ি জামা দুইই পাঠিয়েছে। বাবাকে আজ আচ্ছা করে ধরেছি জিপে করে বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে, আমি এই শাড়ি পরে যাব—বাবা রাজি হয়ে গেছে।

শুনে সত্যি হিংসে হচ্ছে বাপীর। চাইলেই শাড়ি পায়, বাবার সঙ্গে জিপে করে বেড়াতে পায়। মাথা খুঁড়লেও শাড়ি-পরা মিষ্টির পাশে বসে জিপে করে একটু বেড়ানোর উপায় নেই। সাহেব মেমসাহেব ছেড়ে মিষ্টিকেও এ কথা বললে ও বেয়াদপী ভেবে মুখ মচকাবে। কি, না ওর বাবা কেরানী, কেরানীর ছেলের এত সাহস বরদাস্ত হবার নয়। কেরানীর বোনের হাতের তৈরি আমসত্ত্ব-আচার বা দুধ-কলা-মুড়ি তো বেশ চেটেপুটে খেতে পারিস।

তবু, এই মিষ্টিকেই আজ দারুণ লাগছে বাপীর। তাই ঠেস-ঠিসারায় ওকে রাগাতে চাইল না। উল্টে খুব মোলায়েম করে বলল, আজ দুপুরে এই শাড়িটা পরে চুপিচুপি জঙ্গলে বেড়াতে আসবি? আয় না, একেবারে জঙ্গলের দেবীর মতো দেখতে লাগবে তোকে—

মিষ্টির মন ভিজল, কিন্তু ভরসা পেল না। ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, হুঁ, বাড়িতেই বলে শাড়ি সামলাতে পারি না, এদিক ধরি তো ওদিক খোলে—শাড়ি পরে জঙ্গলে ঢুকে আছাড় খেয়ে মরি আর কি।

—না রে না, আমি তো থাকছি সঙ্গে, আছাড় খাবি কেন?

শোনামাত্র মিষ্টি চোখ পাকালো। ও, এই ফাঁকে আমার গায়ে হাত দেবার মতলব তোমার—কেমন? ফের তুমি আমাকে তুই-মুই করে কথা বলছ?

মুহূর্তের মধ্যে বাপীও আগের সেই বাপী। দু চোখে রাগ জমাট বাঁধছে। সেই সজলোভও চিকিয়ে উঠছে। অনেক দিনের মধ্যে গায়ে দূরে থাক, হাতে

হাত ঠেকাবারও সুযোগ হয়নি। রাগের চোটে হাত দুটো ডবল নিশপিশ করছে, আর ওই ফোলা গাল দুটো ছিঁড়ে নিয়ে আসতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু মিষ্টিও সেয়ানা কম নয় এখন। এই চোখ-মুখ দেখেই গেট ছেড়ে এক ঝটকায় তিন পা পিছিয়ে গেল। তারপর বাপীর মতো করেই পলকা রাগে চোখ পাকাতে চেষ্টা করল। এখানে ও-ছেলের কোনো জারিজুরি খাটবে না জানে বলেই ঠোঁটে মজার ছোঁয়া।

—ডাকব মাকে ?

গেট ছেড়ে বাপী হনহন করে হাঁটা দিল। রাগের মাথায় বনমায়ার ফিরে আসার খবরটাই ওকে বলা হল না। কিন্তু রাগটা আজ আর বেশিক্ষণ ধরে রাখা গেল না।……আবু যদিও বলে ভালোবাসাবাসির ব্যাপারে মানুষে জানোয়ারে তফাৎ নেই, তবু ওর চোখে মেয়েরা এখনো আবছা রহস্যের মতো। আজ শাড়িপরা মিষ্টিও যেন ওমনি একটু রহস্যের ওধারে চলে গেছে।

এর দিন-কতকের মধ্যে সেই রহস্যের পর্দা ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার। কি কারণে স্কুলের ছুটি চলছে তখন।

কলকাতা থেকে জাঠতুতো ভাই মণিদা এসেছে। সঙ্গে তার নতুন বউ গৌরী। গৌরী বউদি। মাত্র মাসখানেক আগে বিয়ে হয়েছে তাদের। কলকাতা থেকে নেমন্তন্নর চিঠি এসেছিল। বাবা লিখেছে যাওয়া সম্ভব নয়। সুযোগ সুবিধে হলে মণিদা যেন বউ নিয়ে বেড়াতে আসে।

নতুন বউ নিয়ে মণিদা গেছল দার্জিলিং বেড়াতে। ফেরার পথে দিন চার-পাঁচের জন্য এখানে আসা। আগে থেকে জানান দিয়েই এসেছে তারা। শুনে বাপী একমাত্র কারণে খুশী হতে পারে নি। দুখানা মাত্র ঘর। অতিথিরা এলে থাকার ব্যবস্থা কি হবে শুনেই বাপীর মাথা গরম হয়েছিল। বাবার ঘরটা বড় একটু। পিসীর সঙ্গে সেই কটা রাত বাপীকে বাবার ঘরে শুতে হবে। এমন বিড়ম্বনার মধ্যে বাপীকে স্মরণীয়কালের মধ্যে পড়তে হয় নি।

কিন্তু মণিদা আর তার নতুন বউ গৌরী বউদিকে দেখে বাপীর সেই চাপা কৌতূহল নতুন খোরাক পেল। গৌরী বউদির বছর কুড়ি হবে বয়েস আর মণিদার আটাশ। বয়সের তুলনায় মণিদাকে একটু ভারিকি গোছের দেখায়। ওদিকে নাম গৌরী হলেও গৌরী বউদি ফর্সা নয় আদৌ। কালোই বলা চলে। কিন্তু মুখখানা বেশ চকচকে, চোখ দুটো হাসি-হাসি।

উঠতে বসতে চলতে ফিরতে পুষ্ট যৌবনের কোনো মেয়েকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হল বাপীর। আরো কিছু উষ্ণ অথচ মজার খোরাক পেতে

লাগল মণিদার উদ্দেশ্যে গৌরী বউদির হাসি-মাখা চোখের ইশারার ব্যাপার-ট্যাপারগুলো লক্ষ্য করে। মণিদা হয়তো পিসীর সঙ্গে কথা কইছে দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর, গৌরী বউদিও সেখানেই। হঠাৎ দেখা গেল, পিসীকে গোপন করে চোখের ইশারা করে আর সামান্য একটু ঘাড় বেঁকিয়ে কি বোঝাতে চেষ্টা করে গৌরী বউদি ঘরে চলে গেল। আর তার একটু বাদেই মণিদাও চলল সেদিকে। বাবার সামনেও দুরাত এই কাণ্ড দেখেছে। খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ গল্পসল্প হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। বাপীকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়, ও ঠিক লক্ষ্য করেছে গৌরী বউদি উসখুস করছে একটু আর মণিদার দিকেই চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতে গৌরী বউদির সেইরকম ইশারা আর তারপর নিঃশব্দে উঠে চলে যাওয়া। তার একটু বাদেই মণিদা গোটা দুই হাই তুলে বলল, যাই, শুয়ে পড়িগে।

বাপীর অজানা রহস্যের সব কিছু এখন ওই একটা ঘরের আড়ালে। ভিতরে এক অবুঝ অবাধ্য তাড়না। ওই কাঠের ঘরের কোন্ ফাঁকে বাইরে থেকে চোখ লাগালে ভিতরের সব দেখা যায় তাও ওর জানা। ওটা পিসীর আর ওর ঘর। আচার আমসত্ত্ব এমন কি পয়সা চুরি করার জন্যও নিজের উপস্থিতি গোপন করে পিসী ঘরে আছে কিনা বা কি করছে না করছে—কত সময়ে দেখতে হয়। জলে-টলে ভিজে এলে তো দেখতেই হয়—কারণ ওই এক ব্যাপারে পিসীর মাথার ঠিক থাকে না।

…বাবা শুলেই ঘুম। পিসীকে বাইরে যাবার কথা বলে পা টিপে বাইরের সেই ফাটলেও চোখ লাগিয়েছে। কিন্তু ভেতরে ততক্ষণে ঘুটঘুটি অন্ধকার। চোখ নিঃশব্দে দিনের বেলাতেও লাগিয়েছে। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া সারতেই বেলা হচ্ছে ইদানীং। মণিদাকে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে দেখে, আর গৌরী বউদিকে কলকাতা থেকে আনা গল্পের বই পড়তে দেখে।

মণিদাকে দেখে বাপীর মনে হয়েছে, মোটাসোটা ভাল মানুষ। খেতে আর ঘুমোতে ভালবাসে। তার মধ্যে রহস্যের ছিটে-ফোঁটাও নেই। যা-কিছু সব ওই গৌরী বউদিকে ঘিরে। চোখের ইশারায় বা ভ্রূকুটি বা ঠোঁটের হাসি দিয়ে মণিদাকে যেন যেমন খুশি চালানোর ক্ষমতা রাখে।

বাপীর একটা সুবিধে, নতুন যে দেখে সে-ই ওকে খুব নিরীহ গো-বেচারা গোছের ছেলে ভাবে। মণিদা আর বিশেষ করে গৌরী বউদি তো ভাবেই। নইলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়ানোর সময় বুকের কাপড় খসে গেলেও পিসীর সামনে যেমন তাড়াতাড়ি তুলে দেয়, ওর সামনে নয়। সকাল

সাড়ে নটার মধ্যে সেদিন বাপীর সঙ্গে গৌরী বউদি আর মণিদার জঙ্গল দেখতে বেরুনোর কথা। জঙ্গলের ব্যাপারে ও যে কেমন ডানপিটে সেটা অবশ্য তারা জেনেছে। পাথর দিয়ে একদিন দুটো বুনো মুরগী মেরে এনে তাদের খাওয়ানো হয়েছে। তাদের অবাক হতে দেখে পিসী ওর জঙ্গলের দস্যিপনার গল্প করেছে। কিন্তু ওর পড়াশুনার ব্যাপারে বাবা আবার যা বলেছে তাতে সকলেই ওকে হাবা-গোবাই ধরে নিয়েছে। তা না হলে জঙ্গলে বেরুনোর আগে গৌরী বউদি এমন কাণ্ড করে সেদিন।

·· গৌরী বউদি বলেছিল, একেবারে স্নান সেরে বেরুবে। দেরি দেখে তার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে বাপী ঢুকে পড়েই থতমত খেল। কিন্তু ওকে দেখে মণিদা বা গৌরী বউদির ভ্রূক্ষেপ নেই। প্যান্ট আর শার্ট পরে তৈরি হয়ে মণিদা চৌকিতে বসে সিগারেট টানছে। গৌরী বউদির হাতে পাট-ভাঙা শাড়ি, তার উল্টো-সোজা দেখে নিচ্ছে। পরনে শুধু ব্লাউস আর সায়া। ওকে দেখে শাড়ির দিকে চোখ রেখেই বলল, দাঁড়া রে বাবা, যাচ্ছি তো জঙ্গলে, অত তাড়া কিসের—এ তো আর সিনেমার টিকিট ফুরিয়ে যাবার মতো কিছু নয়।

স্নানের আগে বাপী গৌরী বউদিকে একবার তাড়া দিয়েছিল বটে। এখন ঘর থেকে সরে না গেলেও কেউ কিছু ভাববে মনে হল না। গৌরী বউদি যত্ন করে শাড়ি পরছে। বাপী আড়চোখে দেখছে দাঁড়িয়ে, আর মণিদা আগে কখনো জঙ্গল-টঙ্গল দেখেছে কিনা সে-সম্বন্ধে দুই একটা অবান্তর কথা জিজ্ঞাসা করছে।

ধীরে-সুস্থে শাড়ি পরা শেষ হল গৌরী বউদির। ঘাড় বেঁকিয়ে পিছন দিকটা দেখে নিয়ে ওকে বলল, পিছনে পায়ের দিকটা টেনে দে দেখি।

এ-রকম উদ্ভট ফরমাসের জন্য বাপী আদৌ প্রস্তুত ছিল না। পিছনে গিয়ে উপুড় হয়ে বসে শাড়ির ওপর দিয়ে দু'হাতে একটা পা ধরল, কিন্তু কি ভাবে টানবে বুঝতে পারছে না।

গৌরী বউদি হেসে বাঁচে না। হাসছে মণিদাও। গৌরী বউদি হাসি সামলে বলল, তুই এ-রকম হাঁদা, অ্যাঁ? পা ধরে টানছিস! শাড়ির তলার দিকটা টান করে দিতে বললাম তোকে আর তুই পা চেপে ধরে শাড়িটা কুঁচকে দিলি?

এবারে বাপীর মাথায় ঢুকেছে। তাই করেছে। আর সন্তর্পণে বড় নিঃশ্বাস নিয়েছে। স্নো-পাউডারের গন্ধ···। মিষ্টির গায়ের মতো নয়।

ওদের নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে। গা ছমছম করছে বলে হোক বা পায়ে ঠোক্কর খাবার ভয়ে হোক, গৌরী বউদি বেশির ভাগ সময় বাপীর হাত ধরে থেকেছে। জঙ্গলের গল্প করতে করতে বাপীর মাথায় আরো বেশি হাবা-গোবা সাজার ঝোঁক চেপেছে। ভিতর থেকে কে যেন ইন্ধন যুগিয়েছে। খুব বোকার মতো যে-প্রসঙ্গে আসতে চায় তার সুযোগের অভাব জঙ্গলে নেই। দুটো বন-মোরগ দেখে লোভীর মতো মণিদা বলে উঠল, মার না—পারবি?

বোকা-বোকা গম্ভীর মুখে বাপী মাথা নেড়েছে। ও দুটোর একটা পুরুষ, একটা মেয়ে– ভালবাসাবাসির সময় মারতে নেই।

এই প্রসঙ্গে আসতে চায় বলেই বলা। নইলে আগে-পিছে মুরগি দুটো এমনিই চরছিল। ওদেব দেখে জঙ্গলে ঢুকে গেছে। কিন্তু এ-কথা শুনে মণিদা আর গৌরী বউদি দুজনেই হাঁ প্রথম। তারপর তাদের দুজনের চোখোচোখি। মণিদা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। আর গৌরী বউদি হাসি সামলানোর চেষ্টায় হাত ছেড়ে শাড়ির আঁচল মুখে খুঁজেছে। তাও কি সহজে হাসি থামে।

তেরছা চোখে চেয়ে গৌরী বউদি জিজ্ঞাসা করল, তুই জানলি কি করে?

আরো সাদা মুখ করে বাপী জবাব দিল, জঙ্গলে বেশিদিন থাকলেই জানা যায়। আমাদের সাড়া পেয়ে ঝোপে ঢুকে গেল বলে, নইলে দেখতে একটা আর একটার ওপব ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

আবার ঝলকে ঝলকে হাসি গৌরী বউদির, আর মণিদার সঙ্গে চোখো-চোখি। এত হাসির কি হল বাপী যেন বুঝতেই পারছে না।

গৌরী বউদি জিজ্ঞাসা করল, তুই নিজে থেকে জেনেছিস, না কেউ তোকে বলে দিয়েছে?

বাপী সতর্ক। আবার প্রসঙ্গ বিস্তারের ঝোঁকও অদম্য।— গোড়ায় গোড়ায় আবু বুঝিয়ে দিয়েছে। ও তো সব জন্তু-জানোয়ারের নাড়ি-নক্ষত্র জানে, আর চোখেও দেখেছে।...ওর সঙ্গে থেকে আমিও কম দেখিনি।

এমন সাদাসিধে ছেলের মুখ থেকে আরো শোনার লোভ গৌরী বউদির। তক্ষুনি জিজ্ঞাসা করল, তুই আর কি দেখেছিস?

বাপী তখন ভালবাসাবাসিব সময় পুরুষ ময়ূর পাখনা মেলে মেয়ে ময়ূরকে কেমন নাচ দেখায় সেকথা বলেছে, সাপের সেই পাকে পাকে জড়ানো মারাত্মক ভালবাসাবাসির কথা বলেছে। একই প্রসঙ্গে তিন বছর ধরে বনমায়ার বজ্জাতির কথাও বলেছে।

আদিম ইশারা কাকে বলে বাপী সঠিক না জানলেও নতুন কিছু দেখছে। গৌরী বউদির কালো মুখে লালের ছোপ লেগেছে। থেকে থেকে মণিদার সঙ্গে চোখে চোখে কিছু কথা হচ্ছে তার। দুজনেরই, বিশেষ করে গৌরী বউদির মুখে চাপা হাসি ঠিকরে পড়ছে।

কি দিন কি দিন আজ! ফেরার পথে একদিকে চোখ পড়তে বাপীব পা দুটো আটকে গেল মাটির সঙ্গে। অদূরে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে ভীম বাহাদুর। তার তিন হাত দূরে বসে একটা উঠতি বয়সের কালো-কালো পাহাড়ী মেয়ে। বাপী দেখামাত্র বুঝে নিয়েছে মেয়েটা কে।

এই দলটিকে দেখে ভীম বাহাদুর বেশ লজ্জা পেয়েছে। কারণ বাপী তো আর ওর অচেনা নয়। ওদের হাব-ভাব দেখে আর বাপীর মুখ দেখে গৌরী বউদি কৌতূহলে টইটম্বুর। খানিক এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুই চিনিস নাকি এদের?

—চিনব না কেন। লোকটা হল ভীম বাহাদুর, বনমায়ার মাহুত—মেয়েটা ভীম বাহাদুরের ভালবাসার মেয়ে। কাজে ফাঁকি দিয়ে দুটোতে জঙ্গলে এসে ঢুকেছে—

এর পর বাড়ি ফেরা পর্যন্ত মণিদার চাউনি দেখে বাপীর মনে হয়েছে তার বেজায় জল-তেষ্টা পেয়েছে। আর জলের অভাবে ঘন ঘন গৌরী বউদির দিকে তাকাচ্ছে। গৌরী বউদি কেবলই হাসি চাপছে, আর সঙ্গের হাবা ছেলেটাকেই গোপন করে ইশারায় মাথা নাড়ছে বা ভ্রূকুটি করে মণিদার কোনো ইচ্ছে নাকচ করে দিচ্ছে।

...নিঝুম দুপুরের বাতাসেও কি যে কানাকানি ছিল বাপী জানে না। বাবা বেরিয়ে গেছে। পিসীও শুয়ে। ও-ঘরের দরজা বন্ধ। কেউ যেন জোর করে বাপীর পা দুটোকে সেই ঘরের পিছনে টেনে নিয়ে গেল। তারপর একটা চোখ সেই ফাটলে।

তার পরেই বাইরে একেবারে কাঠ ও। ভিতরে প্রবল ঝাঁকুনি। বুকের ধপ-ধপানি ভিতরের কেউ শুনতে পাচ্ছে কিনা সেই ভয়। শরীরের রক্ত শির শির করে গা বেয়ে নামছে তো নামছেই। আবার একই সঙ্গে মাথার দিকে আগুন ছুটেছে। নদীর ঢেউয়ের মতো পায়ের নিচের মাটি দুলছে।

কতক্ষণ কেটেছে জানে না। হঠাৎই আবার একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চমক ভাঙল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাপী ঘরের বাইরে ছুটল। ছুট একেবারে জঙ্গলে। সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে। বুকের ভিতরটা আরো বেশি ঢিপ ঢিপ করছে।

জঙ্গলে ঢুকেও হন হন করে হেঁটেই চলেছে বাপী। অথচ এর থেকে বাড়ির কুয়োটাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ভালো হত। গা মাথা ডুবিয়ে বসে থাকতে পারলে ভালো হত।

চোখের সামনে আর রহস্যের পর্দা বলে কিছু নেই। এতদিন সেটা অল্প অল্প নড়ছিল, দুলছিল। তার ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু আভাস উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল তার সবটাই যে এমন আজব কল্পনা বাপী ভাবতেও পারে নি। কিন্তু তাই যেন ঢের ভালো ছিল আর মিষ্টি ছিল।

এক হ্যাঁচকা টানে পর্দাটা ছিঁড়ে দিয়েছে কেউ। কেউ কেন, বাপী নিজেই দিয়েছে। আর সেই মুহূর্তে ওর বুকের তলায় রূপকথার জগৎটা ভেঙে গুঁড়িয়ে একাকার হয়ে গেছে।

গৌরী বউদিকে নিয়ে মণিদা চলে গেছে। বাপী হাঁপ ফেলে বেঁচেছে। গৌরী বউদির পাশে মণিদাকে একটু বেঁটে দেখায়। বাপী গৌরী বউদির মাথায় মাথায় হবে। যাবার আগে গৌরী বউদি ওকে দু গাল টিপে আদর করে গেছে। কলকাতায় গেলে তাদের ওখানেই উঠতে বলেছে। মাঝের দুটো দিন বাপী আগের মতো কাছে যেতে পারে নি, তাকাতে পারে নি। মনে হয়েছে, ভালো করে ওর মুখের দিকে তাকালেই চুরি ধরা পড়ে যাবে। একেবারে জল-ভাত ছেলে না ভাবলে গৌরী বউদির সন্দেহ হতে পারত।

যেমন আবুর হয়েছিল।

আগেও বাপীকে তারিফের স্বরে অনেক সময় বলেছে, তুই একটা ভিজে বেড়াল, দেখলে মনে হবে কিছু জানিস না, কিছু বুঝিস না—ভাজা মাছখানাও উল্টে খেতে জানিস না। মজা লুটতে চাস তো এই ভাবেই থাকবি আর দরকার হলে ঝোপ বুঝে কোপ মারবি।

মণিদারা চলে যাবার পরেও বাপীর মনে স্বস্তি নেই একটুও। ও যেন কি একটা সংকটের মধ্যে পড়ে গেছে। তার থেকে যত বেরিয়ে আসতে চায়, ওটা ততো টানে। আর ভিতরে একটা অজানা যন্ত্রণা ছড়ায়। নিজেকে শাস্তি দেবার জন্যেই বিনা তাগিদে পড়ার বই নিয়ে বসে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করে। কিন্তু যন্ত্রণাটা তখন মাথায় নড়াচড়া করতে থাকে। বই ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ছোট লাঠিটা হাতে করে জঙ্গলে চলে আসে। দমাদম পিটে এক-একটা গাছের ছাল তুলে দেয়। নয় তো পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘা করে দেয়। একটা

ময়ূর দেখে পাথর নিয়ে ক্ষ্যাপার মতো তাড়া করেছিল। এরকম করলে যন্ত্রণার চাপ-ধরা বাতাসটা হাল্কা হতে থাকে।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ। অবাধ্য পা দুটো তারপর ওই বড়সাহেবের বাংলোর দিকে এগোবেই। বরাত এমন, পর পর দুদিনই মিষ্টির বদলে ওর বাবা-মাকে বারান্দায় দেখেছে। মেয়ে ফার্স্ট হয় ক্লাসে, সকালের দিকে ঘরে বসে তার পড়াশুনা করাই স্বাভাবিক এটা মনে হয় না। অকারণ রাগে একটা খারাপ গালাগাল ভিতর থেকে ঠেলে বেরোয়। সঙ্গে সঙ্গে ওই সাহেব আর মেমসাহেবকে ঘিরেই একটা কুৎসিত ছবি মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। নিজের ভিতর থেকে সেটা উচ্ছেদ করার তাগিদে বাপী হনহন করে সামনে এগিয়েছে।

সেই সামনে এগনোর শেষ চা-বাগানের আড়াই-পাতি তোলা মেয়েদের কাছাকাছি এসে। যে মেয়েগুলো ওকে দেখলেই মজা পায়। দাঁত বার করে হাসে। ওকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসা চলে মনে হয়। সেদিনও এক ফুর্তিবাজ মেয়ে হাত তুলে ওকে ডেকে বসল। বাপী সেদিন আর আগের মতো ছুটে পালালো না। কটা দিনের মধ্যে ভিতরটা কত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে নিজেরও জানা ছিল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

মেয়েটা কম করে আট-ন বছরের বড় ওর থেকে। ঠোঁট আর কালো কালো চোখ দুটোও হাসিতে ভেজা। বেতের ঝুড়ি বাঁধা কোমর সোজা করে দাঁড়াল। অবাক স্বরে জিগ্যেস করল, তুমি ইখেনে কি দেখতি আস গো খোকাবাবু?

বাপী বলল, তোমাদের পাতা তোলা দেখতে ভালো লাগে।

শুনে মেয়েটা শক্ত মাটিতে আছাড় খেল যেন।—পাতি তুলা দেখতি ভালো লাগে—মোদের দেখতি লয়। হায় হায় হায় হায়—

আশপাশের আট-দশটা মেয়ে খিল-খিল করে হেসে উঠল। বোকা মুখ করে বাপীও হেসেছে একটু একটু। তারপর চলে এসেছে। একটা ছোট ছেলেকে বাগে পেয়েছে ভেবেই এমন হাসাহাসি ওদের। বয়েসটা যে বাপীর রাতারাতি কত বেড়ে গেছে ওরা জানবে কি করে। এত বেড়েছে যে নিজের ভিতরে আর কুলিয়ে উঠছে না। মনে হয় এজন্যেই এমন যন্ত্রণা।

ঘরের সামনের জমিতে বসে হাত-দা দিয়ে একটা বাখারি চাঁচছিল আবু রববানী। বাপী কাছে আসতে মুখ তুলে একবার দেখে নিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল।

বাপী সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল মেজাজ-পত্র ভালো নয়। ওর পাশে আরো কটা চাঁচা বাখারির টুকরো পড়ে আছে।

হাত দুই ফারাকে বাপীও মাটির ওপরেই বসল। বলল, দুপুরে অনেকক্ষণ ঘুরে তোমাকে জঙ্গলে না পেয়ে এখানে এলাম—

বাখারি চাঁচার ফাঁকে আবু একবার টেরিয়ে দেখে নিল ওকে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, ছুটির মধ্যে এ কদিন সকাল দুপুর কোথায় ডিউটি দিলি—বড়সাহেবের বাংলোয়?

বাপী ঢোঁক গিলল।—না, কলকাতা থেকে দাদা-বউদি এসেছিল।

এবারে আবু অবাক একটু।—তোর আবার দাদা-বউদি কে?

—জ্যাঠতুতো দাদা।...বিয়ের পর নতুন বউ নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। এখানেও এসে ছ-সাত দিন ছিল—

বাখারি ছেড়ে আবুর ছোট ছোট চোখ দুটো এবারে সোজা ওর মুখে এসে আটকালো। এভাবে কি দেখার আছে ভেবে না পেয়ে বাপীর অস্বস্তি।

—দাদার বয়স কত?

—সাতাশ-আটাশ।

—আর বউদির?

...বছর কুড়ি। আবুর চাউনি আর রকম-সকম দেখে বাপী ঘাবড়েই যাচ্ছে।

—দেখতে কেমন?

...কালো।...তবে ভালোই।

আবু এবার কানে গোঁজা একটা বিড়ি টেনে নিয়ে দাঁতে লাগালো। কোমরের লুংগিতে গোঁজা দেশলাই বার করে ধরালো সেটা। বন-বেড়াল মারার পর চাকরিটা হয়েই গেছে ধরে নিয়ে বিড়ি খেতে শুরু করেছিল। ওকে বলেছিল, কোনো একটা নেশা না থাকলে পুরুষমানুষকে মানায় না। কিন্তু বাপের হাল দেখে হাঁড়িয়ার ওপর হাড়ে চটা। তাই বিড়ি ধরেছে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে এবারে হাল্কা চালে বলল, তাই বল্, নতুন বউদির সেবা-যত্ন করে বেশ রসে-বশে ছিলি কটা দিন—নইলে ছুটির দিনগুলোতেও তোর মতো ছেলে সকাল দুপুর ঘরে কাটায়।

বাপীর ফাঁপরে পড়ার দাখিল। আবু নিজেই বলে জঙ্গলের সব জানোয়ারের মন-মেজাজ বোঝে। এখন মনে হল, ওর দিকেও আর একটু ভালো করে তাকালে ভিতরে যা আছে সব গলগল করে বার করে নেবে।

হেসেই পাশ কাটাতে চেষ্টা করল।—বাবা আপিস নিয়ে এত ব্যস্ত এ কদিন, আমাকে বাজার পর্যন্ত করতে হয়েছে—বুঝলে?

তাহা মিথ্যে কিছু বলেনি। সত্যি কদিন ধরে বাবার কাজের ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। রাতে ছাড়া কলকাতার অতিথিদের সঙ্গে দুদণ্ড বসে গল্প করারও সময় পায় নি। কৈফিয়ত দিয়েই জিজ্ঞাসা করল, তুমি আজ জঙ্গলে যাওনি যে?

বিড়িটা দাঁতে চিবিয়ে আবু অস্ফুট স্বাগত জবাব দিল, এ শালা জঙ্গলের নিকুচি করি আমি।

জঙ্গল-অন্ত প্রাণ আবুর মুখে এ কি কথা।—কেন, চাকরি হবে না তোমার?

—হবে। তোর শ্বশুরের নাতি-নাতনী হবার পরে হবে।

শ্বশুর কাকে বলছে বাপীর সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না। আগেও ঠাট্টা করে বড়সাহেবকে ওর শ্বশুর বলেছে। কিন্তু নাতি-নাতনী হবার কথাটা শোনামাত্র একটা দৃশ্য ভিতর থেকে ঠেলে ওঠার উপক্রম, সঙ্গে সেই যন্ত্রণাটাও। আবু নিজের খেয়ালে আছে তাই বাঁচোয়া। বলল, তোর পিসীর কাছ থেকে কিছু ধার যোগাড় করে দিতে পারিস—একটা খাকী ফুল-প্যাণ্ট আর মোটামুটি একটা ভালো জামা দরকার। শিলিগুড়ি চলে যেতে পারলে একটা কাজ হয়ে যেত—যুদ্ধের চাকরিতে সেখানে অনেক লোক নিচ্ছে শুনলাম।

বাপী হতভম্ব।—যুদ্ধের চাকরি!

আবুর গলায় বিরক্তি।—কি লেখাপড়া করিস, পৃথিবীর কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে কিনা জানিস না?

—সে তো ইংরেজদের সঙ্গে জার্মানির—এখানে কি?

—এখানেও হতে পারে, নইলে ঝুড়ি ঝুড়ি লোক নিচ্ছে কেন? আবার পাঠিয়েও দিতে পারে, এই বানারজুলির রাস্তা দিয়েও ট্রাক বোঝাই মিলিটারি যাচ্ছে আসছে, দেখিস না?

বাপী ভয়ানক দমে গেল। বানারজুলি ছেড়ে, এই জঙ্গল ছেড়ে আর ওকে ছেড়ে আবু কোথাও চলে যেতে পারে ভাবলেও বুকের ভেতর টনটন করে। তার ওপর বলে কিনা যুদ্ধের চাকরি নেবে, যুদ্ধে যাবে!

—কি রে, শুনেই ঘাবড়ে গেলি যে। ওর মুষড়ে পড়া মুখ দেখে আবুর একটু ভালো লেগেছে।—আরে এই শর্মা না পারে কি, কোনো শালার একটা চান্স দেবার নাম নেই—এখানে বসে বসে ভ্যারেণ্ডা ভাজব?

গলায় একটু জোর এনে বাপী বলল, এখানেই ঠিক তোমার কাজ হয়ে যাবে, দেখো।

—আর হয়েছে। আমাদের বড়সাহেবের ছোট বাবা এসে সকলের পেছনে হুড়ো দিয়ে গেছে, এখন চাচা যে যার আপনা প্রাণ বাঁচা—কে কাকে দেখে? চোখ-কান বুজে নতুন বউদির সেবা-যত্নই করে গেলি, এদিকের কোনে খবরই রাখিস না বুঝি?

মাথার যে অবস্থা চলেছে সত্যি কোনো খবরই রাখে না বাপী। বাবাকে একটু বেশি ব্যস্ত দেখেছে কদিন এই যা। আর মণিদারা চলে যাবার পর এ দুদিন বাবার সঙ্গে দেখাই হয় নি বলতে গেলে। আগেই বা কতটুকু হত।

আবুর মুখে মোটামুটি খবর শুনে সেও তাজ্জব। বড়সাহেবের ছোট বাবা বলতে উত্তরবঙ্গের সহকারী ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার—ছ'কথায় অ্যাসিসট্যান্ট ডি এফ ও। তার ওপরে ডি এফ ও—সে লালমুখো খাঁটি সাহেব। আর ওই এ-ডি-এফ-ও এদেশের মানুষ হলেও বাঙালী নয়। কারো লাগানো-ভাঙানোর জন্যে হোক বা বানারজুলি জঙ্গলের রিপোর্ট দেখে হোক, জানান না দিয়ে সে হুট করে এসে হাজির হয়েছিল। চার-পাঁচ দিন থেকে সব দেখে শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ফিরে গেছে।

না বুঝেই বাপী জিগ্যেস করল, অত রেগে গেল কেন?

—রেগে যাবে না, যার চোখ আছে সে-ই বুঝবে এ জঙ্গলের বারোটা বাজতে আর বেশি বাকি নেই। আধ্যেক নালা শুকনো, জল চলে না, কত চাবা-বেড শুকিয়ে খরখরে হয়ে গেল, তাও ছাগল গরুতে মুড়িয়ে যাচ্ছে, দামী দামী শিশু গাছগুলোর চার ভাগের এক ভাগ লোপাট, শালজঙ্গল তো আরো বেশি ফাঁকা হচ্ছে—ওদিকে জঙ্গল কুপ-এর ইজারাদাররা সেই একই টাকা দিচ্ছে। সাহেবদের পিয়ারের বা খদ্দের-শিকারীরা এসে একধার থেকে বাঘ ভালুক শুয়োর হরিণ মেরে মেরে জঙ্গল কানা করে দিচ্ছে—জঙ্গল বাঁচবে কি মন্ত্রের জোরে? ছোট থেকে বড় সব শালা চোর—বুঝলি?

সত্যিকারের রাগে বেগনে মুখ আবুর। বাপী কিছু জানত, কিন্তু এতটা জানত না। শেষের কথায় আরো মুখ শুকালো। ভয়ে ভয়ে বলল, আমার বাবাও?

—ধেৎ। এবারে আবু ঠাণ্ডা একটু।—তোর বাবা হল গিয়ে ধার্মিক চুনোপুঁটি মানুষ, তেনার কথা কে বলছে। জঙ্গলটা সায়েব-সুবোদের লুটের মাল, তাদের পেট মোটা হচ্ছে। নড়ুক নড়ুক—ধম্মের কল বাতাসে ভালো করে নড়ুক।

ঝটকা মেরে উঠে ঘরে চলে গেল। হাত-দা'টা ওর হাতেই। বাপীর মনে হল, হাতের কাছে তেমন কাউকে পেলে একটা কোপ-টোপ বসিয়ে দিতে পারে।

মিনিট সাত-আটের মধ্যে আবার বেরিয়ে এলো। পরনে হাতে-কাচা পরিষ্কার পাজামা গায়ে ফুলকাটা পাঞ্জাবি। এ-ই ওর বাবু-পোশাক। চাঁছা বাখারিগুলো জড়ো করে হাতে তুলে নিল।—চল্।

আবু চল্ বললেই চলে অভ্যস্ত বাপী। ওর হাতের বাখারিগুলো বেশ পুরুষ্টু। ভাবল তেমন ভালো কোনো চারাগাছের জন্য হয়তো ওগুলোর দরকার। কিন্তু আবু জঙ্গলের পায়ে-হাঁটা পিছনের রাস্তা ধরে চলল। ও-দিকে শুধু ঝোপঝাড় আর নীচু-জাতের খেটে-খাওয়া মানুষদের একটা দুটো করে মাটির ঘর ছাডা আর কিছু আছে বলে জানে না। এদিকে যারা থাকে তারা বেজায় গরিব।

আরো একটু ভিতরের দিকে প্রায় দেড় মাইল হাঁটার পর আবু ওকে নিয়ে এক জায়গায় এসে থামল। একই মাটির ছাদের নিচে পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা সামান্য বড় আর একটা ছোট। ছোট ঘরটার সামনেটা হাঁ করা, অর্থাৎ দরজা নেই। বড় ঘরের সামনে হোগলার ওপর বাখারি লাগিয়ে দরজা বসানো। ঘর দুটোর চারদিকে একটু জায়গা নিয়ে গাছের ডালের বেড়া দেওয়া হয়েছে। ডালগুলো বাঁশের খুঁটির সঙ্গে মোটা তার দিয়ে কষে বাঁধা। সামনেও দুটো বাঁশের খুঁটির সঙ্গে আটকানো গাছের ডালের গেট।

কাছাকাছির মধ্যে আর কোনো মাটির ঘরও নেই।

আবু গলা চড়িয়ে হাঁক দিলে, কই গো, বাদশা-বেগমরা এখনো সব ঘুমিয়ে নাকি?

বাপীর মুখে কথা নেই, ভিতরে বেশ অবাক। আবুর সঙ্গে এতকাল ঘুরছে, কিন্তু এখানে এই প্রথম।

প্রায় একই সঙ্গে পাশাপাশি ঘর দুটো থেকে দুটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। আর দরজাঅলা ঘরটার ভিতর থেকে পুরুষের গলা ভেসে এলো, আবু ভাই এলে? দুলারি, আবু ভাইকে ভিতরে আসতে বল্ না—

দুজনেরই পরনে আধ-ময়লা জোড়াতাপ্পির শাড়ি। পুরুষের গলা থেকে বোঝা গেল হোগলার দরজার সামনে যে, সে-ই দুলারি। বছর উনিশ-কুড়ি, অর্থাৎ আবুর বয়সী হবে। যেমন ঢ্যাঙা, তেমনি আঁটোসাঁটো শরীর। গায়ের রং কালো-ঘেঁষা তামাটে। মাথায় এলোমেলো লালচে চুলে কখনো বোধ হয়

তেলের ছোঁয়া পড়ে নি। সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়। রুক্ষ মুখ, ধার-ধার চাউনি।

বাপীকে দেখে নিল একবার। তারপর আবুর দিকে চোখ। গলার স্বরও পুরুষালি ধাঁচের, ঘরের লোকের উদ্দেশ্যে জবাব দিল, বলতে হবে না, শুনতে পাচ্ছে।

দরজাশূন্য পাশের ছোট ঘরের সামনের মেয়েটা হয়তো দুলারির থেকে বছর দুই ছোট হবে। অত লম্বাও নয়। বেশ ফর্সা। ঢলঢলে মুখ। নাক চাপা একটু। তেলের অভাবে এরও মাথার চুল রুক্ষ, তবু অন্যজনের মতো নয়। চাউনি দেখে মনে হবে এই মেয়েটার একটু রস-বোধ আছে।

গেট সরিয়ে আবু ভিতরে ঢুকল। এতক্ষণের বিরক্তি-ভরা মুখটা একটু হাসি হাসি দেখাচ্ছে এখন। ঘাড় ফিরিয়ে বাপীকে বলল, আয়—।

বড় মেয়েটার সামনে এসে হাতের বাখারিগুলো বাড়িয়ে দিল, ধরো, কাল এসে ও-ঘরের দরজা বানিয়ে দেব।

—তোমার দরজার জন্যে আমরা মরে যাচ্ছিলাম? ওই রেশমাকে দাও, ঘরে কেউ ঢুকতে চাইলে বাখারি-পেটা করবে।

রেশমা কোনো মেয়ের নাম হয় বাপী জানত না। কিন্তু বেশ মিষ্টি লাগল। মেয়েটার চোখে ভ্রূকুটি, ঠোঁটে হাসি।

হাতের বাখারি আবু মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, ওঃ, সব দায় যেন আমার—ওসব দরজা-টরজা নিজেরাই বানিয়ে নিও। যতো ভালো করতে যাই ততো সব পেয়ে বসে—

দুলারিরও ঠাণ্ডা তেরছা জবাব।—অত ভালো করার জন্য কে সাধছে তোমাকে?

—ফের তুই আবু ভাইয়ের সঙ্গে ক্যাটক্যাট করে কথা বলিস দুলারি? ভিতর থেকে পুরুষের কর্কশ গলা।

যে-মুখ করে দুলারি ঘরের দিকে চোখ ফেরালো একবার, বাপীর মনে হল ভিতরে যে আছে তাকে সে একটুও কেয়ার করে না। আবু এগিয়ে যেতে দরজা ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াল। আবু ভিতরে চলে গেল।

বাপী হাঁ করে দাঁড়িয়ে। এরকম বাতাস থেকে ঝগড়া টানার কারণ কিছু বুঝছে না। এবারে দুটো মেয়েরই ওর দিকে চোখ। তারপর দুলারির আবার তেমনি ঠাণ্ডা চাঁছাছোলা কথা।—কি বুদ্ধি, এখেনে বাবু-ঘরের ছেলে এনে হাজির!

ভিতর থেকে আবু ডাকল, বাপী, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ভিতরে আয়।

অগত্যা বাপীও পায় পায় ভিতরে এসে ঢুকল্। পিছন থেকে এগিয়ে এসে দুলারি গম্ভীর মুখে একটা তেলচিটে ছেঁড়া-খোঁড়া চাটাই মাটিতে পেতে দিল।

চাটাইয়ের ওপর আবু গ্যাঁট হয়ে বসল। হাত ধরে ওকেও বসালো। দড়ির খাটিয়ায় বসা কালো কালো দাড়ি-বোঝাই লোকটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বাপী বিমূঢ় হঠাৎ। এই লোকটাকে তো ও খুব চেনে। কাঁধের পেল্লায় ঝোলায় ছোট-বড় তিন-চারটে ঝাঁপড়ি নিয়ে সাপুড়ের পেটমোটা বাঁশি বাজিয়ে বানারজুলির রাস্তায় আর বাড়ি বাড়ি ঘুরে কত রকম সাপের খেলা দেখাতো। বছরখানেক হল একে আর দেখছে না। তাব এ কি হাল! দাড়ির জন্য গাল দেখা যাচ্ছে না, সমস্ত কপাল নাক আব চোখের নিচটা বসন্তের শুকনো গর্তে ছেয়ে আছে। চাউনিও কি-রকম ঘোলাটে।

আবু জিজ্ঞাসা করল, ছট্টু দাদাকে দেখেছিস কখনো?

বাপীর নাম জানা ছিল না। বলল, সাপের খেলা দেখাতো...

লোকটার বয়েস চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। দাড়ির জন্য দুলারির ডবল বয়েস মনে হল। ফোঁস করে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, নিজে এখন খোদার খেলা দেখছি।

আবু বলল, গেলবারের বসন্তে ছোট্টু দাদার চোখ দুটোও গেছে। এখন আবার বুকের ব্যামোয় ধরেছে। এই হল ছোট্টু দাদার বিবি দুলারি আর ওই রেশমা—ছোট্টু দাদার বোন।

দুলারি খাটিয়ার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, আর রেশমা দরজার কাছে। ওদের দিকে একবার করে তাকাতে গিয়ে ঘরের এককোণে থাকে থাকে সাজানো কটা সাপের ঝাঁপিও চোখে পড়ল। ওগুলোতে এখনো সাপ আছে মনে হল।

বাপীর পরিচয় শুনেই ছোট্টু দাদা বলল, বাপকে ধরে আবুর চাকরিটা জলদি পাইয়ে দাও খোকাভাই—নইলে ও যুদ্ধে চলে যাবে বলছে।

এরপর আবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সে। আবুর মতো ছেলে আর হয় না। আল্লার শেষ মার থেকে ও-ই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। ভাঙা ঘর মেরামত করে দিয়েছে, জঙ্গলে মুরগি খরগোস যা পায় মেরে এনে ওদের দিয়ে যায়, নইলে কাঠ বেচে দুলারি আর কটা টাকা পায়, গোটা মাসের আটা-চালও হয় না তা দিয়ে। ঘরের পিছনে খানিকটা জমি সাফ করে এই আবুই চারদিকে

গাছের ডালের বেড়া দিয়েছে। পিছনের জমিতে এখন লাউ কুমড়ো আর শাকটাক বেশ হচ্ছে। সোৎসাহে ছোট্টু মিয়া বলল, তোমার লঙ্কা গাছে এখন খুব লঙ্কা ধরেছে আবু ভাই।

আবু নির্লিপ্ত মুখে নিজের প্রশংসা শুনছিল। ওদিকে দুলারির মুখে কৃতজ্ঞতার ছিটেফোঁটা নেই। শুধু রেশমার হাসিমাখা দুচোখ আবুর মুখের ওপর। দেখামাত্র বাপীর স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাড়া জাগল একপ্রস্থ। আবু যে খুব ভালো তাতে ওরও কোনো সন্দেহ নেই। তবু আবুর এত দয়া এত উদারতা সব ওই রেশমার জন্য। এ একেবারে অকাট্য সত্য। এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

আবু উঠে পড়ল। ওকেও ডাকল, চল, কেমন লঙ্কা হল দেখে আসি।

এদিক থেকে দুলারি হুকুম করল, রেশমা যা—

আবু ওমনি ঝাঁঝিয়ে উঠল, রেশমা যাবে কেন, আমি চিনি না?

পাল্টা ঝাঁঝে দুলারি বলল, গেলে তোমার গায়ে হলকা লাগবে?

সঙ্গে সঙ্গে ছোট্টু মিয়া খেঁকিয়ে উঠল, আবু ভাইয়ের সব কথায় তুই জবাব দিস কেন?

পিছনের ছোট সবজি বাগান দেখতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। রেশমা ওদের দশ হাতের মধ্যেই ছিল। আবু ওর দিকে ফিরেও তাকায়নি। বাপীর তবু মজা লাগছিল। আবুর সঙ্গে এতদিন এত মিশেছে, অথচ এত বড় ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরে জানতে পারে নি। ওর পেটে পেটে এত!

কিন্তু ফেরার পথে ওই রেশমার কথা শুনে বাপী অবাক আবার। রেশমার বিয়ে হয়ে গেছে। ঘরে মরদও আছে। লোকটা আবার মুসলমান নয়, খ্রীস্টান। জঙ্গলে কুলির কাজ করে কাঁদনা—রেশমা তার বউ। দিন-রাত মদ খায় লোকটা, ঘরে এক পয়সাও দেয় না। নেশায় ব্যাগড়া দিতে গেলে বউটাকে ধরে দেদার ঠেঙায়। মেরে শুইয়ে ফেলে একেবারে। যেদিন খুব বেশি মারধর হয়, রেশমা তার ভাজের কাছে পালিয়ে আসে। দুদিন চারদিন বাদে আবার যায়, আবার মার খায়, আবার আসে। ছ' মাস ধরে এরকমই চলছে।

শুনে বাপীর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। তাহলে আবুর কি-যে আশা ভেবে পেল না।

দু' সপ্তাহের মধ্যে বানারজুলির জঙ্গলের শান্তি তছনছ হয়ে গেল। নাড়াচাড়া

কিছু পড়বে সেটা সহকারী ডি. এফ. ও. চলে যাবার পরে সকলেরই মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই নাড়াচাড়ার ফল যা দাঁড়াল সেটাই নীল আকাশ থেকে আচমকা বাজ পড়ার মতো।

আবু আর বাপীর অন্তত সেই রকমই মনে হল।

মাঝে এখানকার রেঞ্জ অফিসার সন্দীপ নন্দী তিন-চার দিনের জন্য হেড-কোয়ার্টার্স-এ চলে গেছলেন। এর দিনকতক বাদে স্বয়ং ডি. এফ. ও.—লালমুখো খাঁটি সাহেব এসে হাজির। সকলকে অবাক করে এখানকার বড় সাহেব অর্থাৎ নন্দী সাহেবের বাংলোয় তিন দিন তিন রাতের অতিথি হলেন তিনি। আগের সহকারী ডি. এফ. ওর জন্য চা-বাগানের বাংলো ঠিক করা হয়েছিল। এবারের পরিদর্শনের ফল কি দাঁড়াবে তখনো কেউ জানে না। আবু চুপি চুপি বাপীকে বলেছিল, তোর শ্বশুরের বাংলোয় শহর থেকে বাবুর্চি আর খানসামা এসেছে, আধপেটি বিলিতি বোতলও এসেছে—আর কত রকমের মাংস আসছে ঠিক নেই।

বিলিতি সাহেবকে নিয়ে ঘটা করে দুদিন জঙ্গল দেখানো হল। ফাইলপত্রও পরীক্ষা করা হল। জঙ্গলের গলদের প্রধান আসামী আবুর বাবা কালু রব্বানী। লালসাহেব জানলেন, জঙ্গলের ভিতরে ভাঁটিখানা গজিয়ে ওঠার মূলে সে। আসামীর তালিকায় আরো তিনজন বীটম্যান, একজন ফরেস্ট গার্ড, একজন সেচের বাবু। বাপীর বাবা হরিবাবুর ফাইল আর গাছপালার হিসেবনিকেশও বিলিতি সাহেবের কাছে সন্তোষজনক নয়। এদের সকলের যথাযোগ্য দণ্ডের নির্দেশ দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

এরপর এখানকার বড়সাহেবের সেই দণ্ড বিধানের পালা। হেড বীটম্যান কালু রব্বানী, তিনজন বীটম্যান, একজন ফরেস্ট গার্ড আর সেচবাবুর চাকরি গেল। তদন্তসাপেক্ষে হরিবাবুকে সাসপেণ্ড করা হল।

কপাল শুধু আবু রব্বানীর। বড়সাহেব নিজে ডেকে তাকে বীটম্যানের চাকরি দিলেন। চাকরি পেয়ে আবু সাহেবকে সেলাম ঠুকল আর ঘরে এসে নিজের কপাল চাপড়ালো।

বাবার চোখে জল দেখেছে বাপী। পিসীর পায়ে হাত রেখে বাবাকে বলতে শুনেছে, আমি কোনদিন এক পয়সাও কারচুপি করিনি, তুমি তো জানো।

পিসীর চোখেও জল। বাবাকে হাত ধরে টেনে তুলেছে আর বলেছে, এত ভেঙে পড়িসনে, ঠাকুর এত বড় অবিচার কক্ষনো করতে পারেন না।

ঠাকুরের ওপর বাবার ভরসা এখন কতটুকু বাপী জানে না। দিনের মধ্যে

পাঁচবার করে তাকে ঘর থেকে ছুটে বেরুতে দেখছে। কোথায় যায় বাপী তাও আঁচ করতে পারে। বিচার যে করবে তার কাছে। ওই বড়সাহেবের বাংলোয় মেজসাহেবের বাংলোয়। চোখে না দেখলেও বাপী জানে, আবুর মতে আসল চোর যারা, বাবা তাদেরই হাতেপায়ে ধরছে, কান্নাকাটি করছে।

আরো তিন সপ্তাহ বাদে বাবার ছটফটানি কমল। মুখ থমথমে এখন। তার বিচার হয়ে গেছে। বড়সাহেব দয়া করেছে। চাকরি থাকল। তিন বছরের ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ। সঙ্গে ওয়ার্নিং।

এবারেও আবু ওকে চুপিচুপি বলেছে, পাছে মরীয়া হয়ে বাবা হেড কোয়ার্টারস-এ ছোটে আর হাটে হাঁড়ি ভেঙে সব ফাঁস করে দেয় সেই ভয়ে বড়সাহেব আর মেজসাহেব এই দয়া দেখালো। বলেছে, তোর বাবা তো আর আমার বাপের মতো মুখ্খু নয়!

ভেতর-বার সব জ্বলছে বাপীর। সেই কবে থেকে জ্বলছে। দূর থেকে বাংলোটাকে দেখে। চোখের আগুনে ওটা ভস্ম হয় না। বাড়ির মানুষগুলোও ভস্ম হয় না।

··তারপর সেই দিন। যে দিনটা বাপী এ জীবনে আর কোনদিন ভুলবে না। কোনদিন-না।

মিষ্টি জঙ্গলে। মিষ্টি একা। ওদের বাংলোর খুব কাছেই। একটা রঙিন প্রজাপতির পিছনে তাড়া করেছে।

সেটা শনিবার। প্রচণ্ড কিছু ঘটবে বলেই বাপীর এই মতি কিনা কে জানে। আকাশ সেদিনও মেঘলা ছিল। বানারজুলির জঙ্গলে ওকে বড্ডোই টানছিল। শনিবার দেড়টায় ছুটি। ক্লাসের মাস্টারমশাইকে পিসীর শরীর খারাপের কথা বলে বারোটায় বেরিয়ে এসেছে। তারপর বাড়ি। তারপর জঙ্গল। নিজের মনে বেশ খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর দূর থেকে এই দুটো চোখে একবার মিষ্টিকে ভস্ম করার আশা নিয়েই এদিকে এসেছিল। বেলা এখন আড়াইটের কম নয়।..

দূর থেকে মিষ্টিকে দেখেই বাপীর পা দুটো থেমে গেল একবার। ওকে দেখে নি। দেখলেই ছুটে পালাবে। সেই পথ আগলানোর জন্যেই আধ মিনিটের মধ্যে পিছন দিকে চলে এলো। মিষ্টি এখনো প্রজাপতির পিছনে। মাঝে কিছুদিন কাছাকাছি না হওয়ার ফলে বেশ ডাগরটি লাগছে। বাপীর দু চোখ লোভে চিকচিক করছে। আগের মতো নয়, এই লোভ বাপীর কাছেও নতুন। চোখের সামনে জোড়া জোড়া মুখ। মণিদা আর গৌরী বউদি···ভীম

বাহাদুর আর তার ভালবাসার মেয়ে···আবু আর রেশমা। পিছন থেকে বাপী নিঃশব্দে এগোচ্ছে। তার চোখে শুধু লোভ নয়, দুর্জয় আক্রোশও।

প্রজাপতির পিছনে আর না গিয়ে মিষ্টি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বাপী তখন ওর পাঁচ হাতের মধ্যে। মিষ্টি থমকে তাকিয়ে মতলব বুঝতে চেষ্টা করল। বলল, পিছন থেকে চুপি চুপি আসা হয়েছে—কেমন?

একেবারে কাছে এসে বাপী জবাব দিল, চুপি চুপি আসব কেন। তোকে দেখেই তো এলাম—

একটা হাত ধরল। এক ঝটকায় সেই হাত ছাড়িয়ে মিষ্টি ধমকে উঠল, ফের গায়ে হাত! গিয়ে বলব মাকে?

প্রাণপণ চেষ্টায় বাপীর বাইরেটা মোলায়েম তখনো।—ঠিক আছে, আমাদের বাড়ি চল্, পিসী ক্ষীরের পুলি বানিয়েছে—খেলে আর ভুলতে পারবি না।

মিষ্টি মুখ মচকে জবাব দিল, হ্যাঃ, তোমার বাবা চুরি করে ধরা পড়েছে, আমার বাবা ক্ষমা করে দিল বলে—আর কক্ষনো তোমাদের বাড়ি খেতে যাই—

কথাগুলো মুগুরের ঘায়ের মতো মগজে এসে লেগেছে। তারপর যা ঘটার চোখের পলকে ঘটে গেল। আচমকা দুটো হাতসুদ্ধু বেড়িয়ে নিজের বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে বাপী ওকে শূন্যে তুলে নিয়ে ভিতরের দিকে ছুটল। মিষ্টি ভালো করে চেঁচাবারও ফুরসৎ পেল না। ওর হাঁ-করা মুখের মধ্যে বাপী নিজের মুখ চেপে ধরেছে।

পঁচিশ-তিরিশ গজের বেশি এগনো গেল না। ওর ঠোঁটে মুখে মিষ্টি দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। জুতোসুদ্ধু পা ছুঁড়ছে।

দাঁড়িয়ে গেল। তার পরেই মিষ্টি মাটিতে। বাপী ওর ওপরে। ভিতর থেকে যে শয়তানটা বেরিয়ে এসেছে, বাপী নিজেও তাকে ভালো চেনে না। তার স্থান কাল বোধ নেই, ভালো-মন্দ জ্ঞান নেই, পরিণামের হিসেব নেই। তার শুধু লোভ, শুধু আক্রোশ। মুখে দাঁতে ঠোঁটে জিভে নরম মাংসের স্পর্শ। মুখে মুখ চেপে গলা দিয়ে ওকে টু শব্দও বার করতে দিচ্ছে না। আর হাত দুটোরও সর্বাঙ্গের নরম মাংস খুবলে তুলে নেবার উল্লাস।

এই উল্লাসের মুখে আবার একটা ধাক্কা খেয়েই শয়তান থমকালো। তারপর পলকে কোথায় সেঁধিয়ে গেল। এবার বাপী দেখছে। দেখছে মিষ্টির সমস্ত মুখ আবির-গোলা লাল। চামড়া ফেটে এক্ষুনি রক্ত বেরিয়ে আসবে বুঝি।

বড় হাঁ-এর মধ্যে একটা বিকট কান্না টাক ধরে আছে। ওটা মুক্তি না পেলে দম-বন্ধ হয়ে মরেও যেতে পারে।

নিজের অগোচরেই ওকে ছেড়ে বাপী হাত-দুই সরে গেল। খুব শব্দ না করেই কান্নাটা মুক্তি পেল। তারপরেই ত্রস্তে উঠে দাঁড়িয়ে মিষ্টি পনের-বিশ হাত ছুটে গেল। পলকের জন্য ঘুরে দাঁড়াল একবার। মাটি থেকে বড়সড় একটা পাথর তুলে নিয়ে প্রাণপণ জোড়ে ছুঁড়ে মারল ওকে। লাগলে কি হত বাপী জানে না। লাগল না। বাপী নিজের অজান্তে মাথা নুইয়ে ফেলেছিল। মুখ তুলে দেখে মিষ্টি নেই।

তখনো বিকেল। আবুর ঘরের সামনের উঠোনে বসেছিল বাপী। শরীর অবসন্ন। কিছু একটা ঘটবে জানে। কিন্তু ও কি করবে জানে না। তাই এখানে।

আবু এলো। সঙ্গে আরো দুজন বীটম্যান। আবুর থমথমে মুখ। বলল, বাড়িতে না দেখেই বুঝেছি তুই এখানে। চল্‌, বড়সাহেবের বাংলোয় যেতে হবে, তোকে ধরে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে—

বাপী ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

আবু রেগে গেল।—হাঁ করে দেখছিস কি, আমি বড়সাহেবের গোলাম না এখন? তারপর ঝুঁকে গলা খাটো করে বলল, তোর বাবাও আছে সেখানে, দুষ্টুমি করেছিস, না হয় মার ধর খাবি একটু, অত ভয়ের কি আছে, চল্‌—

কি দুষ্টুমি বা ভয়ের কতটা, আবুও জানত না। বাংলোর বারান্দায় মেম-সাহেব, সাহেব আর বাপীর বাবা। দরজার ও-ধারে মিষ্টি।

আর কাউকে কিছু করতে হল না। যা করার বাবাই করল। চুলের মুঠি ধরে কিল-চড় ঘুঁষি মেরে মেরে ওকে কাঠের মেঝেতে ফেলল প্রথম। তারপর একজন বীটম্যানের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে পাগলের মতো পিটতে লাগল। চাপা আর্তনাদ করে করে বাপী উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু বাবা ওর প্রাণটা বার হওয়ার আগে আর থামবেই না। গা পিঠ হাত পা কপাল নাক মুখের চামড়া ফেটে চৌচির। নাক মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। জিভে ঠোঁটে গরম তাজা রক্তের নোনা স্বাদ।

এবার চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে বাপীর। আরো অন্ধকার। গায়ে মুখে মাথায় লাঠির ঘা পড়ছে এখনো। কিন্তু আর যেন অত লাগছে না। ও কি রকম ঘুমপাড়ানি অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

সবটাই একটা দুঃস্বপ্ন কিনা বাপী ঠাওর করে উঠতে পারল না। নিজের ঘরের চৌকিতে শুয়ে আছে। কোণে ডিম-করা হারিকেন। আলোর থেকে অন্ধকার বেশি। ঘরে কেউ নেই।

পিসী রাত থাকতে ওঠে। তাই উঠে গেছে বোধ হয়। কিন্তু তা হবে কেমন করে। রাতে শোবার পর ঘরে হারিকেন জ্বলে না। তাহলে ও শুয়ে কেন?

মাথা উঁচিয়ে খোলা দরজার দিকে দেখতে গিয়ে টের পেল কেন। ঘাড়ে মাথায় কপালে মুখে আর সমস্ত গায়ে ভীষণ যন্ত্রণা। শুধু ব্যথা নয়, জ্বলেও যাচ্ছে। নাক দিয়ে গরম নিঃশ্বাস বেরুচ্ছে।

স্বপ্ন নয়। মনে পড়ছে। সাহেববাংলোর বারান্দা থেকে কে যেন এক সময় ওকে পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল। তারপর একবার দুবার চোখ তাকিয়ে খুব সম্ভব আবুর মুখখানাই দেখেছিল। জিভটা মুখের ভিতর নড়াচড়া করল, তারপর নিজের ঠোঁট দুটোও চেটে দেখল। না, রক্ত লাগছে না। কেবল জ্বালাই করছে। ঠোঁটে আর তার ওপরে নিচে কোন ওষুধ-টষুধ লাগানো হয়েছে বোধ হয়। জিভটা বিচ্ছিরি হয়ে গেল। কিন্তু তার থেকে ঢের বিচ্ছিরি নোন্‌তা রক্ত। সেটা মনে পড়তে গা টা কেমন করে উঠল। নিজের শরীরের রক্তের এমন গা-গুলনো গরম নোনতা স্বাদ, জানত না।

—ক'বার তোকে ঘরে যেতে বললাম, বসে বসে রাত করছিস কেন?

বাইরে বাবার বিরক্তি-ঝরা ভারি গলা। বাপীর দু কান খাড়া। কিন্তু যাকে বলল তার কোন জবাব শোনা গেল না···কাকে বলল? নিশ্চয় আবুকে। ও হয়ত চলে গেল। কারণ একটু বাদেই পিসীর কথা কানে এলো।

—এটুকু আর বাকি রেখে জ্যান্ত ফিরিয়ে আনলি কেন—একেবারে শেষ করে দিলেই তো হত।

আর এক প্রস্থ চাবুকের মতই বাবার ঝাঁঝালো জবাব।—শেষ করতেই চেয়েছিলাম, আর শেষ করাই উচিত ছিল—বুঝলে? কিন্তু ও শেষ হবার ছেলে নয়, তার আগে আমাকে শেষ করবে।

মুখের মধ্যে বাপীর জিভ নড়ে-চড়ে উঠল আর একবার। ঠোঁট দুটো চেটে নিল। রক্ত নয়। রক্তের থেকেও বিস্বাদ কিছু যেন ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে যত রাগ ততো ঘৃণা। বাবার গলা শুনেই এই, মুখ দেখলে হয়তো ফিনকি দিয়ে রক্তই ছুটবে।

কিন্তু মুখ রাতে দেখা গেল না। সকালেও না। সকালে যখন চা-বাগানের ডাক্তার এলো, তখনও না। রাতে বা সকালে পিসীর সঙ্গেও কোন কথা হয়নি বাপীর। রাতটা কি-রকম ঘোরের মধ্যে কেটে গেছে। পিসী ডাক্তারকে বলল, সমস্ত রাত জ্বরে ভাজা-ভাজা হয়েছে।

ডাক্তার পরীক্ষা করল। নাক, মুখ আর সমস্ত গা হাত পা উল্টে-পাল্টে দেখল। তারপর গম্ভীর মুখে বাইরে চলে গেল। একটু বাদেই বাপীর কানে মধু। পিসীকে ডাক্তার বলছে, চিকিৎসা যা করার করছি, কিন্তু আপনার উচিত পুলিশে খবর দেওয়া—ছেলেকে এ-রকম শাসন করা চলে কিনা সেটা তারা বুঝিয়ে দেবে।

ঘাড় উঁচিয়ে বাপী পিছনের দরজার দিকে তাকালো। বাবা কোথায়? বাবা কি শুনল?

দুপুরে আবু এলো। বাবা তখন আপিসে। পিসী তার পুজোর জায়গায়। আবু ঘরে ঢুকলে পিসীকে গোবরজলের ছড়া দিতে হয় বলে ভিতরে কমই ঢোকে। আজও ঘরে পা দিতেই একটা উদ্গত অভিমানে বাপী অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

পিসী শোয় বলে আবু চৌকি ছোঁবে না। হাত দুই তফাতে দাঁড়িয়ে ওকে দেখল একটু। বলল, রাগ তো হবেই তোর, আমি শালা কেমন গোলাম ভাল করে দেখে রাখ্—

বলার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা বাপীও বুঝল। আস্তে আস্তে ওর দিকে ফিরল আবার। আর মনে মনে ভাবল, চোখে যদি জল আসে তো নিজের চোখ দুটো উপড়ে ফেলবে।

আবু বলল, কাল রাতেও খবর নিতে এসেছিলাম। পিসী বলল খুব জ্বর তোর। তোর বাবার মুখের দিকে চেয়ে আর ঘরে ঢোকার সাহস হল না। এখন আপিসে কাজ করছে দেখে ঝট করে চলে এলাম।

বাপী বলল, একটা কিছু টেনে নিয়ে বোসো না—

—আর বসে না, এক্ষুনি তো জঙ্গল ঠ্যাঙাতে বেরুতে হবে। তারপর গলা খাটো করে বলল, এত বড় কাণ্ড হবে জানলে আমি তোকে বানারজুলি থেকেই পাচার করে দিতাম। সামনে ঝুঁকল একটু, কি করেছিলি রে তুই—মেয়েটার একেবারে সব্বোনাশ টব্বোনাশ করে বসে আছিস নাকি? কুকুর বেড়ালকেও তো কেউ এভাবে মারে না—

সর্বনাশ কাকে বলে বাপী তাও এখন বেশ বুঝতে পারে। একটা মেয়ের

নরম মাংসের ওপর পাগলের মতো সেই হামলার পর ভিতরের শয়তান আরো বেপরোয়া কিছুর দিকে ঝুঁকতে চাইছিল। কিন্তু মিষ্টির হাঁ-করা মুখের দম-আটকানো কান্না দেখে সেই শয়তান উধাও হয়েছিল। এখন খেদ। আবু যা বলছে তাই হলে কি হত? না-হয় একেবারে মেরে ফেলা হত ওকে। তার বেশি কি হত?

আবু চেয়ে আছে। কিন্তু বাপী কি করেছে না করেছে মুখে কি বলবে? মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, অতটা না।

দাঁতে দাঁত ঘষে আবু বলল, যদি মরদ হোস তো একদিন শোধ নিবি। তারপর একটা চোখ ছোট করে অন্য চোখে সটান তাকিয়ে শুধলো, কি-রকম শোধ বুঝলি?

কেন যেন বাপীর জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়োচ্ছে একটু। মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

কিন্তু দু মাস না যেতে রাগে আর পরিতাপে নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করেছে বাপীর। জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ারের মতোই একটা [illegible] না কোথাকার জঙ্গলে বদলি হয়ে গেল এ-খবর প্রথম আবুই দিয়েছিল ওকে। বলেছিল, অনেক দুর্নাম রটেছে বড়সাহেবের নামে, কত আর চাপা দেবে? তাই মানে মানে নিজেই তদবির করে সরে পড়ছে।

আগে কায়মনে কিছু চাইলে বাপী সেই প্রার্থনা ভগবান নামে অদৃশ্য কারো কাছে পেশ করত। সেই মারের পর ভগবানের নাম আর মুখেও উচ্চারণ করে নি। তবু নিজের বুক চিরে কাউকে রক্ত দিলে যদি এই বদলি বন্ধ হত, তাও দিত। কিন্তু কিচ্ছু করা গেল না। ওরা চললই।

এত দিনের মধ্যে বাপী আর বাংলোর কাছে আসেনি। আজও দূরেই দাঁড়িয়েছিল। দূর থেকে ব্যস্তসমস্ত বাবাকে দেখেছে। মেজসাহেব ছোট সাহেব, ফরেস্ট গার্ড, বীটম্যানদের দেখেছে।...মেয়ের হাত ধরে মেমসাহেব জিপে উঠল। সাহেব সামনে। জিপটা আসছে। বাপী রাস্তা আগলে দাঁড়িয়েছিল, ধারে সরে গেল। মিষ্টি দেখেছে ওকে। মাকেও দেখিয়েছে। জিপটা বেরিয়ে গেল। বাপী মিষ্টির দিকেই চেয়ে আছে। মিষ্টিও। সামনে বাবা, পাশে মা, তবু ওর ভয়-ভয় মুখ।

জিপ দূরে বাঁকের আড়ালে মিলিয়ে গেল। শিরায় শিরায় রক্ত ফুটছে বাপীর। মুখে বলছে না কিছু। মনে বলছে। বলছে কদ্দূর পালাবি? তোকে আর পাব না ভেবেছিস?

পরের দু বছরে বাপীর ভেতর-বার বদলেছে। পড়াশুনাটা মোটামুটি ভাবে করে গেছে। সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। পৃথিবীর যুদ্ধ তখন ঘরের কোণে এসে গেছে। চা-বাগানের ক্লাবে খবরের কাগজ আসে। রোজ সন্ধ্যার পর সেখানে গিয়ে বাইরের বেঞ্চিতে বসে বাপী কাগজ পড়ে। কিন্তু যুদ্ধের এত খবর মনে খুব একটা দাগ কাটে না। ওরও ভিতরে অবিরাম যে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে সেটা কম কিছু নয়। মিষ্টি নামে একটা মেয়ে কোথাও না কোথাও আছেই। বাপী হিসেব ভোলেনি। ওই মেয়ে বারো পেরিয়েছে এখন। কল্পনায় আর একটু বড় দেখেছে ওকে। আরো সুন্দর দেখেছে। আরো বড় হোক। আরো সুন্দর হোক। দেখা হবে। হবেই হবে।

বানারজুলির জঙ্গল তেমনিই টানে ওকে। আবু ভীষণ ব্যস্ত। তার দেখা কম মেলে। কাজে গাফিলতি নেই। তার ওপর রোজ চা-বাগানের বস্তি এলাকায় গিয়ে বাপের জন্য হাড়িয়া যোগাড় করে নিয়ে আসতে হয়। চাকরি খোয়ানোর ফলে কোন সন্ধ্যাতেই এই জিনিস থেকে ও বাপকে বঞ্চিত করে নি। জঙ্গলে বেশির ভাগ সময় একলাই ঘুরে বেড়ায় বাপী। কিন্তু এ ঘোরাটা অন্য রকম। জীবজন্তুর ভালবাসাবাসির দিকে আর চোখ নেই। এ দু'বছরেও বনমায়া তার হিসেবমতো নিখোঁজ হয়েছে আর সকলের প্রত্যাশিত সময় মতোই ফিরেছে। কিন্তু এ নিয়েও বাপী আর আগের মতো অত উত্তেজনা বোধ করে না। এমন কি চা-বাগানের আড়াই-পাতি তোলা হাসি উছলানো মেয়েদের দিকেও আর বেশি ঘেঁষে না। নিজের মনে জঙ্গলে ঘোরে। এখানকার নিস্তব্ধতা ভালো লাগে। গাছপালার সড়সড় শব্দও ভালো লাগে।

যা একটু কৌতূহল কেবল বসন্তের কোপে অন্ধ সাপুড়ে ছট্টু মিঞার বউ দুলারি আর তার ননদ মাতাল কাঁদনার বউ রেশমাকে নিয়ে। দুলারি এক রকমই আছে। পুরুষালি ছাঁদ, মুখে কম কথা, আর আবুকেও চোখ রাঙানোর সাহস। কিন্তু মাতাল স্বামীর হাতে মার-খাওয়া রেশমার মুখখানা আরো ঢলঢলে হয়েছে। বছর উনিশ এখন ওর বয়েস। আবু বলেছে মাসের মধ্যে কম করে বিশ-বাইশ দিন রেশমা এখন তার ভাজের কাছেই থাকে। কাঁদনা এসে হাতেপায়ে ধরে খুব কাকুতি-মিনতি করলে তবে যায়। কিন্তু দুদিন বাদে আবার দাগড়া-দাগড়া মারের দাগ নিয়ে পালিয়ে আসে। মদ খেলেই ইদানীং ওর নাকি বউয়ের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে মাথায় সন্দেহ গজাতে থাকে। তারপর মেরে শুইয়ে না ফেলা পর্যন্ত সন্দেহের পোকাগুলো মাথা থেকে সরে না। রেশমা আর নাকি তার মরদের ঘরে যাবেই না পণ করেছে।

এত কথা বাপী আবুর মুখ থেকে শুনেছে। আর কাঁদনার সন্দেহ কতটা সত্যি আবুর মুখের দিকে চেয়ে তাই আঁচ করতে চেষ্টা করেছে। ওদের নিয়ে কৌতূহলের আরো কারণ, দুলারি আর রেশমা দুজনেই এখন রোজগারের রাস্তায় নেমে পড়েছে। সাপের ঝুড়ি আর বাঁশি নিয়ে দুজনে একসঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সাপ-খেলা দেখাতে বেরোয়। দু বছরে অন্ধ ছট্টু মিয়ার কাছে বিদ্যেটা রপ্ত করে নিয়েছে। সকালে ঘরের কাজ থাকে, রান্নাবান্না থাকে, খুব বেশি ঘুরতে পারে না। কিন্তু দুপুর পেরুনোর আগে অনেক দূরে দূরে চলে যায় ওরা। ভয়-ডর নেই। দুলারির তো একেবারে নেই।

ওরা কোথাও সাপ খেলা দেখাচ্ছে দেখলে বাপী গুটিগুটি না এগিয়ে পারে না। শুধু বাপী কেন জোয়ান বয়সের অনেকেই এগোয়। দুলারি আর রেশমা দুজনেই ঘাগরা পরে বেরোয়। সেই ঘাগরা ওদের হাঁটু ছাড়িয়ে এক বিঘতও নামে না। গায়ে রংবেরংয়ের আঁট কোর্তা। ছট্টু মিয়ার, খেলা অনেক দেখেছে বাপী। সেই একই খেলা এদের হাতে যেন অন্যরকম। গাল ফুলিয়ে সাপুড়ের বাঁশি বাজিয়ে পালা করে খেলা দেখায়। সাপ ডাইনে বাঁয়ে দোলে। হাঁটু মুড়ে বসে ওরাও তেমনি দোলে। ছোবল মারার মতলবে সাপ সামনে পিছনে দোলে। ওদের তখন উত্তেজনা বাড়ে। ওরাও সামনে পিছনে দোলে। ছোবল খাবার জন্য মাটিতে উল্টো করে হাত পাতে, আবার ছোবল পড়ার আগে পলকে হাত সরায়। এই করে সাপের উত্তেজনা বাড়ায়। নিজেদের আর যারা গোল হয়ে দাঁড়ায়—তাদেরও। সাপের ছোবল এক-বার না একবার লেগেই যায়। ঝরঝর করে রক্ত পড়ে। তখন ঠাণ্ডা হয়ে পাতা আর শেকড়বাকড় চিবিয়ে চটপট লাগিয়ে দেয়।

বাপী লক্ষ্য করেছে ছোবল খাবার লোভ রেশমার থেকেও দুলারির বেশি। অন্ধ ছোট্টু দাদাকে যত বুড়োই দেখাক, দুলারির বয়েস এখন বড় জোর বাইশ। কিন্তু সাপ খেলা দেখানোর সময়েও মুখখানা করে রাখে বত্রিশের মতো। রেশমার মতো হাসে না। কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে দোলে ওর থেকেও বেশি। খপ করে একসময় দু-হাতে সাপের গলা চেপে ধরে বুকের কাছে নিয়ে আসে। সাপের মুখ নিজের মুখের কাছে। সাপের চেরা-জিভ চিড়বিড় করে। দুলারিও তখন ঘন ঘন জিভ বার করে আর টেনে নেয়। যেন জিভেই ছোবল নেবার বাসনা। বাপীর কেন যেন তখন সাপের চেয়েও ওই দুলারিকেই বেশি ভয় করে।

পরীক্ষা এসেই গেল। পড়াশুনায় আপনা থেকেই একটু মন বসেছে।

তারই মধ্যে আচমকা দুর্যোগ। যে 'মালোরি' জ্বরের ভয় পিসীর, তাই তাকে খেয়ে বসল। পাঁচদিনের মাথায় ধুপ করে মরে যেতে বোঝা গেল ওটা মালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। ডাক্তারের মুখে ওই নাম বাপী পরে শুনেছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার মাত্র আট দিন বাকি তখন।

বাবা কাঁদল না। পাথর হয়ে থাকল। বাপীও কাঁদল না। বুকের একখানা হাড় খসে গেল। তবু না। আছড়ে পড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। তবু না। কেবল আবুর চোখে জল দেখেছিল।

পরীক্ষায় ছেদ পড়ল না। পরীক্ষা শুরু হল, শেষও হল। গত দু বছরের মধ্যে বাবার সঙ্গে বাপীর কদিন মুখ-দেখাদেখি হয়েছে হাতে গোনা যায়। পিসী চোখ বোজার পর মুখ-দেখাদেখি দু বেলাই হচ্ছে এখন। বাবা মোটামুটি রাঁধতে জানে। বাপীর হাতে ছেড়ে দিলে রান্না একরকম সে-ও করতে পারে। কিন্তু বাবা মুখ বুজে নিজেই রান্না করে। বাপী দেখে। কিছু বলে না। পরীক্ষা হয়ে যাবার পর বাবা সকালের বাজারটা ওকে মাঝে মাঝে করতে দেয়।

একই বাড়িতে দুটি প্রায় অচেনা বাসিন্দা দুজন। সকালে বাবার আপিস থাকে। আগে খেয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু রাতে বা ছুটির দিনেও খাবার সময় বাপী দূরে সরে থাকে। বাবা বুঝে নিয়েছে ও তার সঙ্গে বসে খাবে না। তাকে সামনে দেখলে আজও বুকের একেবারে তলা থেকে একটা বিতৃষ্ণা ঠেলে ওঠে বাপীর। বাবা তাও বুঝতে পারে কিনা বাপী জানে না। বাবা ডাকে না। ওরটা সরিয়ে রেখে নিজে খেয়ে চলে যায়।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরুল। বাবা এতটা আশা করে নি নিশ্চয়। আর বাপী ফল নিয়ে মাথাই ঘামায় নি। পাশ করবে জানত।

...ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। খবর আসার পরদিনই বাবার মুখ দেখল। এ-ঘরে এসে বলল, বড়সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে, কাল বিকেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। আমি নিয়ে যাব।

কে এখন বড়সাহেব বাপী সে-খোঁজও রাখে না। কি কথা হয়েছে বা কেন দেখা করতে যেতে হবে না বুঝে মুখের দিকে চুপচাপ চেয়ে রইল।

বাবা বলল, এ জঙ্গলে আর একজন ক্লার্ক নেওয়া হবে সেটা আগেই ঠিক হয়ে ছিল। বড়সাহেবকে তোর কথা বলে আমি আটকে রেখেছিলাম। ম্যাট্রিক পাশ চাই। আজ রেজাল্টের কথা বলতে সাহেব কালই দেখা করতে বললেন।

কথা শেষ করে বাবা চলে যাচ্ছিল, বাপী বলল, আমি কলেজে পড়ব।

হরিবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। ছেলের মুখ এবারে ভালো করে দেখে নিলেন। সেই পুরনো বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা নিজের মুখে আরও কত এঁটে বসেছিল বাপী জানে না। গলার স্বরেও কিছু প্রকাশ পেয়েছে কিনা বলতে পারে না।

হরিবাবুর মুখে কঠিন আঁচড় পড়তে লাগল। গলাও অসহিষ্ণু ভারী।—কলেজ মানে তো সেই জলপাইগুড়ি, সেখানে হস্টেলে থেকে পড়ার ইচ্ছে?

বাপী চুপ।

—আমার সে ক্ষমতা নেই।

বাপীর জবাবও এবারে স্পষ্ট।—অর্থাৎ একবার সেখানে গিয়ে দেখব কোন ব্যবস্থা হয় কিনা।

হরিবাবু থমকালেন। মুখের ওপর এতকাল কোন কথা শুনে অভ্যস্ত নয়। তাঁর চোখে এটা অবাধ্যতা। কিন্তু সামনে যে দাঁড়িয়ে সে এখন তাঁর চেয়েও তিন আঙুল ঢ্যাঙা। দু বছর আগের সেই মারের পর থেকে ছেলে বদলেছে এ তিনি লক্ষ্য করেছেন। শাসন নিষ্ফল হয় নি ভেবেছেন। দিদি মাঝে না থাকাতে বাপ-ছেলের ফারাকটা এখন আরও বেশি স্পষ্ট। কিন্তু ছেলের এই মুখে আর এই স্পষ্ট জবাবে যেন আরও কিছু লেখা আছে।

অসহিষ্ণুতা চাপতে পারলেন না।—সেখানে গিয়ে ব্যবস্থা হয় কিনা দেখার জন্য এখানকার চাকরি বসে থাকবে?

বাপী নিরুত্তর।

এই নীরবতার মধ্যেও ধৃষ্টতা দেখলেন হরিবাবু।—ম্যাট্রিক পাশ করে খুব লায়েক ভাবছিস নিজেকে, কেমন? স্টুপিড। এখানে আমার ব্যবস্থাই ব্যবস্থা এ যেন মনে থাকে!

থমথমে মুখে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

পরদিন খেয়ে-দেয়ে সকাল দশটা নাগাদ আপিসে বেরুনোর জন্য তৈরি হয়ে ছেলেকে কাছে ডাকলেন। বললেন, চারটে বাজার মিনিট পনের আগে আপিসে আসতে হবে, সেখান থেকে আমি সঙ্গে করে বড়সাহেবের বাংলোয় নিয়ে যাব।

বাপী চুপচাপ অন্য দিকে চেয়ে রইল।

আপিসে বেরুনোর সময় মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে চান হরিবাবু। আজ রাখা গেল না। চাপা গর্জন করে উঠলেন, আমার কথা কানে যাচ্ছে?

বাপী এবারে সোজা বাবার মুখের দিকে তাকালো। ঠাণ্ডা মুখ। ঠাণ্ডা

গলা।—তুমি আর না পড়াতে পার, পড়াবে না। এভাবে জুলুম করছ কেন?

হরিবাবু ঠিক দেখছেন? ঠিক শুনছেন? পায়ে এখন চটি নেই, ফিতে বাঁধা জুতো। তাই খুলে হাতে নেবেন? কিন্তু ছেলের এই মুখের দিকে চেয়ে কটা মুহূর্তের মধ্যেই আবার তাঁর মনে হল, আগের সেই দিন আর নেই। কতটা নেই ঠাওর করে উঠতে পারলেন না। ছেলের ঠাণ্ডা চাউনির ভিতর থেকে কিছু ঠিকরে পড়ছে মনে হল তাঁর। উদ্গত রাগ ঠেলে তল করলেন।

—আচ্ছা, বড়সাহেবের সঙ্গে দেখাশুনা কথাবার্তা হোক। তারপর আর কিছু ভাবার থাকে তো বিকেলে ঘরে এসে ভাবা যাবে।

হরিবাবু হন হন করে চলে গেলেন।

বাপী তার এক ঘণ্টার মধ্যে স্নান সারল। খাওয়া সারল। অন্য দিন দেরি হয়। আজ তাড়া।

এরই মধ্যে আবু এসে হাজির। খুশি উপছানো মুখ।—তোর পেটে পেটে এত যে আমাকে খবর পর্যন্ত দিলি না—অ্যাঁ?

—কি খবর?

—আজ বড়সাহেবের সঙ্গে তোর মোলাকাত হবে, কাল পরশু থেকে তুই আমাদের ছোট কেরানীবাবু। শুনেই ছুটে চলে এলাম আমি—

বাপীও হাসছে অল্প অল্প।—কার কাছে শুনলে?

—একবার আপিসে গেছলাম, তোর বাবাই ডেকে খবরটা দিলেন। আমি তোকে এর পর কি বলে ডাকব রে—হ্যাঁ? লোকের সামনে না হয় আপনি-টাপনি করে বলব—কি বলিস?

—আগে কাজ হোক, তারপর ভেবো। চকিতে ভেবে নিল কি।—বাবা নিজে ডেকে তোমাকে শুধু এই খবরটা দিল, না আর কিছু বলল?

—খবরটা জানিয়ে আমাকে বললেন, সাড়ে তিনটের সময় ঘরে গিয়ে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসিস। চারটের বাংলোয় বড়সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা।

বাপী হাসছে মনে মনে। বাবার তাহলে নিজের হুকুমের ওপর ভরসা একটু কমেছে। মনে মনে নয়, বাইরেও হাসল বাপী। বলল, ওই বাংলোর বারান্দাতেই বাবা আমাকে মেরে মেরে একেবারে শুইয়ে ফেলেছিল—নিজের রক্তে গড়াগড়ি খাচ্ছিলাম আমি।

আবু থতমত খেল একটু।—দূর, ছ বছর আগের সেই মার তোর গায়ে লেগে আছে, না সেই বড়সাহেব আছে। এই লোকের কাছে কাজের কদর আছে বলেই তো তোর বাবার সুবিধে হয়েছে।

বাপীর মজাই লাগছে। আবার বলল, আর পরদিন দুপুরে এসে তুমি বলেছিলে, যদি মরদ হোস্ একদিন শোধ নিবি—আর আজ ছোট কেরানী হয়ে বসছি দেখেই এত খুশি তুমি ?

এবারে আবুকে ঢোঁক গিলতে হল।—আচ্ছা ছেলে তো তুই, সেসব কথা এখনও মনে করে বসে আছিস। তারা এখন পৃথিবীর কোন্ রাজ্যে আছে তার কিছু ঠিক আছে ? তাছাড়া খোদার মর্জি হলে ছোট কেরানী হলেও শোধ নেবার দিন আসতে পারে। খুশির দিনে ও-সব মাথায় রাখিস না, অনেক কাজ এখন, যাই—ঠিক সাড়ে তিনটের এসে যাব, রেডি থাকিস··

চলে গেল।···না ওকেও কিছু বলা গেল না। বলা নিরাপদ ভাবল না। সমূহ সমস্যার সমাধান পিসীই করে রেখে গেছে। নইলে আবুকেই বলতে হত। তার কাছ থেকেই সাহায্য চাইতে হত। তার দরকার হল না, বাঁচোয়া। আবু যে ওকে ভালবাসে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাপীর মতলব জানলে ওকে আগলাবার জন্য কি কাণ্ড করে বসত, কে জানে। হয়ত বাবার কাছেই ছুটত আবার। চাকরি ওর কাছে মস্ত জিনিস এখন।

···কি করবে না করবে বাপী গত রাতেই ঠিক করে ফেলেছিল। দরকার শুধু নগদ কিছু টাকার। বানারহাট পৌঁছুতে পারলে সেখান থেকে জলপাইগুড়ি পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ মাইলের বেশি নয়। ভাড়া সেই দিনে বড়জোর এক টাকা। খুব কম হলেও আরও তিন-চার টাকা বাপীর হাতে থাকা দরকার। সপ্তাহের বাজার আর টুকিটাকি কেনার জন্য বাবা ওর হাতে পাঁচ টাকা দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বাপী বরং ওই পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল হেঁটে যাবে, তবু ও-টাকার এক পয়সাও ছোঁবে না। আবুকে বলে দেখবে ভেবেছিল পাঁচটা টাকা ধার দিতে পারে কিনা।

কিন্তু গত রাতের মধ্যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। চৌকির নিচে পিসীর ছোট বাক্সটার কথা মনে পড়ল। চাবি বাপীর কাছেই। পিসী মারা যাবার পরে এ পর্যন্ত আর খুলে দেখা হয় নি ওতে কি আছে না আছে। যদি কিছু থাকে তা বাপীর ছাড়া আর কার ?

জামাকাপড়ের তলা থেকে হাতে তৈরি ছোট্ট থলে বেরুলো একটা। বেশ শব্দ না করে বিছানায় উপুড় করে ফেলল। সবই কাঁচা টাকা, আর একটা আধুলি। মোট সাড়ে সতের টাকা। বাপীর কাছে ঐশ্বর্য। টাকা থলের পুরে ওটা কপালে ঠেকাল। ভগবান-টগবান নয়, পিসীকে প্রণাম করল। তারপর সমস্ত রাত আর সকাল কাটল এই দুপুরের প্রতীক্ষায়।

সঙ্গে যা নেবার চটপট গুছিয়ে নিল। টিনের ছোট স্যুটকেসে ধুতি, শার্ট, গেঞ্জি একটা গরম সোয়েটার। শতরঞ্জী মোড়ানো পুঁটলিতে শুধু নিজের পুরনো কম্বল, রঙিন চাদর একটা, আর গায়ের আলোয়ান। বিছানা-বালিশের বিলাসিতা মন থেকে ছেঁটে দিয়েছে। ওই টিনের স্যুটকেসই দিব্বি মাথায় দিয়ে শোয়া যাবে।

বারোটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল। বাবার বাজারের টাকা তার বিছানায় বালিশ চাপা দিয়ে রেখে এসেছে।···আবু আসবে সাড়ে তিনটেয়। ঘরে শেকল-তোলা দেখে ভাববে ও আগেই বাবার আপিসের দিকে চলে গেছে। আপিসে না পেয়ে আবার ঘরের দিকে ছুটবেই। মোট কথা, ও নেই জানাজানি হতে বিকেল চারটে গড়াবে। ততক্ষণে ও অনেক দূরে।

জঙ্গল দিয়ে নয়, সোজা রাস্তা দিয়েই চলল। জঙ্গলে আবুর সঙ্গে ফের দেখা হয়ে গেলে মুশকিল। ভয় শুধু ওকে। রাস্তায় আর কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই বা। কে কি বুঝবে? বেরিয়ে যখন পড়েছে, আর ওকে ফেরাবার সাধ্য কারও নেই।

বরাত ভাল। আধ মাইল না যেতে এক ঠেলা-অলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুটো লো.ক ঠেলায় লোহালক্কর চাপিয়ে বানারহাট যাচ্ছে। বাপীর কাছে প্রত্যেকটা পয়সা দামী এখন। তবু দু আনায় রফা করে টিনের স্যুটকেস আর শতরঞ্জীর পুঁটলি ঠেলায় তুলে দিল। ঝাড়া হাত-পায়ে ওকে দেখলেও এখন আর কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।

আরও মাইলখানেক এগিয়ে বাপী মনে মনে নিজের বিবেচনার তারিফ করল। সামনের দিক থেকে আসছে সাপুড়ে ননদ-ভাজ। দুলারি আর রেশমা। পরনে খাটো ঘাগরা, মাথায় ছোট বড় সাপের ঝুড়ি। ও-দিক থেকে খেলা দেখিয়ে ফিরছে। রোদের তাতে দুজনারই লালচে মুখ।

ওকে দেখে রেশমা দাঁড়িয়ে গেল। তাই দুলারিও। মরদের হাতে ঠেঙানি খেয়ে রেশমা কাঁদে কেমন বাপী জানে না। কিন্তু হাসে বেশ।

—ভরদুপুরে কোথায় গো বাপী-ভাই?

আবুর সঙ্গে এত খাতির, বয়সেও বছর দুই বড় হবে, রেশমা ওকে তাই বাপী-ভাই বলে ডাকে। দুলারির মুখে এযাবৎ কোন ডাক শোনে নি।

—এই সামনে। তোমাদের আজ এত বেলা, দূরে গেছলে বুঝি?

—হ্যাঁ গো, আজ ভাল রোজগার হল। কদিনের মধ্যে তোমার বীটম্যান সাহেবের দেখা নেই কেন?—বলো, দাদা খোঁজ করছিল।

দুলারির কপালে ভ্রূকুটি।—বলো রেশমা খোঁজ করছিল।

নিরীহ মুখে বাপীও একটু মজাই করল। বলল, খানিক আগে আমার ওখানেই ছিল, এতক্ষণে বোধ হয় তোমাদের ঘরেই বসে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে রেশমা বলল, চল ভাবী, পা চালিয়ে চল—বেলা বাড়ছে।

গম্ভীর চোখে রেশমার মুখে ঝপ করে একটা ছোবল বসাবার মত চাউনি দুলারির।

ওরা এগুলো। বাপী দাঁড়িয়ে দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাও পেল। এক সঙ্গে দুজনেই ওরা পিছন ফিরে তাকালো। বাপী ঘুরে তাড়াতাড়ি পা চালাল।

··মাতাল ঠেঙাড়ে সোয়ামীর সঙ্গে রেশমার ছাড়াছাড়ি এক-রকম হয়েই গেছে যখন, আবুটা ওকে নিকে করে ফেলছে না কেন বাপী ভেবে পায় না। ওদের সমাজে এটা কঠিন ব্যাপার মনে হয় না।···তবে যত সেয়ানাই হোক, আবুর ভেতরটা নরম। হয়তো ওই মাতাল কাঁদনার জন্যও ওর একটু দরদ আছে। কিংবা দুজনাই এখন ওরা জঙ্গলের চাকুরে বলে হয়তো চক্ষুলজ্জায় পেরে উঠছে না।

বানারহাটে পৌঁছে প্রথমেই নিশীথের মামা-বাড়িতে এলো বাপী। নিশীথ সেন। ক্লাসে ওর সঙ্গেই সব থেকে বেশি খাতির। নিশীথ সেন জন্ম থেকেই বলতে গেলে দিদিমার কাছে মানুষ। বাবা-মা কলকাতায়। বাবা সেখানে কবিরাজ। অন্য ভাই-বোনেরা তাদের কাছেই থাকে।

এ-বাড়িতে বাপীর আগেও যাতায়াত ছিল। শুনল, নিশীথ আগের দিনই জলপাইগুড়ি চলে গেছে। সেখানে ওর আর এক মামা থাকে। কাঠের কারবারী। ভাল অবস্থা। এখন সেখানেই উঠেছে। তারপর হস্টেলে থেকে কলেজে পড়বে। জলপাইগুড়ির মামার অনেকগুলি ছেলেপুলে। সেখানে থাকলে ওর পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে।

ঠিকানা নিয়ে বাপী আবার বেরিয়ে পড়ল।

সমস্যার সমাধান এত সহজে হয়ে যাবে কল্পনাও করে নি। কলেজে পড়ার জন্য ও কিভাবে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে শুনে নিশীথও প্রথমে বেশ ঘাবড়েছিল। বাপীও আই. এস-সিই পড়বে। সায়েন্সের মাইনে সাত টাকা। ভর্তির ফী ছাড়াও অ্যাপারেটাসের জন্য কশান মানি পনেরো টাকা জমা রাখতে হয়। হস্টেলে থাকা-খাওয়া বাবদ এ-সবের ওপর মাসে আরও চল্লিশ টাকার ধাক্কা।

মুশকিল আসান এক দিনের মধ্যে ওই নিশীথই করে ফেলল। এখানকার মামাও নিশীথকে বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করার জন্য বকাঝকি করেছিল। ও

রাজি হয় নি। মামা-মামীর সঙ্গে কথা বলে তাদের একচৌকি ছেলেমেয়ে অর্থাৎ দুটি ছেলে আর দুটি মেয়েকে পড়ানোর ভার বাপীর ওপর চাপিয়ে দিল। মামা-মামীকে বোঝালো ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করা বন্ধু অল্পের জন্য স্কলারশিপ মিস করেছে। এমন মাস্টার পাওয়া ভাগ্যের কথা। বিনিময়ে বাপী এখানেই থাকবে খাবে আর দশ টাকা মাইনে পাবে।

মামার কাছ থেকে ছ মাসের মাইনে আগাম পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। পনের টাকা বাপীর কাছে আছে, বাকি যা লাগে নিশীথ ধার দিল। কলেজে ভর্তি হওয়ার সমস্যা মিটল।

কিন্তু কদিনের মধ্যেই বাপীর ক্লান্তি এসে গেল। ওর কল্পনা যে সাম্রাজ্যের সিংহাসনের দিকে ছোটে, বাস্তবটা সে তুলনায় একটা কুৎসিত ঘায়ের মতো। নিশীথের মামার ছেলে-মেয়েদের প্রতিও ভিতরটা বিরূপ। যুদ্ধের চাকরিতে লোক নেওয়া হচ্ছে। ভাবে সব ছেড়েছুড়ে ওতেই ঢুকে পড়ে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে কেমন হয়। আবার নিজেই জানে, সব সম্ভাবনার তাহলে ভরাডুবি হয়।

দিন-কুড়ির মধ্যে কলেজের আপিসে ডাক পড়ল। কেন, বাপী কল্পনা করতে পারে নি। বানারজুলি থেকে বাবা আপিসে চিঠি দিয়েছে তার ছেলে ওখানে ভর্তি হয়েছে কিনা। হয়ে থাকলে কোন্ ঠিকানায় আছে। জবাবে আপিসের কেরানীবাবু ওর ঠিকানা জানিয়ে দিয়েছে, আর ওকে জিজ্ঞেস করেছে, বাবা ছেলের ঠিকানা জানে না, এ কেমন কথা?

বাপী যা-হোক জবাবদিহি করে চলে এসেছে।

মাসের শেষে ওর নামে বাবার কাছ থেকে তিরিশ টাকা মনিঅর্ডার। কুপনে শুধু লেখা মাসে-মাসে তিরিশ টাকার বেশি পাঠানো সম্ভব নয়।

মাসে তিরিশ টাকা পাঠানোই বাবার পক্ষে কতখানি বাপী তা জানে। টাকার জন্য নয়—সেই ঘৃণা, সেই বিদ্বেষ। টাকা নিয়ে তক্ষুনি পোস্ট অফিসে ছুটল। গাঁটের পয়সা খরচ করে তিরিশ টাকাই ফেরত পাঠাল। কুপনে লিখল, টাকার দরকার নেই। কারও কাছ থেকে কোন আশা নিয়ে সে ঘর ছেড়ে আসে নি।

পরের মাসের মাঝামাঝি টেলিগ্রাম। কাউকে দিয়ে আবু তার পাঠিয়েছে; হরিবাবুর অবস্থা সংকটাপন্ন। চলে এস।

এবারে বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে বাপীর। কিন্তু তবু অভিমান। তবু বিদ্বেষ। যাবে? যাবে না।... যাবে?

...সেই দিনই বানারজুলি পৌঁছেছে। তার পর দিন বেশি রাতে বাবা চোখ বুজল। হঠাৎ বুকের বাঁ দিকে প্রচণ্ড ব্যথায় শয্যা নিয়েছিল। তার পরেই এমন অবস্থা যে স্থানীয় ডাক্তার হাসপাতালে সরাতেও সাহস করে নি। আগের সমস্ত রাত এমন কি পরদিন বিকেল পর্যন্ত বাবার পুরো জ্ঞান ছিল। বাপী এসে দাঁড়াতেই বাবা বড় বড় চোখে ওকে দেখেছে। সেই বড় বড় চোখের জল দুই গালে গড়িয়েছে। বাবা যেন অব্যক্ত আকৃতিতে ওকে সব ভুলে যেতে বলছে।

বাপীর ভিতরটা দুমড়ে ভেঙেছে।' সমস্ত রাত বসে তার বুকে হাত বুলিয়েছে। বাবা তারপর পরম তৃপ্তিভরে থেকে থেকে ওকে দেখেছে।

পরদিন ভোররাতে সব শেষ। পিসী যেতেও বাপী কাঁদতে পারে নি। এখনও পারল না। পিসীর বুকে আছড়ে পড়ে যেমন কাঁদতে ইচ্ছে করেছিল, বাবার দিকে চেয়েও তেমনিই একটা ইচ্ছে ভিতর থেকে ডুকরে উঠছে। এত দিনের সব ঘৃণা আর বিদ্বেষ ফিরে ওকেই চাবুক হেনেছে।

বাবার কাজ মেটার পরেও কিছুদিন থেকে যেতে হল। এবারের বড় সাহেব সত্যি ভাল লোক। বাবার প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের বারোশো কত টাকা ওর হাতে তুলে দিলেন। মালপত্রসহ ওকে বানারহাট পৌঁছে দেবার জন্য জীপও দিলেন।

সঙ্গে আবু। বানারহাট পর্যন্ত ওর সঙ্গে যাবে। কিন্তু মুখে কথা নেই।

যেতে যেতে বাপী এবারে লোভীর মতই বানারজুলির জঙ্গল দেখছে। আবার সামনে তাকিয়েই জীপটা দাঁড়াতে বলল। পথের ধারে গাছের গুঁড়িতে বনমায়া বাঁধা। ও সামনে যেতেই গলা দিয়ে শব্দ বার করে শুঁড় উঁচিয়ে সেলাম জানালো। বাপী ওর কপালে আর শুঁড়ে বারকয়েক হাত বুলিয়ে আবার ফিরে এলো। চোখের কোণ দুটো বড় বেশি শিরশির করছে। গেলবারে বানারজুলি ছাড়ার সময় এমন হয় নি।

একটু সহজ হবার জন্যেই আবুকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার বিয়েটা হচ্ছে কবে?

বিরক্ত মুখ করে আবু জবাব দিল, বিয়ের নিকুচি করেছে। শালার মরদ ঘরে থাকতে তার বিবিকে বিয়ে করা এত সোজা!

বাপী হেসে ফেলল। কিন্তু ভেতর হাল্কা হল না। আবুর সঙ্গে, এই বানারজুলির সঙ্গে, বানারজুলির জঙ্গলের সঙ্গে, বানারজুলির আকাশ-বাতাসের সঙ্গে কি-যে নাড়ির যোগ এ আগে জানত?

সেই যোগ ছিঁড়ে আজ ও ভেসে চলল। একেবারে একা।

জলপাইগুড়ি ফিরে বাপীর প্রথম কাজ ঠাঁইবদল। নিশীথের মামা-বাড়িতে ওই দু মাসের মধ্যেই হাঁপ ধরে গেছল। পড়ার সময় ছাড়াও ছোট চারটে ছেলেমেয়ে ছেঁকে ধরে থাকে ওকে। ওদের সঙ্গে খেলতে হবে, গল্প শোনাতে হবে। তাছাড়া নিশীথের মামা-মামীরও বাড়তি ফাইফরমাসের কামাই নেই।

নিশীথের সঙ্গে হস্টেলে থাকার বাসনা ছিল বাপীর। হাতে সাড়ে বারোশ'র ওপরে টাকা তখন অনেক টাকা। কিন্তু মাসে সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশ টাকা খরচ ধরলে দু' বছরের মধ্যে ও-টাকা ফুরোবে বাপীর সে-হিসেব আছে। তাই নিশীথকে বলল, খাব-দাব না, তোর মামাতো ভাইবোনদের পড়ানোর টাকা কতটা বাড়াতে পারিস দেখ্, নইলে আই. এসসি পাশ করতেই জমা টাকা শেষ হবে।

নিশীথের কানে কিছু ঢোকালে ভালই ঢোকে। কোমর বেঁধে মামা-মামীর সঙ্গে ফয়সলা করে এলো। বন্ধুর জন্য মাসে পঁচিশ টাকাই দাবী ছিল তার— একটা জোয়ান ছেলের দু'বেলার ভাত আর জলখাবার দিতে মাসে পনের টাকাও খরচ হত না নাকি মামার? যুদ্ধের বাজারে খাওয়া-পরার খরচ বাড়ছে না?

মামা-মামী মাসে কুড়ি টাকায় ফয়সলা করল। সেই সঙ্গে বিকেলের জলখাবার যোগান দিতেও রাজি হল। ছেলেমেয়ের রেজাল্ট ভালো হলে পরের বছরে আরো মাইনে বাড়ানোর কড়ার করে নিশীথ হস্টেলে ফিরল। এবারে আর এক প্ল্যান মাথায় ঘুরছে তার। এখন পুঁজি থেকে মাসে তিরিশ টাকা খরচ হলেও দু' বছরে আই. এসসি শেষ করার পর বি. এসসি পড়ার পুরো টাকা হাতে থাকে না। তাই বাপীকে পরামর্শ দিল, তোর ওই কামানো মাথা নিয়ে প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা কর, কলেজের মাইনে সাত টাকা আর হস্টেলের সীট-রেণ্ট ছ' টাকা যদি মাপ হয়ে যায়, তাহলে বি. এসসি পাশ করা পর্যন্ত আর ভাবনা থাকবে না।

কিন্তু বাপী রাজি হল না। এক পিসীর কাছে ভিন্ন এযাবৎ আর কারো কাছে মুখ ফুটে কিছু চায় নি। এ-প্রস্তাব সরাসরি ভিক্ষে চাওয়ার মতো। কিন্তু নিশীথ নাছোড়বান্দা। হস্টেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে ধরে ওর সীট-রেণ্টের ছ'টা টাকা বাঁচিয়ে ছাড়ল।

বাপীর এতেও খারাপ লাগল খুব। তবে এবারে অনেকটা নিশ্চিন্ত বটে। আবু রব্বানী বানারজুলির বাড়িটা কি করবে কে জানে। বাপী ওটা ওকে বিক্রী করে দিতে বলেছিল। শুনে রাগ-রাগ মুখ করে আবু বলেছে, তুই কি একেবারে বিবাগী হতে যাচ্ছিস নাকি—ছোট-বড় দেড়খানা কাঠের ঘর বিক্রী করে কি ঐশ্বর্য পাবি শুনি? তার থেকে বাপ আর পিসীর স্মৃতি থাক না—

বলেছে ঠিকই। তবে দেড় ঘরের সামনে পিছনে আর পাশে জমি খানিকটা আছে। কিন্তু তারও কি-বা দাম তখন। পিসীর মুখে গল্প শুনেছিল, বাবা যখন ওখানে ঘর তুলেছে, সর্বসাকুল্যে খরচ পড়েছিল নব্বুই টাকা। জমির দাম ধরে। কাঠ জঙ্গল থেকে ওমনি পেয়েছিল বাবা। শুধু ঘরামি আর মিস্ত্রীর খরচ। তারাও আবার জঙ্গলেব খাতিরের কণ্ট্রাক্টারের লোক।

আবুর মন বুঝে বাপী ওকে ভাড়াটে পাওয়া যায় কিনা দেখতে বলে এসেছে। মাসে পাঁচ-সাত টাকা যা মেলে। ও-সব জায়গায় তাও পাওয়া সহজ নয় জানে। যতদিন না ভাড়াটে জোটে আবুকে বাড়িটা দেখাশুনা করতে বলেছে, আর সম্ভব হলে রাতে ওখানে ওকে থাকতে বলেছে।

খুব একটা বড় ভাবনা বাপীর মাথার ওপর কিছু নেই এখন। তবু ভালো লাগে না। বাপীর কিছুই ভালো লাগে না। না নিজে পড়তে, না নিশীথের মামাতো ভাইবোনগুলোকে পড়াতে। বয়েস সবে সতের এখন। কলেজে ওর বয়সী বা ওর থেকে বড় ছেলেরা কত রকমের হৈ-চৈ ফূর্তিতে দিন কাটায় কিন্তু বাপীর ভিতরের বয়েসটা ওদের সকলকে ছাড়িয়ে ঢের এগিয়ে গেছে ও-সব খেলাধুলো হৈ-চৈ ওর জন্য নয়। তার থেকে নিরিবিলি ভালো লাগে। ভাবতে ভাল লাগে। ভাবনার মধ্যে অনেক বড় হতে ভালো লাগে। বয়সে নয়, ক্ষমতায়। এমন ক্ষমতা, যার কোনো শেষ নেই। তল-কূল নেই। কেরানীর ছেলে বলে যারা নাক সিঁটকেছে, যারা চোখ তাকিয়ে দেখে নি, তাদের চোখ ঠিকরে যায় এমন বড়।

ছুটির দিনে বা অন্য দিনেও ফাঁক পেলেই বিকেলের দিকে একলা দু'-আড়াই মাইল পথ হেঁটে করলা নদী বা তিস্তার ধারে এসে বসে থাকে। করলার থেকে তিস্তার দিকটা বেশি নিরিবিলি। সামনে সরু খালের মতো তিরতিরে জল। হাঁটুরও আধখানা ডোবে না। তার ওধারে ধু-ধু বালুর চর। তার শেষে ডুয়ার্স-এর জঙ্গলের রেখা। সতৃষ্ণ চোখে বাপী সেই সবুজ রেখার দিকে চেয়ে থাকে। তখন বানারজুলি ওকে ভয়ানক টানে। খাল পেরিয়ে কতদিন সেই

চড়ার ওপর দিয়ে ওই জঙ্গলের রেখা লক্ষ্য করে কতদূর হেঁটে চলে গেছে ঠিক নেই। কিন্তু ওই সবুজ রেখা ঠিক তেমনি দূরে।

মাথার ওপর দিয়ে আজকাল ঘন ঘন এরোপ্লেন উড়ে চলে যায়। বাপী কাগজ পড়ে রোজ। পৃথিবীর যুদ্ধ এখন ঘরের কোণে। কিন্তু মাথার ওপর এরোপ্লেন দেখলে ওর যুদ্ধটুদ্ধ মনে থাকে না। মনটা ঢের ওপর দিয়ে উড়ে চলতে থাকে।

...বিষম চমকের দিনের সেই শীতের বিকেলেও বাপী তিস্তার পারে একলা বসে। যুদ্ধের বোমা কলকাতায় পড়েছে। রেডিও মারফৎ সর্বত্র সেই গায়ে কাঁটা দেওয়া খবর এসে গেছে। অনেকে বলাবলি করছে জাপানীদের দলে ভিড়ে সুভাষ বোসের এই কীর্তি। তার আজাদ হিন্দ ফৌজ নাকি ভারতের কোন কোন জায়গা দখল করেছে। এবার বার্মা থেকে কলকাতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এটা তারই সূচনা।

দিকে দিকে আতঙ্ক। এমন কি এই জলপাইগুড়িতেও। কিন্তু বাপীর ভিতরে আতঙ্কের বদলে অন্য রকম উত্তেজনা। আর মাথার ওপরের ওই এরোপ্লেনের মতো তার উদ্ভট কল্পনা পাখা মেলে দিয়েছে। সুভাষ বোস আর যা-ই করুক দেশের ক্ষতি কক্ষনো করতে পারে না। বোমা ফেললেও না। গত বছরের জানুয়ারিতে ওই লোকের ইংরেজের তাঁবেদার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বাড়ি থেকে উধাও হবার খবর ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাপীর বুকের তলায় যে আনন্দের বান ডেকেছিল; আজও মনে আছে। তখন ও বানারজুলি চা-বাগানের ক্লাবের বারান্দায় বসে রোজ সন্ধ্যায় খবরের কাগজ পড়ত। এ খবর পড়ে আবুর সঙ্গে পরামর্শ করেছিল, সুভাষ বোস যদি পালিয়ে এই বানারজুলির জঙ্গলেই এসে উপস্থিত হয়, তাহলে কেমন করে ও আর আবু তাকে এই জঙ্গলের মধ্যেই সকলের চোখের আড়ালে রাখবে। বাপীর তখনো ধারণা, পালানোর সব থেকে ভালো জায়গা একমাত্র জঙ্গল।

এই সুভাষ বোস্ নাকি ভারতের কোনো কোনো মাটিতে স্বাধীনতার পতাকা তুলেছে—ফিসফিস করে এ কথাও কেউ কেউ বলে। বাড়িতে রেডিও আছে এমন বড়লোকের ছেলেও কলেজে আছে। তাছাড়া সৈন্য বিভাগের দুই একজন হোমরাচোমরার আত্মীয়ও দু'পাঁচ জন আছে। এরাই বলাবলি করে।

বাপীর বদ্ধ বিশ্বাস, কলকাতায় বোমা পড়েছে এবং আরো পড়তে পারে—সে শুধু শত্রু নিপাতের জন্য। যারা দেশের শত্রু তাদের ছাড়া আর কারো কোনো

ক্ষতি হবে না বা হতে পারে না। কলকাতা কেমন, কলকাতা কি তাও বাপী জানে না। কিন্তু কলকাতা শুনলেই কতগুলো মুখ সামনে ভেসে ওঠে। কলকাতায় থাকুক না থাকুক, ওটা যেন তাদেরই খাস বাসের জায়গা। তা ছাড়াও বাপীর বিশ্বাস তারা কলকাতাতেই আছে। অতএব বোমায় যে শত্রুরা নিপাত হয়েছে বা হবে তাদের মধ্যে ওই চেনা মুখ কটা আছে।…সন্দীপ নন্দী তার মেমসাহেব মনোরমা নন্দী আর তাদের ছেলে স্বদীপ নন্দী। বাপীর এই কল্পনায় ওরা দেশেরও শত্রু। কলকাতার এই বোমায় বা পরের বোমায় তারা সব শেষ হয়ে গেলে থাকল শুধু একজন। মিষ্টি।

কল্পনায় সেই অবস্থায় মিষ্টিকে মুখোমুখি দেখছে বাপী আর হেসেছে। মিষ্টিও দেখছে ওকে। এখন এক বাপী ছাড়া ওর কোনোদিকের কেউ নেই। এবারে বাপী কি দণ্ড দেবে ভেবে না পেয়ে ওর চোখেমুখে এত ভয়!

বাপীর তাই আরো বেশি হাসি পাচ্ছে। ও-যে কত উদার হয়ে একলার জগৎ থেকে মিষ্টিকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছে তা জানবেই বা কেমন করে, বিশ্বাসই বা করবে কি করে!

মাথার ওপর গোঁ-গোঁ শব্দে আবার একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল। বাপীর চমক ভাঙল। সামনে তিস্তার খাল। তারপর ধু-ধু বালুচর। তার ওধারে ডুয়ারসএর বনের রেখা।

বাপী হাসছে আবারও। একটা বয়েস ওর অন্য ছেলেদের থেকে ঢের এগিয়ে গেছে বটে, কিন্তু একই সঙ্গে আর একটা বয়েস কল্পনার জগতের মধ্যে আটকে আছে। নইলে কোথায় বোমা আর কোথায় মিষ্টি।

জলপাইগুড়ি এসে বানারহাটের একজন অসম বয়সী সঙ্গী পেয়েছে বাপী। এখন সঙ্গী, আগে ছিলেন সেখানকার স্কুলের ড্রইং মাস্টার। নাম ললিত ভড়। বছর চল্লিশ বয়েস। ম্যাট্রিক পাশ। আর্ট স্কুল বা কলেজের ডিপ্লোমা ডিগ্রি কিছু নেই। নিজগুণে আর্টিস্ট। তাই কোনো সরকারী স্কুলে চাকরি জোটেনি। বেশ বড়সড় মোটা মানুষ। পান-খাওয়া কালো ছোপ ধরা দাঁত। একমাথা চুল আর একগাল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। তিন মাসে একবার চুলে কাঁচি পড়ে, আর মাসে দুবার গালে ক্ষুর। আঁকার থেকেও ললিত ভড়ের শাস্ত্রজ্ঞান বেশি। চুল-দাড়ি কাটা না কাটা নিয়েও দু'পাঁচটা সংস্কৃত শ্লোক ঝেড়ে দিতে পারেন। বানারহাটের স্কুলের সব ক্লাসেই একটা বেত নিয়ে ঢুকতেন। কিন্তু সেই বেতের ঘা একমাত্র টেবিলের ওপর ছাড়া কখনো হয়তো কারো গায়ে পড়েনি। বেত হাতে ক্লাসে ঢোকেন কেন জিজ্ঞাসা করলে

নিজেই বলতেন, ওটা পারসোনালিটি কমপ্লেক্স। বুঝলি কিছু?

বুঝুক না বুঝুক, ছেলেরা মাথা নাড়ত, বোঝেনি। ললিত ভড় তখন কালো ছোপ-ধরা দাঁত বার করে ধমকের সুরে বলতেন, সব তো বুঝে ফেলেছিস, এখন এটা বাকি—বড় হ', বুঝবি।

জলপাইগুড়িতে তাঁর পৈতৃক ভিটে। বাড়ি বলতে দু'খানা খুপরি কাঠের ঘর। এককালে এই জলপাইগুড়ির কোথায় নাকি তাঁদের ঘর-বাড়ি আর অনেকটা জমি-জমা ছিল। বন্যায় সব খেয়ে দিয়েছে। বানারহাটে থাকতেই ভদ্রলোক এখানকার কোনো বে-সরকারী স্কুলে চাকরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই চাকরি এতদিনে হয়েছে।

বানারহাটের স্কুলের ছেলেরা ললিত ভড়কে বলত পেটুক ভড়। না, কেউ তাঁকে পেটুকের মতো খেতে দেখেনি কোনদিন। তবু তাঁকে পেটুক বলার পিছনে একটা মজার ব্যাপার আছে। আঁকার হাত পরিষ্কার। বোর্ডে যা এঁকে দেন ছেলেদের তাই আঁকতে হয়। কিন্তু কোনদিন কেউ তাঁকে ফুল লতা পাতা গাছগাছড়া নদী পাহাড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়ে কিছু আঁকতে দেখে নি। তাঁর আঁকার মধ্যে খাবার বিষয় থাকবেই। আম, আতা, কলা, পেঁপে, আঙুর, বেদানা, পেয়ারা, জাম-জামরুলের থোকা—লাউ, কুমড়ো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলুর ঝুড়ি, বড় বড় টোমেটো, ফলন্ত সিম গাছ, বেগুন গাছ—হাঁড়িভরতি রসগোল্লা বা দই, ডিশভরতি সিঙাড়া বা তালশাঁস সন্দেশ—দশ বিশ সের ওজনের রুইকাতলা, পোলাউ কালিয়া পঞ্চব্যঞ্জনের সামনে বসা তৃপ্তমুখ ভোজনবিলাসী—কথামালার সেই লোলুপ নেকড়ের সামনে নধর মেষ-শাবক, নাগালের বাইরে থোকা-থোকা আঙুর ডালের নিচে শেয়াল, কাকের মুখে মাংসের টুকরো দেখে ধূর্ত শেয়ালের চাটু কথা—এইসব তাঁর আঁকার বিষয়। সর্ব ব্যাপারে কিছু না কিছু খাওয়ার যোগ থাকবেই।

মাস দেড়েক আগে রাস্তায় একদিন হঠাৎ দেখা তাঁর সঙ্গে। বাপীকে দেখে আনন্দে আটখানা। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতোই কাঁধ জড়িয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন। বানারজুলিতে গরিবদের কুঁড়েঘর তো কতই দেখেছে বাপী। নিজেদের অবস্থাও সেই রকমই ছিল। কিন্তু ঘুণ-ধরা এই কাঠের খুপরি ঘর দুটোয় এসেই বাপীর মনে হয়েছিল, দারিদ্র্য এখানে একেবারে হাঁ করে আছে।

হাঁক দিয়ে স্ত্রীকে ডাকলেন। দুটো ছেলে ঘরে এলো। পরনে হাফপ্যান্ট, আদুড় গা। আট আর বারোর মধ্যে বয়েস। দরজার কাছে ময়লা শাড়ি জড়ানো বছর চৌদ্দর একটা মেয়ে। এই ছেলে দুটো আর মেয়েটা বেশ লম্বা

আর ফর্সাও—কিন্তু গায়ে কারো মাংস নেই। শুধু হাড়গুলো চামড়ায় মোড়া। এত রোগা ছেলেমেয়ে বাপী আর দেখেইনি বোধ হয়।

মাস্টারমশাইর বউ এলেন। উনিও হাড়-চামড়া-মোড়া লম্বা ফর্সা কাঠি একখানা। ললিত ভড় বললেন, আমার বানারহাট স্কুলের ছাত্র বিপুল, ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে কলেজে পড়তে এসেছে—দেখ তো ওকে দেবার মতো ঘরে কিছু আছে কিনা।

মুখে হাসিও না রাগও না, একবার ওর দিকে তাকিয়ে ভড়-গিন্নী কলের পুতুলের মতো চলে গেলেন। বাপীর মুখের দিকে চেয়েই ললিত ভড় বললেন, থাক, তোকে আর লজ্জা পেতে হবে না, স্কুলে তোরা আমাকে পেটুক-ভড় বলতিস আমি জানি না নাকি। কিছু খেতে না দিলে মনে মনে ঠিক নিন্দে করবি—

লাল-কালো দাঁত শুধু না, খোঁচা খোঁচা দাড়ির ফাঁক দিয়েও খুশি ঠিকরে পড়ছিল। এর পরেই সোৎসাহে ওকে শোনাতে লাগলেন, হাতে কিছু টাকা এলেই পিছনের জমিটুকুতে কি-কি আনাজ লাগাবেন—ভালো মাটি, খাসা তরিতরকারি হবে।

চকিতে রেশমা আর দুলারির কথা মনে পড়ে গেছল বাপীর। অন্ধ ছট্টু মিয়ার ঘরের পিছনে তারাও তরকারির বাগান করেছিল। কিন্তু তাতে অভাব মেটেনি। তারা এখন সাপের খেলা দেখায়।

একটা মাঝারি সাইজের ডালায় নুন আর গোলমরিচ ছড়ানো তেলে ভাজা চিঁড়ে এনে সামনে রাখল সেই রোগা মেয়েটা। কিছু সেদ্ধ মটরশুঁটিও আছে ওতে।

—খা খা—খাসা জিনিস। ললিত ভড় নিজেও ডালা থেকে একমুঠো তুলে নিলেন।

সত্যি মুখরোচক। রোগা ছেলে দুটো হাঁ করে দেখছে। বাপী কাছে ডাকতে ওরাও এসে খেতে বসে গেল। মেয়েটা আবার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। বাপী বলল, তুমিও চারটে নাও না, আছে তো—

ললিত ভড় ডাকলেন, লজ্জা কি রে, আয় আয়। বাপীকে বললেন, আমার মেয়ে কুমকুম, ও-ই বড়, ক্লাস এইট-এ পড়ে—খুব ভালো মেয়ে।

কিন্তু ভালো মেয়ে এলো না। অন্য ঘরে চলে গেল। বাপী বিমনা একটু। ...মিষ্টির থেকে বছরখানেকের বড় হতে পারে মেয়েটা। কিন্তু কৌতূহল হওয়া দূরে থাক, মেয়ে বলেই মনে হয় না।

চিঁড়ের ডালার অবস্থা দেখে হাসি পাচ্ছিল, আবার বুকের ভিতরে কেমন করছিলও। কথা বলতে বলতে ললিত ভড় চিঁড়েভাজা তুলে নিচ্ছেন। ছেলে দুটো চটপট খাওয়া সারছে। ওই চিঁড়ের ডালায় বাপী আর একটিবার মাত্র হাত দিয়েছে। তার মধ্যে ডালা খালি।

ললিত ভড়ের শিল্প-কলায় সর্বদা ভাংলা ভালো খাবার জিনিস থাকে কেন বাপী তা এতদিনে বুঝতে পারছে।

মনের মতো শ্রোতা পেলে ড্রইং মাস্টার ললিত ভড় সব থেকে খুশি। ভালো খাবার পাওয়ার থেকেও কিনা তা অবশ্য বাপীর যাচাই করার সুযোগ হয় নি। এই তিস্তার পারেই মাঝে মাঝে দেখা হয় তাঁর সঙ্গে। লম্বা হাঁটার ঝোঁকে অনেক দিনই এদিকে চলে আসেন। ছেলেমেয়ে বউ যত হাড-চামড়া-সার হোক, তাঁর দেহখানা লম্বার ওপর নাদুসনুদুস।

দেখা হলে এ-সময় যুদ্ধের কথা ছাড়া আর কি কথা হবে। তখন যুদ্ধ নিয়েই অনর্গল বলে যান ললিত ভড। মেজাজ তিরিক্ষি হতেও সময় লাগে না।—ও-সব যুদ্ধ-টুদ্ধ হল রাজরাজড়ার ব্যাপার, বুঝলি? ও আমাদের কিছু নয়। আমাদের শুধু পেটের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ লেগেই আছে। আমাদের গোলাম বানিয়ে রেখে ইংরেজ এই যুদ্ধটাই বেশ করে শিখিয়েছে। ইচ্ছে করলেই ওরা বেশি দিতে পারে, কিন্তু দেবে কেন? ভরা পেটে আর গোলাম হতে চাইবে কেউ? ইস্কুল-কলেজের বড় বড় ছেলেগুলোকেও এটা বোঝাতে গেলে ওরা আবার বোকার মতো হাসে। ওদের কাছে আমি সদৃশপ্রাজ্ঞ, মানে যেমন আমার চেহারা, তেমনি বুদ্ধি।

এই প্রসঙ্গে লাল-কালো দাঁত আর দাড়িবোঝাই মুখ খিঁচিয়ে একদিন বলেছিলেন, শ্লোক আছে, 'স্বদেশের ঠাকুর, বিদেশের কুকুর—মানে জানিস? স্বদেশে যার সম্মান, বিদেশে তার অনাদর। আমাদের ঠিক উল্টো। ইংরেজ বিদেশে এসে ঠাকুর আর আমরা স্বদেশে থেকে কুকুর। আমাদের মরণ ভাগাড়ে, অপরং বা কিং ভবিষ্যতি—যুদ্ধ লাগুক, থামুক, আমাদের আবার ভবিষ্যৎ কি?

পরের বছরেও ড্রইং মাস্টার পেটুক-ভড়ের মুখে হা-হা হাসি দেখেছে বাপী। কিন্তু তাঁর কথাবার্তা আর শ্লোকের ধার আরো ঝাঁঝালো। কলকাতার কাগজগুলোতে তখন সমস্ত চব্বিশ পরগণা আর বাংলার বহু জায়গা জুড়ে দুর্ভিক্ষের বার্তা। চালের বস্তা সব নাকি পাখা মেলে উবে যাচ্ছে। ডাল তেল নুন মশলাও উধাও। ভাত ছেড়ে ভাতের একটু ফ্যানের জন্য দিকে দিকে আর্তনাদের খবর। দুর্ভিক্ষ শব্দটাই শুধু শোনা ছিল, ব্যাপারখানা কি বাপীর

জানা ছিল না। এখনো খুব স্পষ্ট নয়। কারণ উত্তর বাংলা মোটামুটি ধান-চালের দেশ। কিন্তু অন্য প্রান্তের দুর্ভিক্ষের বাতাসে এখানেও অনেক কিছুর দর চড়া। ত্রাসে যে যতটা পারছে ঘরে এনে মজুত করছে। পড়াতে গিয়ে নিশীথের মামা বাড়িতেই তো কত চালের বস্তার ঠিকি দেখেছে বাপী।

এই প্রসঙ্গে পেটুক ভড়ের রুদ্রমূর্তি এক এক সময়।—রাশি রাশি লোক মরছে বুঝলি? খিদের জ্বালায় মানুষগুলো পিঁপড়ের মতো পটাপট মরে যাচ্ছে। ওরা হিসেব দিচ্ছে পনের লক্ষ, কিন্তু কম্ করে পঁয়ত্রিশ লক্ষ হবে, শুনে রাখ আমার কাছে। সরকারী ফিগার চ্যালেঞ্জ করে কাগজে ওই খবর বেরিয়েছে। দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল—সেই চন্দ্রগুপ্তর আমল থেকে এ পর্যন্ত কত কোটি লোক দুর্ভিক্ষে মরেছে এই দেশে তাও আমি হিসেব করে বলে দিতে পারি। কিন্তু আগের কালে পথঘাট ছিল না, গাড়িঘোড়া ছিল না—যেখানে দুর্ভিক্ষ হত পটাপট লোক মরত। কিন্তু এখন হয় কেন? এখন মরে কেন? আগের কালে দুর্ভিক্ষ তাড়ানো ছিল রাজধর্ম—রাজরাজড়ারা সুফলার ধান আকালের জন্য মজুত রাখত আর বিলোতো। এখন কে মজুত করছে? কারা বিলোচ্ছে? আমি ছবির মধ্যেও খাবার যোগান দিই, কিন্তু এই রাজরাজড়ারা কি করে?

আর একদিন শুকনো মুখ দেখেই বাপীর মনে হচ্ছিল ভদ্রলোকের কিছু খাওয়া হয় নি। সকাল থেকেই খাওয়া হয় নি কিনা কে জানে। কথার ফাঁকে দু'বার উঠে তিস্তার ওই তিরতিরে জলেই কুলকুচি করে এসেছেন।

—শাস্ত্রমতে দুর্ভিক্ষ কেন হয় জানিস? ঈতির দোষে। 'ঈতি' কি জানিস? ঈতি হল অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি পঙ্গপাল মূষিক আর যুদ্ধ। এই দুর্ভিক্ষে ঈতির প্রথম চারটেই বাদ। কেবল যুদ্ধ। যুদ্ধ মানে কি? মানুষের উপদ্রব আর মানুষের লোভ। বুঝলি? কিন্তু আমার কথা কে শোনে—আমার হল গিয়ে 'দারিদ্র্যদোষোগুণরাশিনাশী'—অভাবের আগুনে সব গুণ পুড়ে ছাই। স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেদের সেদিন এই দুর্ভিক্ষটা কি আর কেন তাই বলছিলাম—পাশ দিয়ে যেতে যেতে পণ্ডিতমশায় এই টিপ্পনী কেটে গেল।

ফেনা-ওঠা শুকনো মুখ আবার তিস্তার জলে ধুতে গেলেন। বাপী পকেটে হাত দিল। একটা আধুলি আছে জানে। পারতপক্ষে খরচ করে না।

মুখ ধুয়ে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।—চলুন।

খেয়াল না করেই ললিত ভড় ওর সঙ্গে চললেন। মুখেরও কামাই নেই।

—আসল কথা হল টাকা, বুঝলি? টাকা থাকলেই জ্ঞান বুদ্ধি মান সম্মান

প্রতিপত্তি সব থাকল তোর। আর টাকা না থাকলে নিজের জনেরাও চিবুনো ছিবড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তোর এখনো কেউ নেই বলেই বলছি এটা মনে রাখিস—নইলে ঠকতে হবে।

লোকালয়ে এসে বাপী একটা জিলিপি ভাজা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তার মধ্যে ফুরফুরে টাটকা মুড়ি।—গরম জিলিপ আর মুড়ি খেতে ইচ্ছে করছে মাস্টারমশাই।

এবারে বাস্তবে ফিরলেন ললিত ভড়। থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ওর সঙ্গে। জিলিপি-ভাজা বড় কড়ার দিকে চেয়ে চোখ দুটো একটু চকচক করে উঠল কিনা বাপী জানে না।

—আজ থাক, তোকে আর একদিন খাওয়াব'খন।

বাপী জোর দিয়ে বলল, আজ আমি। একদিন আমি আপনাকে খাওয়াতে পারি না? পকেট থেকে আধুলিটা বার করে দেখালো, এই দেখুন পয়সাও এনেছি—

দোকানের সামনে এসে দাঁডাল। ললিত ভড পিছনে। আমতা আমতা করে বললেন, তোর যখন এত ইচ্ছে, একটা কাজ কর তাহলে…কিছু বেশিই নে, বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাওয়া যাবে…ওরাও মুড়ি আর গরম জিলিপি খুব ভালবাসে। আর, আমার জন্যে এক পয়সার পান কেন, মুখটা কেমন হয়ে আছে।

চার আনায় মস্ত এক ঠোঙা মুড়ি. পনের পয়সার তিরিশটা গরম জিলিপি আব দু'হাত দূরের দোকান থেকে এক পয়সায় দুটো পান কেনা হল। একটা পান ললিত ভড তক্ষুনি মুখে পুরে দিলেন।

কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি এসে কি যে আবার দরকারী কাজ পড়ে গেল তাঁর বাপী বুঝল না। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, আচ্ছা তুই যা, আমি একটা কাজ সেরে এখনই আসছি—আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, তোরা শুরু করে দে—

বাপী কিছু বলার অবকাশ পেল না, তার আগেই হন হন করে উনি আর একদিকে চলে গেলেন।

ওঁর বাড়িতে পা দেবার পর ব্যাপারখানা বোঝা গেল। প্রথম দিনের পর বাপী এযাবৎ আরো চার-পাঁচ দিন এখানে এসেছে। ভড়-গিন্নী কাছে আসেন না, মেয়ে আর ছেলে দুটোর সঙ্গে কথাবার্তা হয়।

ওকে দেখে রোগা পাংশুমূর্তি কুমকুম এগিয়ে এলো। পিছনে ভাই দুটো।

হাতে মুড়ির ঠোঙা আর জিলিপির ঝুড়ি দেখে ছেলে দুটোর চোখে মুখে চাপা উল্লাস। পারলে ছিনিয়ে নেয়।

কুমকুম জিজ্ঞাসা করল, এ-সব কেন ?

আমতা আমতা করে বাপী বলল, মাস্টারমশাই পাঠালেন, কোথায় একটু কাজে গেলেন, এখুনি আসবেন—

হাত বাড়িয়ে কুমকুম জিলিপি আর মুড়ির ঠোঙা নিলে আর সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে বলে উঠল, সমস্ত দিন বাড়িসুদ্ধ সকলকে উপোস করিয়ে এখন জিলিপি পাঠালেন—

থতমতো খেয়ে বাপী জিজ্ঞাসা করল, বাড়িসুদ্ধ সকলে উপোস কেন ?

—মাসের শেষে মায়ের বাক্স থেকে বাবা দশ টাকা চুরি করে ধরা পড়েছে তা তোমাকে বলেনি বুঝি! মায়েব জেরার চোটে ধরা পড়েছে। দশ-দশটা টাকা কলকাতার কোন্ দুর্ভিক্ষের ফাণ্ডে-এ মণি-অর্ডার করে পাঠানো হয়েছে। রাগ করে মা আজ সমস্ত দিন নিজেও রাঁধেনি, আমাকেও রাঁধতে দেয়নি—দুপুর থেকে সব্বার উপোস চলছে।

বাপী পালিয়ে এসেছে।

আবার একটা অদম্য ইচ্ছা মাথায় নতুন করে চেপে বসেছে। অনেক অনেক বড় না হলেই নয়। অনেক—অনেক টাকা রোজগার না করলেই নয়। অপমানের শোধ নেবার জন্য অনেক বড় হওয়া দরকার, আর অনেক টাকা দরকার। আবার ললিত ভড়ের মতো মানুষের জন্যেও দরকার।

পড়াশুনা ভালো লাগুক না লাগুক, পরীক্ষায় পাশ না করলে চলবে না, এটা ভালোই জানে। নিশীথের সঙ্গে একঘরে থাকে তাই বই-এর সমস্যা নেই। ফাইনাল পরীক্ষার চার-পাঁচ মাস মাত্র বাকি আর। নিশীথের ঘুম ভাঙার আগেই ও পড়াশুনো কিছুটা সেরে রাখে।

বিষম হাঁপাতে হাঁপাতে ললিত ভড়ের বারো বছরের বড় ছেলেটা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলো। সমস্ত রাস্তা ছুটেই এসেছে বোধ হয়। দু' চোখ কপালে।

—বাপীদা শিগ্‌গীর দিদি তোমাকে যেতে বলল, একপাল পুলিশ এসে আমাদের ঘর তছনছ করছে, বাবাকে তারা ধরে নিয়ে যেতে এসেছে।

বাপী হতভম্ব কয়েক মুহূর্ত। তারপর বুকের মধ্যে কাঁপুনি। প্রথমেই ক'মাস আগে গিন্নীর বাক্স থেকে মাস্টারমশাইর দশ টাকা চুরি করে দুর্ভিক্ষের ফাণ্ডে পাঠানোর ব্যাপারটা মনে পড়ল। এবারে কি বাড়ির বাইরে কোথাও কিছু করে বসল নাকি ভদ্রলোক !

কিন্তু এই বাচ্চা ছেলে কি আর বলতে পারবে। জামা গায়ে চড়িয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। নিশীথ তখনো ঘুমুচ্ছে।

…বাড়িতে অনেক পুলিশই বটে। পাড়ার মানুষেরা সব দূরে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। কেউ এগিয়ে আসতে ভরসা পাচ্ছে না। ছেলেটার হাত ধরে বাপী পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। ললিত ভড়কে বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে। এবারে পুলিশ ভ্যানে তোলা হবে।

বাপীকে দেখে লাল-কালো দাঁত বার করে অদ্ভুত বোকার মতো হাসলেন ললিত ভড়। সমস্ত ব্যাপারখানা যেন তাঁর কাছেও দুর্বোধ্য। বিড়বিড় করে বললেন, কি ব্যাপার কিছু বুঝছি না, তুই এদের একটু দেখিস—

একজন পুলিশের ভদ্রলোক বাপীর দিকে এগিয়ে এলো হঠাৎ। গম্ভীর কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, হু আর ইউ ?

·· বিপুল তরফদার।

—ইনি কে হন ? আঙুল তুলে ললিত ভড়কে দেখালেন।

…আমাদের মাস্টারমশায় ছিলেন।

—কি করা হয় ?

…আমি ? কলেজে পড়ি…।

—কোথায় থাকা হয় ?

…কলেজের হস্টেলে।

লোকটা ফিরে গেল। তার দু' মিনিটের মধ্যে ললিত ভড়কে ভ্যানে তুলে নিয়ে ওরা চলে গেল। আশপাশের সকলে ছুটে এলো। সকলের মুখে এক কথা, হাটে বাজারে লেকচার দিয়ে বেড়ানোর ফল। চেঁচামিচি করে ছেলেগুলোর কান বিষানোর খবর কি ওরা রাখে না—আগে ধরে নি সেটাই আশ্চর্য।

ললিত ভড়ের ঘরে এলো বাপী। দুটো ঘরই লণ্ডভণ্ড করে রেখে গেছে ওরা। কাগজপত্র ছড়ানো। বিছানা-টিছানাগুলো মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বাক্স-প্যাটরা হাঁ-করা খোলা। রোগা মেয়ে কুমকুম মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে। হাড় বার করা ছেলে দুটোর চোখে ভয় আর বিস্ময়। ভড় গিন্নীরই শুধু তেমনি কলের পুতুলের মতো মুখ।

পুলিশের এক অফিসারের ছেলে কলেজে পড়ে। নিশীথের সঙ্গে তার বেশি ভাব। নিশীথকে বলে সেই ছেলের মারফৎ খোঁজ নেবার পর জানা গেল, পুলিশের চোখে 'বিপজ্জনক' মানুষের লিস্ট-এ নাকি ললিত ভড়ের নাম উঠেছে।

পোলিটিকাল প্রিজনারদের' এখন আর শিগগীর ছাড়া পাবার কোনো আশা নেই।

পরের দশ-পনের দিনের মধ্যে বাপী অনেকবার ললিত ভড়ের বাড়ি এসেছে। কিন্তু ভড়-গিন্নীর কলের মুখখানা মনে পড়লে আসতে ইচ্ছে করে না। ললিত ভড়ের খবর নেবার চেষ্টাও তলায় তলায় করেছে। একদিন শুনল, তাঁকে জলপাইগুড়ি থেকে বাইরে কোথায় চালান করে দেওয়া হয়েছে।

সেদিনই তাঁর বাড়ি এসে দেখে বাইরে থেকে ঘর তালাবন্ধ। পাশের বাড়িতে খবর নিযে জানল, ছেলেমেয়ে নিয়ে ভড়-গিন্নী বাড়ি তালাবন্ধ করে দিনাজপুরে চলে গেছেন। সেখানে তাঁর ভাইয়ের বাড়ি।

এ-খবর জানার পর বাপী হালকা বোধ করেছে একটু। ছেলে দুটো, মেয়ে আর কলের মুখ ভড-গিন্নীর ভাবনায় ওর গলার কাছে কি দলা পাকিয়ে থাকত।

সেই থেকে বাপীর উপচে-ওঠা গলগলে ঘৃণা আর বিদ্বেষের পাকে আর একটা নাম জড়িয়েছে।

সে-নাম পুলিশ।

আই. এসসি পাশ করল। তারপর আরো নিঃসঙ্গতার মধ্যে পরের দুটো বছরও কেটে গেল। আই. এসসি পাশ করে নিশীথ কলকাতায় পড়তে চলে গেছল। মেডিকেল কলেজে জায়গা না পেয়ে সে কলকাতায় বি. এ পড়া শেষ করেছে। মাঝেসাঝে চিঠি লেখে। বি. এ পাশ করার খবর দিয়েছে। এদিকে বাপী বি. এসসি পাশ করেছে।

নিশীথের মামা-বাড়িতে চার ছেলেমেয়ে পড়ানোয় ছেদ পড়েনি। মাইনে পঁয়তিরিশ টাকায় উঠেছে। এক মাস দেড় মাসের ছুটিছাটায় হস্টেল বন্ধ থাকলে নিশীথের এই মামা-বাড়িতেই এসে থাকতে হয়, খেতে হয়। তখন মাইনে আবার কুড়ি টাকায় নেমে আসে। ফোর্থ ইয়ারের শুরু থেকে বাপী স্কুলের উঁচু ক্লাসের তিনটে ছেলেকে একসঙ্গে পড়ানোর কাজ জোটাতে পেরেছিল। বিকেলে হস্টেলে এসে ঘড়ি ধরে দেড় ঘণ্টা পড়ে যেত। অঙ্ক, অ্যাডিশনাল অঙ্ক আর মেকানিকস—এই তিন বিষয়। এখনো পড়ে। দশ টাকা করে দেয়। তিনজনে তিরিশ টাকা। ফোর্থ ইয়ারে উঠে বাপীর ব্যাংকের বাকি শ'আড়াই টাকা আর খরচ হয় নি। মুশকিল দাঁড়িয়েছে বি. এসসি পরীক্ষার পর। সেই তিন ছেলের একজনের বাড়ি গিয়ে পড়িয়ে

আসতে হয়—বাকি দু'জনও সেখানেই আসে। আবার বাপীকে নিশীথের সেই মামা-বাড়িতে ঠাঁই নিতে হয়েছে। তবে মাইনে এবার কুড়ির বদলে পঁচিশে নেমেছে। মোট রোজগার তিরিশ আর পঁচিশ পঞ্চান্ন। খরচ নেই বললেই হয়।

বি. এসসি'র ফল বেরিয়েছে জুনের শেষে। বাপী পোস্ট অফিসে এসেছিল। একটা খাম কিনে সেখানে দাঁড়িয়েই কলকাতায় নিশীথকে চিঠি লিখেছে। ওর বি-এ পাশের রেজাল্ট কিছুদিন আগেই জেনেছিল। নিশীথ বাপের কাছে কবিরাজি শিখবে আর চাকরির চেষ্টাও করবে লিখেছিল। বাপী তাকে লিখল, সুযোগ-সুবিধে হলে ওর জন্যেও একটা চাকরির চেষ্টা যেন অবশ্য করে। চাকরির সুবিধে হতে পারে কলকাতায় নিশীথের বাবার সঙ্গে এমন অনেকের চেনা-জানা থাকা সম্ভব।

খাম পোস্ট করে ফেরার সময় অবিশ্বাস্য চমক। উল্টো দিক থেকে যে মানুষটি আসছেন তাঁকে দেখে বাপী হাঁ।

ড্রইং মাস্টার ললিত ভড়।

চুলদাড়ি বোঝাই সেই মুখ। তবে চুল আব দাড়ি দুই-ই এখন কাঁচা-পাকা। সেই রকম কালো ছোপ-ধরা লাল দাঁত। আড়াই বছরে ভদ্রলোক শীর্ণ হয়েছেন একটু। বাপীকে দেখে খুশিতে উপচে উঠলেন।—ক'দিন ধরে তোর কথাই ভাবছি, কলেজ বন্ধ হস্টেল বন্ধ—কে খবর দেয়? আমি ভাবলাম কোথাও চলেই গেছিস।

খুশি বাপীও কম নয়।—আপনি কবে ছাড়া পেলেন? কবে এলেন?

—বারো-চৌদ্দ দিন হবে। এখান থেকে রাজসাহীতে চালান করে দিয়েছিল, সেখানেই ছিলাম।

—কেমন ছিলেন?

—খারাপ আর কি। গোড়ার কিছুদিন গুঁতোর চোটে চোখে অন্ধকার দেখতে হত, কিন্তু আমি কার নাম আর কি চক্রান্তের কথা বলি বল? ওরা বিশ্বাসই করতে চায় না। তারপর অবশ্য ভালই ছিলাম, ওরা আমাকে নিয়ে মজা করত, ভালো-ভালো খাবারের ছবি এঁকে দিলে আমাকে একটু ভালো খেতে দিত। হা হা হাসি।

কিন্তু বাপীর দু' চোখ জ্বলছে পুলিশ মার-ধর করেছে, অকারণে আড়াইটে বছর আটকে রেখেছে, সামান্য সম্বল চাকরিটাও গেছে। জিগ্যেস করল, আপনি ফিরেছেন আপনার ছেলেমেয়ে জানে? তারা তো সব দিনাজপুর চলে গেছল…

—হ্যাঁ, বউয়ের ভাই সেখানে কোর্টের মুহুরি। নিজের জায়গা-জমি আছে, গোরু আছে দুটো, পুকুরে মাছ আছে—ভালই আছে নিশ্চয়।

—আপনি ফিরে এসে সেখানে যান নি?

—যাব রে, সবে তো এলাম। হাসছেন।—চাকরিটা আবার হয় কিনা বোঝার জন্য স্কুলের হেড-মাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম। দেখেই আঁতকে উঠল ভদ্রলোক, চাকরির কথা বলব কি। আরো হাসছেন।—তার আর দোষ কি বল, ছাপোষা মানুষ, জেল-খাটা লোককে টানবে কোন্ ভরসায়?

জেল-খাটা লোককে বাপী একটা মিষ্টির দোকানের দিকে টেনে নিয়ে গেল। খুশি-খুশি বিব্রত মুখে ললিত ভড় বললেন, আবার এখানে কেন রে?

বাপী বলল, আপনার খাওয়া পাওনা আছে মাস্টারমশাই—আমি বি. এসসি পাশ করেছি, ডিসটিংশনও পেয়েছি।

শুনেই সানন্দে খেতে বসে গেলেন ললিত ভড়। কাউকে খাইয়ে এত তৃপ্তি আর কি পেয়েছে বাপী? প্রচুর খাওয়ার পর খুশির ঢেকুর তুলে ললিত ভড় মন্তব্য করলেন, তুই বড় ভালো ছেলে, আর বড় নরম মন—তোর কি-সৃস্য হবে না।

অর্থাৎ ভালো ছেলে আর নরম মন হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বাপী হেসেই ফেলেছিল।

আবার ঠাঁই বদল। নিশীথের মামার বাড়ি ছেড়ে বাপী ললিত ভড়ের দু ঘরের একটাতে উঠে এসেছে। কেন তাঁকে বুঝতে দেয় নি। উল্টে বলেছে, ও-ই একটু মাথা গোঁজার জায়গা পেল। ললিত ভড় কেন স্ত্রী বা ছেলেমেয়েকে দেখতে একবার দিনাজপুর যান নি, কেন জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার খবরটা পর্যন্ত তাদের দেন নি সেটা বাপীর থেকে ভালো আর কে আঁচ করতে পারে? বাপী এখানে চলে না এলে মানুষটার উপোস বরাদ্দ। হাতে অঢেল সময় এখন, আর একটা টিউশন যোগাড় করে নেওয়া বাপীর পক্ষে খুব অসুবিধে হবে না। যাদের পড়ায় তাদের বললেই হতে পারে। তাদের কাছে ওর অঙ্ক শেখানোর সুনাম খুব।

ললিত ভড়ের কাছে উঠে আসার ফলে বাপীর লাভও কিছু হয়েছে। এক তো মানুষটার সঙ্গ ভালো লাগে। ভদ্রলোক নিজে রান্নাবান্নায়ও পটু বেশ। দেড় মাস তাঁর কাছে থেকে বাপীর মোটামুটি রান্নাও শেখা হয়ে গেল।

আর তাঁর কাছ থেকে কিছু যোগব্যায়ামও শেখা হয়েছে। বেশি খিদে হয় বলে নাকি ও-পাট ছাড়তে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু জানেন অনেক কিছু।

মাত্র দেড় মাস। ছেচল্লিশ সালের ষোলই আগস্ট থেকে তামাম ভারতে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠল। গোটা দেশ রক্তে ভেসে যেতে লাগল। সে এক বীভৎস সময় এখানেও। মানুষের বিশ্বাস গেছে, বুকের ভিতরটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। দুদিন আগের গলাগলি ভাব গলা-কাটাকাটির দিকে গড়ালো। কেবল ভয় আর কেবল সন্দেহ সম্বল। বাপীর থেকে-থেকে তখন বানারজুলির আবু রব্বানীর কথা মনে হয়েছে। দুলারি আর রেশমার কথা মনে হয়েছে। বাপীকে কাছে পেলে তারা এখন কি করবে?

গোলযোগের প্রথম ঝাপটার পরেই ললিত ভড় বাপীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে দিনাজপুরে ছুটে গেছেন। তারপর একটা বছরের মধ্যে একটা চিঠি না, একটা খবর না। কেউ বেঁচে আছে কি নেই তাও বাপী জানে না।

এক বছর বাদে, সাতচল্লিশের পনেরই আগস্ট জলপাইগুড়ির মানুষ অস্তত হেসেছে আর হাঁপ ফেলে বেঁচেছে। একদিন আগেও বুক ধুকপুক সকলের। দেশ স্বাধীন হবে, দুশ' বছরের দাসত্বের শেকল ভাঙবে—কিন্তু এ-জায়গার মানুষদের ভাগ্যে কি আছে?

পরদিনই বিপরীত উল্লাস। জলপাইগুড়ির বলতে গেলে সবটাই ভারতের এলাকায় পড়েছে। কিন্তু দিনাজপুরের অনেকটা পাকিস্তানের দিকে চলে গেছে। দিনাজপুরের মানুষ কি করছে বাপী জানে না। বিপুল উল্লাসের জয়ধ্বনি দিয়ে জলপাইগুড়ির মানুষ ট্রেজারিতে স্বাধীন ভারতের তিন-রঙা পতাকা তুলেছে।

কলকাতায় নিশীথের সঙ্গে বাপীর চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। পরের মাসেই নিশীথের টেলিগ্রাম। চাকরির একটা ব্যবস্থা হয়েছে। পত্রপাঠ চলে এসো।

টেলিগ্রাফ হাতে বাপী বিহ্বল খানিকক্ষণ।

...কলকাতা!

...চাকরি করতে বাপী সত্যি কলকাতা যাবে?

...এই বাইশ বছরের জীবনে বুকের তলার সব থেকে বড় সাধ সফল হবে এবার?

...দশ বছর আগে বানারজুলির বড়সাহেবের আট বছরের এক মেয়ে

প্রথম দিনের আলাপে ওকে বলেছিল, কলকাতা দেখনি আবার ফটফট করছ—তুমি জংলি ভূত একটা। সেই কলকাতা!

কলকাতা।

হাওয়ায় ভেসে কলকাতা এসেছে বাপী। ওকে নেবার জন্য নিশীথ স্টেশনে হাজির ছিল। নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলেছে। বাপী ওকে চিঠিতে লিখেছিল দুদিন ওর বাড়ীতে থেকে জ্যাঠাতুতো দাদার অর্থাৎ মণিদার বাড়িটা খুঁজে নেবে। আপাতত সেখানে থেকেই চাকরি করবে।

মণিদার বাড়ির ঠিকানা জানা থাকলে তাকেও চিঠি লিখত। জানে না। ঠিকানা বানারজুলির বাড়িতে কোথাও পড়ে থাকতেও পারে। বাপীর স্মরণ-শক্তি প্রখর। মণিদা কাস্টমস-এ চাকরি করে এটুকু আজও মনে আছে। কারণ বাবা এক রাতে ঠাট্টা করে তাকে বলেছিল, কাস্টমসের চাকরির তো মাইনে থেকে উপরি বেশি শুনেছি।

বাবার কথায় মণিদা খুব হেসেছিল।

কিন্তু, মণিদার আপিসের ঠিকানাই বা পাবে কোথায় যে একটা চিঠি লিখে জানাবে, ও আসছে।

শনিবার সকালে এসে পৌঁছেছিল। নিশীথ সেদিন ছুটি নিয়েছে। ও প্রায় বছরখানেক আগেই চাকরিতে ঢুকে গেছে। ওর আপিস ডালহৌসিতে। কেরানী হলেও আপার ডিভিশন।

শনি-রবি দুটো দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে নিশীথ কলকাতা দেখালো ওকে। চিড়িয়াখানা মিউজিয়াম বোটানিক্যাল গার্ডেনও বাকি থাকল না। ঠাট্টা করে বলল, সব দেখে রাখ, এই প্রথম কলকাতায় এসেছিস বুঝতে পারলে লোকে বাঙাল বলবে।

দেখে শুনে গোড়ায় বাপী হাঁ হয়ে গেছল সত্যি কথাই। বই-এ পড়েছিল, আজব শহর কলকাতা। এমন তাজ্জব রকমের আজব কে জানত! ট্রাম বাস লরি ট্যাক্সি মোটর ঠেলা রিকশার মিছিল দেখে দুদিনেই মাথা ঝিম-ঝিম করেছে। গোটা কলকাতা শহরটা যেন সদা ব্যস্ত, কেবল ছুটছে আর ছুটছে। আসার সময় ট্রেনে বসে ঘুরে ফিরে মিষ্টির কথাই বেশি মনে এসে-ছিল। কোথায় আছে ওরা এখন জানে না। কিন্তু বাপীর বদ্ধ ধারণা; কলকাতায় আছে। মিষ্টি কথায় কথায় একদিন বলেছিল, একটু উঁচু ক্লাসে

উঠলেই ও কলকাতায় দাদুর কাছে থেকে পড়াশুনা করবে। ওর মা-তে বাবা-তে সেই রকমই নাকি কথা হয়ে আছে।

ট্রেনে আরো কিছু মনে পড়াতে বাপীর হাসি পেয়ে গেছল। নাওয়া-খাওয়া ভুলে দু-দুবারের সেই বিশাল ছাপা সরকারী গেজেট এনে পড়া। কেন, সে শুধু ও-ই জানে।

সেই থেকে বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল, আর কেউ থাকুক না থাকুক, মিষ্টি অন্তত কলকাতাতেই আছে। একদিন না একদিন দেখা হয়ে যাবেই। একটা ক্রুর অভিলাষ ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে চেয়েছে। কলকাতায় চাকরি হওয়াটা সেই অনেক অনেক বড় হওয়া আর শোধ নেওয়ার প্রথম ধাপ। কিন্তু এই কলকাতা দেখে বাপী হকচকিয়ে গেছে। ওদের হদিস মেলা দূরে থাক, এই ব্যস্তসমস্ত শহর থেকে মণিদাকে খুঁজে বার করবে কি করে ভেবে পেল না।

মণিদাকে না পেলেও অবশ্য ঘাবড়াবার খুব কিছু নেই। হাতে চারশ টাকার মতো মজুত আছে। চাকরির মাইনেয় কোনো মেসে থাকার খরচা চলেই যাবে। তবু নতুন জায়গায় একটু অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত মণিদাকে পেলে ভালো হয়।

যে জন্যে কলকাতায় আসা সেটা আর যাই হোক, লোয়ার ডিভিশন কেরানীর চাকরি নয়। এ রকম চাকরি বাপী চার বছর আগে ঘরে বসেই করতে পারত। করবে না বলেই ঘর ছেড়েছিল, বাবাকে ছেড়েছিল। চার বছর বাদে বি. এসসি পাশ করার পর সেই লোয়ার ডিভিশন চাকরি মনে ধরার কথা নয়। আকর্ষণ একটাই। কলকাতা। বড় হতে চাও তো বড় গণ্ডিতে এসে বোসো। কলকাতা সেই বড় গণ্ডি। ভাগ্যের জোর থাকলে এখান থেকেই ফকির উজির হয়, ছেঁড়া কাঁথার মানুষ হাত বাড়িয়ে স্বপ্নের লাখ টাকা মুঠোয় ধরে। বাপী তাই কলকাতার এই বড় গণ্ডিতে এসে একটু বসার জায়গা পেয়েই খুশিতে আত্মহারা হয়েছিল। আপার ডিভিশন লোয়ার ডিভিশন নিয়ে মাথা ঘামায় নি। নইলে ওর থেকে অনেক খারাপ ছাত্র নিশীথ সেন আপার ডিভিশন। যত ছোটই হোক, বাপীর কাছে কলকাতায় এসে স্থিতি হতে পারাটাই ভাগ্যের পাশার একটা বড় দান।

কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি হতে না হতে ভিতরে ভিতরে ধাক্কা খেল। কবিরাজ বাবার একজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে নিশীথ রামকাকা বলে ডাকে। নাম রামচরণ গাঙ্গুলী। ক্লাকলিনের কোনো বিভাগের তিনি মেজবাবু। বড়বাবু

মন্মথ সোমের সঙ্গে তাঁর বেজায় খাতির। রেসের মাঠে হরিহর আত্মা দুজনে। এই খাতিরের সুতো ধরে বাপীর চাকরি। বড়বাবু মন্মথ সোমকে অজীর্ণ রোগে ধরেছিল। রামকাকার অনুরোধে নিশীথের বাবা দু'মাস বিনে পয়সায় চিকিৎসা করে তাঁকে সারিয়ে তুলেছেন। সেই মওকায় নিশীথ রামকাকাকে বন্ধুর চাকরির জন্যে ধরে পড়েছিল।

কিন্তু প্রথম দিন খিদিরপুর ব্রুকলিন ডিপোয় হাজিরা দিয়ে বাপী ভিতরে ভিতরে হতাশ। যদিও সেই দিনই কাজে জয়েন করার ব্যাপারে কোনরকম অসুবিধে হয় নি। রামকাকা বাপীকে বড়বাবু মন্মথ সোমের কাছে নিয়ে এসেছেন। বিশাল হলের এক কোণে তিন দিক ঘেরা একটু ছোট জায়গায় তিনি বসেন। সামনে তাকালে সমস্ত দপ্তরটি তাঁর চোখের সামনে।

বাপীর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। যুদ্ধোত্তর হাওয়ায়. কলকাতার কেরানী-বাবুরাও বেশির ভাগ তখন ধুতি ছেড়ে ট্রাউজার আর শার্ট ধরেছে। ধুতি পাঞ্জাবি পরে প্রথম দিন আপিসে উপস্থিত হওয়াটা নিশীথের পছন্দ ছিল না। কিন্তু উপায় কি। বিকৃত মুখ করে বলেছিল, একটু কম ঢ্যাঙা হলেও তো আমারটা দিয়ে দিনকতক চালিয়ে দিতে পারতিস।

বড়বাবুকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে বলে দিয়েছিলেন রাম গাঙ্গুলি। কিন্তু তার সুযোগ কম দেখে বাপী স্বস্তি বোধ করল। চার দিকের চেয়ার ঠেলে টেবিলের তলায় পায়ের নাগাল পাওয়া সহজ নয়। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানালো।

বাপী জানে আগে থাকতে বলা কওয়া আছে। তবু, রাম গাঙ্গুলি পরিচয় দিতে মুখ তুলে চুপচাপ খানিক দেখলেন ওকে। ছোটখাটো রোগা মানুষ, ফ্যাকাশে মুখ। গম্ভীর। যাচাই করে দেখার মতো হিসেবী চাউনি। বসতে বললেন না।

—এ-বছর বি. এসসি পাশ করেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দ্বিতীয় প্রশ্নের আগে বাপী এবারে বুদ্ধিমানের মতো বলল, আমার নাম বিপুল, আপনি তুমি করে বলুন।

— ডিসটিংশনে পাশ করেছ?

—হ্যাঁ স্যর।

—অনার্স পড়লে না কেন?

বাপী এর কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। চুপ করে রইল।

—কোন্ কলেজ থেকে পাশ করেছ?

বলল।

—বাড়ি কোথায় ?

বলল।

—দেশ ?

এবারে একটু মাথা খাটাল বাপী।, দেশ ভাগ হয়েছে যখন কাজে লাগতেও পারে। বলল, দেশ কখনো দেখিনি স্যর, শুনেছি পূর্ববঙ্গে।

বাপী কেন, বাপীর বাবাও দেশ দেখে নি। বড়বাবুর দু চোখ আবার ওর মুখের ওপর আটকে রইল খানিক। তারপর যে মন্তব্যটা করলেন সেটাই অপ্রত্যাশিত এবং হতাশার কারণ।—একেবারে ভাঙা হাটে এসেছ, চাকরি আজ আছে কাল নেই, কি লাভ।

নিশীথ অবশ্য কলকাতায় আসার পর বলেছিল, টেম্পোরারি চাকরি। বাপী জানে গোড়ায় সব চাকরিই টেম্পোরারি। তাছাড়া কেরানীর পাকা চাকরি করছেই বা কে। কিন্তু ভাঙা হাটের চাকরি, আর, আজ আছে কাল নেই শুনে ঘাবড়ালো একটু।

বড়বাবু চেয়ার ঠেলে উঠলেন। ওকে আসতে ইশারা করে সামনে এগোলেন। হল পেরিয়ে বারান্দার ওদিকে আর একটা ঘর। দরজার বাইরে চাপরাসী টুলে বসে। বড়বাবুকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

বাপীকে অপেক্ষা করতে বলে বড়বাবু সুইং ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন। এবং দু মিনিটের মধ্যে ওরও ডাক পড়ল।

মস্ত টেবিলের ওধারে যিনি বসে তিনি বড়বাবুরও ওপরওয়ালা বোঝা গেল। বাঙালী। বড়বাবু অবশ্য তাঁর সামনের চেয়ারে বসে। সাহেব তাঁর সমবয়সী হবেন।

বাপী এবারেও দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার সারল। বাঙালী সাহেব মাথা নাড়লেন কি নাড়লেন না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার শুধু দেখলেন ওকে। তারপর বড়বাবুকে বললেন, ঠিক আছে।

বড়বাবুর ঠোঁটের ফাঁকে এবারে সামান্য হাসির রেখা লক্ষ্য করল বাপী।

ওকে সঙ্গে করে নিজের জায়গায় ফিরলেন আবার। নিজে বসে এবারে ওকেও বসতে বললেন। সেই ফাঁকে আবার একটু দেখেও নিলেন।

—বয়েস কত ?

—বাইশ।

বয়েস পছন্দ হল না কি আর কিছু, বাপী সঠিক বুঝে উঠল না। বয়েসই

হবে বোধ হয়। কারণ, আর একবার মুখ থেকে বুক পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার বললেন, ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটের বয়েস যাই থাক, ঠিক ঠিক বয়েস কত? বলতে বলতে একটা ছাপা ফর্ম বাড়িয়ে দিলেন ওর দিকে, বয়েসের জন্য তোমার চাকরি আটকাবে না—আমার তো তেইশ-চব্বিশ মনে হচ্ছে।

চাকরি পাওয়ার আগ্রহটাই বাপীর সব আপাতত। প্রতিবাদ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ ভাবল। জবাব দিল, হতে পারে স্যর·· সার্টিফিকেটে কমানো আছে কিনা বাবা জানতেন।

হতে পারে শুনে অখুশি নন। ভদ্রলোকের ঠোঁটের হাসিটুকু চেষ্টা করে হাসার মতো। তেমনি একটু হেসে মন্তব্য করলেন, নানা আশায় ছেলের দুই-এক বছর বয়েস সব বাবাই কমিয়ে লেখান। ওই ফর্মটা ফিল আপ করো, সার্টিফিকেটের বয়েসই লিখবে।

অর্থাৎ উনি ধরেই নিলেন বাপীর বয়েস তেইশ-চব্বিশের কম নয়।

পৃথক দরখাস্ত করারও দরকার হল না। ফর্ম ফিল-আপ করা হতে ওতেই তিনি খসখস করে লিখলেন কি, নিজের নাম সই করলেন, তারপর সেটা নিয়ে আবার চলে গেলেন।

মিনিট পাঁচ-সাত বাদে খালি হাতে ফিরলেন। চেয়ারে বসে আবার একটু চেয়ে রইলেন। ভদ্রলোকের এই দেখাটাই কেন যেন অস্বস্তিকর বাপীর কাছে।

—রামবাবুর মুখে তোমার কথা সব শুনেছি, বাবা-মা তো নেই, ভাই-বোন বা অন্য কোনো আত্মীয়-পরিজনও নেই?

রামবাবুর মুখে শোনা মানে নিশীথের মুখে শোনা। সে কি বলেছে না বলেছে কে জানে। তাই জ্যাঠতুতো দাদার কথাও বলা গেল না। জবাব দিল, না স্যর···

খুব সদয় মুখ করে বললেন, ভেরি আনফরচুনেট। যাক, এ কাজটা কিছুই নয়, তার ওপর পিওরলি টেম্পোরারি, স্টিল ক্যারি অন।

সেইদিনই কাজে বহাল হয়ে গেল। তিন-চার দিনের মধ্যেই চাকরির ব্যাপারটা বুঝে নিল। ক্রুকলিন ডিপো যুদ্ধের বহু রকমের মাল স্টকের অফিস। এই আপিস এখন অনেকটাই গুটনো হয়ে গেছে। তবু সময় সময় কাজ জমে গেলে ছাঁটাই কর্মচারীদেরই কিছু কিছু আবার অস্থায়ীভাবে ডেকে নেওয়া হয়। বাপী ছাঁটাই মার্কা না হলেও বড়বাবুর কল্যাণে ঢুকে গেছে।

নিশীথের ওপর গোড়ায় একটু অভিমানই হয়েছিল বাপীর। এরকম

চাকরির জন্য এভাবে ছুটে আসত কিনা সন্দেহ। মাইনে ষাট টাকা ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স আঠোরো—সর্বসাকুল্যে মাস গেলে আটাত্তর টাকা।

মেজাজ খারাপ করে নিশীথকে বলেই ফেলেছিল কথাটা। নিশীথ কানে তোলেনি, বলেছে, ওই বড়বাবুটির ক্ষমতা কত জানিস না, লেগে থাক আর ভদ্রলোকের মন রেখে চল—

উনিশ-বিশ একই কথা রাম গাঙ্গুলি বলেছেন।—বড়বাবু কাউকে রাখবেন বলে ধরে থাকলে তাকে হটানো সহজ নয়, বুঝলে? বাজে ভাবনা না ভেবে তাঁর মন রেখে চলো।

মন রেখে কি করে চলতে হয় বাপীর সেটাই ভালো জানা নেই। চাকরির মাসখানেকের মধ্যে কপাল দেখা রতন বনিক ওর বশংবদ হয়ে ওঠার পর সেও বলেছে, আপনি হলেন গিয়ে বড়বাবুর লোক, আপনার 'রিট্রেঞ্চ'-এর ভাবনা কি! বড়বাবুর ইয়েস তো বড়সাহেবের 'ইয়েস', এনার 'নো' তো ওনারও 'নো'।

বড়বাবুর লোক ভেবেই রতন বনিক ওরও অনুগত হয়ে উঠছে কিনা, বাপীর সেই সংশয়। বড়বাবুর মন পাওয়ার আশায় বাপী শুরু থেকেই যতটা সম্ভব মন দিয়ে কাজ করছে। ছুটির পরেও এক ঘণ্টা তিনি আপিসে থাকেন, বেশির ভাগ চাকুরেরা ছুটির সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু বাপী তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থাকে। বাপীর ধারণা মুখে কিছু না বললেও ভদ্রলোক ভিতরে ভিতরে খুশিই হন একটু।

মণিদার বাড়ির হদিস মিলেছে চাকরিতে ঢোকার চার দিন বাদে। অফিস পালিয়ে নিশীথ তার স্ট্র্যাণ্ড রোডের হেড অফিসে ঠিকানার খোঁজে গেছল। বরাতক্রমে যে ঘরে ঢুকে নিশীথ মণিলাল তরফদারের খোঁজ করছিল, ভদ্রলোক সে ঘরেই দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছিল। নিজের নাম কানে যেতে এগিয়ে এসেছে। মণিদা নিজেই বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে আর বাপীকে চলে আসার কথা বলেছে। পার্ক সার্কাসের দিকে ঠিকানা। নিশীথ তাকে বলে এসেছে বাপী রোববার যাবে। খবরটা দিয়ে নিশীথ মন্তব্য করেছে, তোর মণিদাকে দেখে সেরকম বড় চাকরে-টাকরে মনে হল না রে। বলেছিলি কাস্টমস-এ ভালো চাকরি করে…পরনে দেখলাম ঢলঢলে ট্রাউজার আর গায়ে টুইলের শার্ট—তাও সে রকম পাট-ভাজা পরিষ্কার নয়।

বাপীর ধারণা ছিল মণিদা ভালো চাকরিই করে। তাই বলেছিল। একথা

শোনার পর সেখানে থেকে চাকরি করার কতটা সুবিধে হবে সেই ভাবনা। মণিদার বাড়ির হদিস মিলতে এ ছাড়াও একটু অস্বস্তি। আট বছর আগে বানারজুলির একটা সকাল আর দুপুর ভিতরের কোনো গোপন সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিজের ছেলেবেলাটাকে এক এক সময় একেবারে শেকড়সুদ্ধু টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে বাপীর।

রবিবার সকালে নিশীথ ওকে বাড়ির লেকেলে গাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে গেল। নিজে ঢুকল না কারণ বাবা তাড়া দিয়ে রেখেছে। রবিবার সকালে বাবার কাছে হাতে-কলমে কাজ শিখতে হয়, কবিরাজি ওষুধপত্র বানাতে হয়। কিন্তু বাইরে থেকে মণিদার ফ্ল্যাট দেখেই ও হয়তো অপ্রস্তুত একটু। বেশ ভালো চাকরি না করলে এ জায়গায় এরকম ফ্ল্যাটে থাকা সম্ভব নয়।

রাস্তার ওপর শেষ বাড়িটা মণিদার। সামনে ছোট একটু পার্কের মতো। খোলামেলা জায়গা। নিচের দরজার সামনে দো-ভাঁজ লুঙ্গি করে কাপড় পরা একটি লোক দাঁড়িয়ে। নিশীথ তাকে জিজ্ঞেস করতে সে দোতলাটা দেখিয়ে দিল।

ওকে ছেড়ে নিশীথ নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল।

একতলায় মাদ্রাজী পরিবারের বাস মনে হল। বাপী পায়ে পায়ে দোতলায় উঠে এলো। হাতে রংচটা টিনের সুটকেস আর ময়লা শতরঞ্জী মোড়া দড়িবাঁধা শীর্ণ শয্যা। সিঁড়ির মুখের দরজা পেরিয়ে ভিতরে পা দিতেই হাতের জিনিস দুটো বেমানান লাগল। এও বেশ বড়সড় একখানা ঘরের মতোই। বিস্কুট রঙের তকতকে মেঝে, মাঝামাঝি ডাইনিং টেবিলের চারদিকে চেয়ার। বাপী কখনো টেবিল-চেয়ারে ভাত খায়নি, তবু শস্তার জিনিস যে নয় ওগুলো আঁচ করতে পারে। টেবিলে শৌখিন পেয়ালা আর ছোট বড় ডিশ পড়ে আছে। একটু আগেই বাড়ির লোকেরা প্রাতরাশ সেরে উঠে গেছে বোঝা যায়। ওদিকের দেয়াল আলমারির কাঁচের পাল্লা দিয়ে ঝকঝকে ক্রকারি সেট দেখা যাচ্ছে।

সামনে পর পর তিনটে ঘর। পুরু পর্দা ঝুলছে। শেষের ঘর থেকে রেডিওর গান কানে আসছে।

হাতের টিনের সুটকেস আর বিছানার পুঁটলি চট করে চোখে পড়বে না এমন এক কোণে রাখল বাপী। তারপর প্রথম ঘরের পর্দাটা সরিয়ে দেখল।

এটা বসার ঘর। গদির সোফা সেট ডিভান সাজানো। বাপীর হকচকিয়ে যাওয়ার দাখিল। পর্দা সরানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম চোখাচোখি যার সঙ্গে সে

বছর ছ-সাতের একটি ছেলে। আধশোয়া হয়ে একটা পাতলা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল, তার একখানা পা হাতলের ওপর। পাশের সোফায় মণিদার চোখের সামনে খবরের কাগজ। মুখে আধখানা চুরুট। পরনে চকচকে লুঙ্গি, গায়ে জালি গেঞ্জি।

—বাবা!

দরজায় অপরিচিত লোক দেখে ছেলেটা মণিদাকে ডাকল।

মণিদার মুখের কাছ থেকে কাগজ সরল। চুরুটটা হাতে নিয়ে এক গাল হাসি। কাগজ ফেলে সোফা ছেড়ে উঠল—কত বড় হয়ে গেছিস রে বাপী! আয় আয়—বাড়ি চিনতে অসুবিধে হয়নি তো?

বাপী হাসিমুখে মাথা নাড়ল। অসুবিধে হয়নি। তারপর এগিয়ে এসে মণিদাকে একটা প্রণাম ঠুকল।

তিনটে ঘরেরই মাঝখানে একটা করে ভিতরের দরজা। বাইরের বারান্দার দিকেও একটা করে দরজা। ভিতরের দরজার পর্দাগুলো তোলা এখন।

মণিদা হাঁক দিলেন, কই গো কে এসেছে, দেখে যাও—

হাঁক শোনার আগেই ওই শেষের ঘর থেকে গৌরী বউদি ওকে দেখে এগিয়ে আসছিল। ও-ঘর থেকেই রেডিওর গান শোনা যাচ্ছিল। সেটা এখনো চলছে। কে এলো বা কে আসবে জানাই ছিল নিশ্চয়। কিন্তু এগিয়ে আসতে আসতে গৌরী বউদি যেন খুব পরিচিত মানুষ দেখছে না। এ ঘরে পা ফেলার আগেই বাপী যেটুকু দেখার দেখে নিয়েছে। সামান্য মোটার দিক ঘেঁষেছে গৌরী বউদি, নইলে আট বছর আগে যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। তখন কুড়ি ছিল বয়েস, এখন আঠাশ হবে···! এই আট বছরে মণিদা ফুলে আরো গোলগাল হয়েছে। ফলে তাকে আরো বেঁটে দেখায়। কিন্তু সামান্য মোটা হবার ফলে গৌরী বউদিকে আগের থেকে একটু লম্বা মনে হয়।

মণিদা জিজ্ঞাসা করলেন, ওকে চিনতে পারো?

গৌরী বউদির সেই হাসিমাখা চকচকে চোখ দুটো পরিষ্কার মনে আছে বাপীর। তখন মনে হত, ওই দুটো চোখ দিয়েই গৌরী বউদি অনেক কথা বলতে পারে। এখন কতটা পারে জানে না, এখন সামান্য একটু হাসি শুধু ছুঁয়ে আছে।

বাপীর দিকে তাকিয়েই বলল, জানা ছিল বলে পারছি, না থাকলে পারতুম না। খাসা মানিক-মানিক চেহারাখানা হয়েছে তো এখন!

বাপী তাকেও একটা প্রণাম সারতে গেল। তার আগেই গৌরী বউদি

দু'পা সরে গিয়ে বলল, প্রণাম-টনাম দরকার নেই, বোস—জোয়ান-মর্দ ছেলে পায়ে হাত দিতে এলে বিচ্ছিরি লাগে।

বাচ্চা ছেলেটা বই হাতে সেইভাবেই শোফায় আধ-শোয়া হয়ে নতুন লোকটাকে দেখছিল আর মা-বাবার কথা শুনছিল। তার দিকে চোখ যেতেই গৌরী বউদির সামান্য মেজাজ চড়ল।—এই ছেলে! নবাবের মতো শুয়ে কি পড়া হচ্ছে তোর?

ছেলে সোজা হয়ে বসল।—কি করব বাবা তো শুধু কাগজই পড়ছিল, স্কুলের পড়া দেখিয়ে দিচ্ছিল না—

এমন সামান্য কারণেও গৌরী বউদির চকচকে চোখে বিতৃষ্ণাই দেখল যেন বাপী। কথাগুলোও রূঢ় একটু।—সমস্ত দিন তো বাইরেই কাটাও, সকালের একটা ঘণ্টাও যদি না দেখতে পারো তো কাল থেকেই ওর জন্যে একজন মাস্টার ঠিক করো।

কৈফিয়ত দাখিলের সুরে মণিদা বলল, আজ রোববার, দেব'খন দেখিয়ে—

—তোমার কাছে ওর বারো মাসই রোববার। ছেলের দিকে ফিরল, ওঘরে গিয়ে নিজে যা পারিস পড়গে যা, আমি আসছি—রেডিওটা বন্ধ করে নিস।

বাপী লক্ষ্য করছে মায়ের মতোই মুখ ছেলের। মণিদার আদলের ছিটে-ফোঁটাও নেই। মনঃপূত হোক না হোক মায়ের হুকুমে উঠে চলে গেল। এদিকের পর্দা ঠেলে দরজার কাছ থেকেই গলা একটু চড়িয়ে গৌরী বউদি বলল, ভিখু, চায়ের জল চড়াও, আর মিটসেফ-এ খাবার কি আছে দেখো—

...বানারজুলিতে নতুন বউ গৌরী বউদির সঙ্গে এই গৌরী বউদির কিছু একটা বড় তফাৎ এরই মধ্যে চোখে পড়ছে বাপীর। বানারজুলি থেকে ফেরার আগে বাপীকে গাল টিপে আদর করে এসেছিল মনে আছে। এই গৌরী বউদির আর কিছু না হোক, মেজাজ বেশ বদলেছে বোঝা যায়।

সোফায় বসে মণিদা নেভানো চুরুটটা আবার ধরিয়েছে। দরজা ছেড়ে এদিকে আসতে একটু সহজ হবার তাগিদে বাপী বলল, সকালের চা জলখাবার খেয়েই বেরিয়েছিলাম—

ওর মুখোমুখি সোফাটায় বসল গৌরী বউদি।—কেন, এখানে জুটবে কি জুটবে না ভেবে?

বাপী তাড়াতাড়ি বলল, তা কেন, যতবার দেবে ততোবার খেতে পারি। চট করে অন্য প্রসঙ্গে ঘুরে গেল, ছেলেটাকে এমন তাড়া দিয়ে পড়তে পাঠালে যে আমি কে জানলও না—কি পড়ে, রোববারেও ওর কি এত পড়া?

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে মণিদা বলল, ক্লাস ওয়ান।

ভাগ্যে বাপী হেসে ফেলেনি। কারণ সঙ্গে সঙ্গে রুষ্ট চোখের একটা ঝাপটা খেল মণিদা। সঙ্গে ঝাঁঝালো কথারও।—ক্লাস ওয়ান হোক আর যাই হোক, সঙ্গে নিয়ে না বসলে ওইটুকু ছেলে নিজে থেকে দিগগজ হয়ে যাবে? উইকলির রেজাল্টগুলো চোখ তাকিয়ে দেখেছ একবারও? লজ্জা করে না মুখ নেড়ে কথা বলতে?

মণিদার মুখখানা একটু চুপসেই যেতে দেখল বাপী। তাড়াতাড়ি ওই আবার সামাল দিতে চেষ্টা করল।—তুমি কিছু ভেব না বউদি, এবার থেকে আমিই ওকে নিয়ে বসব—কি নাম ওর?

গৌরী বউদি জবাব দিল না। এবারে মণিদার আগ্রহ দেখা গেল।—তাই তো রে। তোর সেই বন্ধুটি বলছিল ডিস্টিংশনে বি-এসসি পাশ করে তুই এখানে এসে কি একটা চাকরিতে ঢুকেছিস। আমার সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির চাকরির জোয়াল কাঁধে—তুই একটু নিয়ম করে ছেলেটাকে দেখলে তো ভালোই হয়—কি বলো?

শেষের বিনীত জিজ্ঞাসা বউয়ের উদ্দেশে। জবাব না দিয়ে গৌরী বউদি এবারে দু'চোখে বাপীকে যাচাই করে নিচ্ছে। অগত্যা বাপী বলল, ডিস্টিংশনে বি-এসসি পাশ করাটা কিছু নয়—ছেলে পড়িয়ে অভ্যেস আছে। এই করেই তো নিজের পড়াটা চালিয়েছি।

গৌরী বউদির দু চোখ ওর মুখের ওপর থেকে পাশের খোলা দরজার দিকে ঘুরল।—বাচ্চু!

মায়ের এক ডাকে ওদিক থেকে ছেলেটা ছুটে এলো। বাপীকে দেখিয়ে গৌরী বউদি বলল, এ তোর একজন কাকু হয়, এখানে থাকবে—কাল থেকে রোজ সকালে আর সন্ধ্যায় এই কাকু তোকে পড়াবে—বুঝলি?

বাপী দেখল, গৌরী বউদির মুখখানা একটু প্রসন্ন এখন। ছেলের জন্য দুশ্চিন্তা দেখে প্রথম সুযোগে পড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে। এখানে থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে যেটুকু করা যায়। তবু আধঘণ্টা হয় নি এসেছে, মুখের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী বউদির ছেলেকে ডেকে ওই ফয়সলা করে ফেলার মধ্যে এই বিনিময়ের হিসেবটুকুই যেন বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল। মণিদা বা গৌরী বউদি এ পর্যন্ত পিসী বা বাবার সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে নি।

ছেলেটা সোজা তাকিয়ে কাকুর মুখখানা একবার দেখে নিল। জীবটি

বিপজ্জনক কিনা বোঝার চেষ্টা। সে রকম মনে হল না। মায়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, মাস্টার কাকু ?

মাস্টার ঠিক করার কথা প্রায়ই শোনে, তাই এ প্রশ্ন।

—না, বাপী কাকু। জঙ্গলের কতরকম গল্প বলবে তোকে শুনিস'খন। কিছু মনে পড়তে গম্ভীর মুখে সামান্য হাসির আভা ছড়ালো। কি মনে পড়তে পারে বাপী সেটা সেই মুহূর্তে আঁচ করেছে।

ছেলের গলায় অভিমান ঝরল।—হ্যাঁ জঙ্গলের গল্প শুনবে, আজ পর্যন্ত আমাকে চিড়িয়াখানাই দেখালে না তোমরা।

—এবারে কাকু দেখাবে'খন। এখনো এক ঘণ্টা পড়তে হবে, বই নিয়ে বোসগে যা।

দ্বিতীয়বার বলতে হল না, বাচ্চু চলে গেল। ভিখু বাড়ির আধবুড়ো চাকর। তার সামনে ডিশে কিছু খাবার আর এক পেয়ালা চা রাখল। দাদা বউদির সামনেও এক পেয়ালা করে চা রেখে প্রস্থান করল।

পেয়ালা তুলে নিয়ে গৌরী বউদি আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারদের আর কি নতুন ভালবাসাবাসি দেখেছিস ?

ডিশের খাবার সবে একটু মুখে তুলেছিল। বাপীর বিষয় খাবার দাখিল। মাথাটাও ঝিমঝিম করে উঠল। ভিতরের গোপন সুড়ঙ্গ থেকে এক দুপুরের দৃশ্যটা বেরিয়ে আসার জন্য ডানা ঝটপট করেছে। বানারজুলির জঙ্গলের সেই একটা দিন মণিদাও ভোলেনি হয়তো। বউয়ের রসিকতার কথা শুনে তার ভারি গালের খাঁজে খাঁজে হাসি ছড়িয়ে পড়ছে।

পলকা ধমকের সুরে গৌরী বউদি আবার বলল, বল না। ইস লজ্জা দেখো ছেলের—

বাপীর মনে হল, গৌরী বউদি ওকে সেই আট বছর আগের মতোই বোকা ভাবছে। এখনো সেই বোকাবোকা ভাবটাই ধরে রাখার চেষ্টা বাপীর। লোকের চোখে ধুলো দেবার মতো এর থেকে ভালো কৌশল জানা নেই। হাসতে চেষ্টা করে বোকার মতোই বলল, তখন কি কিছু বুঝতাম নাকি!

…বানারজুলিতে এই গৌরী বউদির মুখে অনেক রকমের খুশির ছটা দেখেছিল বাপী, মুখে খিলখিল হাসি দেখেছিল।…জঙ্গলে যাবার আগে পাটভাঙা শাড়ি পরার পর ওকে পিছনে পায়ের দিকটা টেনে দিতে বলেছিল, আর উদ্ভট ফরমাসটা না বুঝে বাপী উপুড় হয়ে বসে শাড়ির ওপর দিয়ে দু হাতে তার একটা পা চেপে ধরে কি করে টানবে ভেবে পাচ্ছিল না। গৌরী বউদি তখন ওকে

হাঁদা বলেছিল আর হেসে সারা হয়েছিল।...তারপর জঙ্গলে ওর সেই সব কথা শুনে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে হেসেছিল আর ঘন ঘন সেই হাসি মণিদার দিকে ঠিকরে পড়ছিল। এ পরিস্থিতি অতটা হাসির না হলেও বাপীর মনে হয়েছে গৌরী বউদি এখন আর সেরকম হাসে না বা হাসতে পারে না। ধার ধার মুখের এই হাসির মধ্যে যেন কিছু হিসেব লুকনো আছে। অপচয় নেই।

ঠোঁটের ফাঁকে এমনি একটু হাসি খেলে গেল। ভুরুর মাঝে হাল্কা ভাঁজ পড়ল একটু।—এখন সব বুঝে ফেলেছিস? তার পরেই আত্মস্থ।—যাক্ জঙ্গলের গল্প করতে গিয়ে ছেলের মাথায় আবার এসব ঢোকাতে যেও না।

বাপী তখুনি মাথা নাড়ল। অমন কাজ সে করবে না। এর ফলেও গৌরী বউদি কয়েক পলক চেয়ে রইল। এই বয়সের ছেলের সরলতা দেখে ভিতরে ভিতরে মজা পাচ্ছে হয়তো।

মণিদা প্রসঙ্গ ঘোরালো। ওর চাকরির খোঁজ নিল। শোনার পর বীতশ্রদ্ধ।—বি-এসসি ডিস্টিংশনে পাশ করার পর এই চাকরি করতে ছুটে এলি, মাইনে কত?

গৌরী বউদির সামনে এ প্রশ্নটাই যেন কাম্য ছিল। অকপটে বলে দিল, সব মিলিয়ে মাসে আটাত্তর টাকা—

—দেখ কাণ্ড। হালছাড়া চোখে মণিদা একবার তার বউয়ের দিকে তাকালো। তারপর ওকেই বলল, এরকম কেরানীর চাকরি করবি তো আমাকে জানালি না কেন, আমার ওখানে চেষ্টা করে দেখতাম। কাকাও তো লিখলে পারত—

—বাবা চার বছর আগে মারা গেছেন, তোমাকে বললাম না টিউশনি করে নিজের পড়া চালিয়েছি।

গৌরী বউদি নির্লিপ্ত কিন্তু মণিদা অপ্রস্তুত একটু।—জানব কি করে বল, তুইও তো কিছু লিখিসনি। পিসীর মারা যাবার খবর অবশ্য কাকাই জানিয়েছিল।

বাপী তাড়াতাড়ি কাজের কথায় ফিরে এলো।—এ চাকরিও একেবারে টেম্পোরারি, কবে আছে কল্ নেই— তোমার ওখানে এখনো একটু চেষ্টা করে দেখো না মণিদা।

মণিদার গলায় এবারে অতটা উৎসাহ নেই। বলল, দেখি—

কিন্তু এটুকু আশার মুখেও গৌরী বউদি ছাই ঢেলে বসল—যাক, তোমাকে

আর দেখতে হবে না, যা করছে করুক পরে দেখা যাবে'খন—তোমার ওখানে ঢুকে পরের ছেলে হাত-কড়া পরুক শেষে।

বাপী অবাক। সত্যি মাথায় কিছু ঢুকল না। মণিদা সামাল দিতে চেষ্টা করল, বললেই কি চাকরি হওয়া অত সহজ নাকি—

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাইরে চটির শব্দে ঘাড় ফেরালো।—এসো সন্তু এসো—

মণিদার ওখানে ঢুকলে হাত-কড়া কেন পরতে হবে তখনকার মতো বাপীর সেটা দুর্বোধ্যই থেকে গেল।

দামী চটির আওয়াজ তুলে পর্দা ঠেলে যে ঘরে ঢুকল বেশ লম্বা একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষ। বয়েস বত্রিশ-তেত্রিশের মধ্যে। গায়ের রং ফর্সা, মুখ সুন্দর নয়। পরনে দামী কাপড়ের সাদা পাজামা গায়ে মুগার পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির দুটো হাতই পাঁচ-ছ' আঙুল করে গোটানো। এক হাতের আঙুলে ঝকঝকে সাদা পাথরের আংটি, অন্য হাতে নীল পাথরের। ডান হাতের পুষ্ট কব্জিতে মস্ত একটা সোনার ঘড়ি। পাঞ্জাবির বুক খোলা, তার একদিকে সোনার চেনে সোনার বোতাম আটকানো। সব কটা বোতামের মাঝখানে একটা করে পাথর ঝিকমিক করছে—ওগুলোর নামই হীরে কিনা বাপী জানে না।

ভদ্রলোক নতুন মুখখানা দেখে নিয়ে বলল, রোববারের আড্ডা জমে গেছে দেখছি—

সোফায় মণিদার পাশে বসল। মণিদা নেভা চুরুট অ্যাশপটে গুঁজতে গুঁজতে পরিচয় দিল, আমার খুড়তুতো ভাই বাপী এসেছে উত্তরবঙ্গের সেই বানারজুলির জঙ্গল থেকে এখানে চাকরি করতে—ওর সঙ্গে গল্প করছিলাম।

জলপাইগুড়ির পাঁচটা বছর মণিদার মাথায় নেই। ব্যাকব্রাশ চুলের দরুণ ভদ্রলোকের কপালখানা বেশি চওড়া দেখায়। সে তুলনায় চোখদুটো সামান্য ছোট। হাসিমাখা চাউনি বাপীর মুখের ওপর। হালকা মন্তব্য করল, জঙ্গল থেকে এসেছে বলছ, ভায়ার মুখখানা দেখে মনে হয় বৃন্দাবন থেকে আসছে।

মণিদা জোরেই হেসে উঠল। কিন্তু বাপীর চোখ তখন গৌরীবউদির দিকে। মুখের ধার-ধার ভাব মিলিয়ে গেছে। রসিকতা উপভোগ করল, হাসির সঙ্গে আবার একটু ঠেসও ছুঁড়ে দিল।—তোমার কি আর অত ভুল হয়, জঙ্গল থেকে এলেও ওর ভেতরখানা বৃন্দাবন থেকে আসার মতোই।

সাদা কথায় আবার বোকাই বলা হল ওকে। কিন্তু শুধু ওর ভেতর বোঝানোর জন্যে গৌরী বউদি যেন কথাগুলো বলল না। মণিদার এতেও

হাসি। তারপর বাপীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, এ হল সনৎ চৌধুরী, মস্ত কণ্ট্রাক্টর, পাশের বাড়িটা ওর—

বাপীর খুব ইচ্ছে করছিল, উঠে এসে সনৎ চৌধুরীকেও একটা প্রণাম ঠুকে গৌরী বউদিকে বুঝিয়ে দেয়, সত্যি কত জলভাত ছেলে ও। পেরে উঠল না। কোনরকমে ছ'হাত জুড়ে নমস্কার সারল।

পকেট থেকে শৌখিন সিগারেট কেস বার করে ভদ্রলোক নিজের ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝুলিয়ে কেসটা মণিদার দিকে বাড়িয়ে দিল।

মণিদা বলল, সিগারেট তো খাই-ই না, তবে তোমার দামী সিগারেট দেখলে লোভ হয়, দাও—

সিগারেট ধরিয়ে সনৎ চৌধুরী হৃষ্টমুখে বাপীর দিকে তাকালো।—ভায়ার এখানে থাকা হবে নাকি?

হাঁ বা না কিছুই না বলে বাপী হাসতে চেষ্টা করল একটু। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মণিদা বলল, হ্যাঁ, কলকাতায় আমি ছাড়া ওর আর কেউ কোথাও নেই—

এই প্রশ্ন আর জবাবের মধ্যে গৌরী বউদি মজার কি পেল বাপী জানে না। কিন্তু মজাটুকু শুধু চোখেই ঠিকরলো। মুখে বলল, আমাদের তো মোটে তিনখানা ঘর, সন্তুর ওখানেও পাঠিয়ে দিতে পারো—অতবড় বাড়িতে একলা থাকে—দুজনেরই উপকার হবে।

নাম ধরে ডাকাটা বাপীর কানে ধরা পড়েছে। সনৎ বা সন্তু চৌধুরীর হাসিমাখা ভ্রূকুটি গৌরী বউদির দিকে।—উপকার হবে কিরকম?

—ও একটু চালাক চতুর হবে আর তুমি সৎসঙ্গ পাবে।

বাপী ছাড়া সকলেই হাসছে। কিন্তু শুধু মণিদার হাসিটা বোকা-বোকা লাগছে বাপীর।

মণিদা বলল, যাই বাজারটা সেরে আসি—

সন্তু চৌধুরী তক্ষুনি বলল, চলো আমিও যাই—

গৌরী বউদি সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকালো।—এই! একরাশ বাজার করে এনে আমাকে হেঁসেলে পাঠানোর মতলব?

সন্তু চৌধুরীর সাদামাটা জবাব, ছুটির দিনে আমার শুধু একটু ভালো খাওয়ার মতলব—সেটা তোমার ভিখুর দ্বারা সম্ভব হলে হেঁসেলে যাবে না।

এ কথার ফাঁকে বাচ্চু লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকে সোজা সন্তু চৌধুরীর কোলে এসে জাঁকিয়ে বসল।—সন্তুকাকু, মা বলেছে আমি ওই বাপী কাকুর

সঙ্গে এবারে চিড়িয়াখানা দেখতে যাব।

—খুব ভালো কথা। কবে?

জবাবের আশায় বাচ্চু তার মায়ের দিকে তাকালো। মুহূর্তের মধ্যেই কিছু একটু ভেবে নিল গৌরী বউদি। সন্তু চৌধুরীকেই জিজ্ঞাসা করল, দুপুরের দিকে তোমার গাড়িটা ফ্রি থাকবে?

—হুকুম হলেই থাকবে।

মণিদা জামা-কাপড় বদলাতে যাচ্ছিল। বাধা পড়ল।—দুপুরে তোমার কি কাজ?

মণিদার বিব্রত মুখ।—খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রামের পর আমার তো একবার বেরুতেই হবে।...গাড়ি থাকলে আর কি, বাপীই নিয়ে যেতে পারবে'খন।

ঘর ছেড়ে চলে গেল। গৌরী বউদি ছেলেকে বলল, ঠিক আছে, আজই যাবি।

বাচ্চু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। কিন্তু সেই মুহূর্তে স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা সাড়া পড়ে গেল বাপীর।...গৌরী বউদির ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি, পলকের তেরছা চাউনি সন্তু চৌধুরীর মুখের ওপর। বাপীর মনে হল, গৌরী বউদি ছেলেকেই শুধু খুশি করল না। পলকের ওই কটাক্ষে সন্তু চৌধুরীর প্রতিও কিছু যেন অযাচিত করুণার আশ্বাস।

...ভদ্রলোকের ছোট ছোট চোখে হাসি চিকচিক করছে।

সুখ কাকে বলে?

চেয়ারে বসে টেবিলের ভালো ভালো সাজানো খাবার আয়েস করে গলা দিয়ে নামানো? ভালো ঘরে খাটের ওপর গদির বিছানায় শুয়ে আরামে রাত কাটানো?

তা যদি হয় তো দেড়টা মাস বেশ সুখেই কেটে গেল বাপীর। বাইশ বছরের মধ্যে এমন সুখ আর আরামের নাগাল আর কখনো পায় নি। তবু ভোর হতে না হতে ঘুম ভাঙে। এটা বরাবরকার অভ্যাস। কিন্তু এই সুখ যখন ছিল না, ঘুম ভাঙার পরেও তখন ইচ্ছে করলে বিশ-তিরিশ মিনিট আমেজের মধ্যে কাটিয়ে দিতে পারত। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে এখন এই গদির শয্যা পিঠে খোঁচা মেরে তুলে দেয়।

খাট-পাতা মাঝের ঘরটা সম্ভবত অতিথি-অভ্যাগতর জন্য। কিন্তু দেড়

মাসের মধ্যে বাপী একমাত্র পাশের বাড়ির সন্তু চৌধুরী ভিন্ন এই ফ্ল্যাটে অন্য কোনো নতুন মুখ দেখে নি। শুধু খাট নয়, দেয়াল ঘেঁষে চকচকে ড্রেসিং টেবিলও আছে একটা। জিনিসপত্র রাখার দেয়াল আলমারি আছে। ড্রেসিং টেবিলের পাশে আলনাও। গৌরী বউদি বাপীর জন্য এই ঘরটাই বরাদ্দ করেছে। খাটে নিজের ছেঁড়া-খোঁড়া বিছানা-বালিশেরও ঠাঁই হয় নি। গৌরী বউদি বলেছে, তোর ওই রাজ-শয্যা এখানে চলবে না— সরিয়ে রাখ।

নিজেই চাদর বালিশ আর একটা সুন্দর বেড-কভার বার করে দিয়েছে। বলেছে, সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে—আমি নোংরা দেখতে পারি না।

গোড়ার তিন-চার দিনের মধ্যে নিশীথ ওর খবর নিতে এসেছিল। থাকার ব্যবস্থা দেখে ওরও চমক লেগেছিল।—লোয়ার ডিভিশন হলে কি হবে, রাজার হালে আছিস দেখছি।···তোর মণিদা তাহলে বড় চাকরিই করেন।

এত আরাম সত্ত্বেও ভোর না হতে বাপীর ঘুম ভাঙে। বাথরুম, মুখ-হাত ধোয়া সেরে বসার ঘরের দরজা খুলে পা-টিপে তিনতলার ছাদে উঠে যায়। আধ ঘণ্টার ওপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো মজবুত আর তরতাজা রাখার মহড়া চলে। নিঃশব্দে খানিক হাত-ছোঁড়াছুঁড়ি ঝাঁপাঝাঁপির পর লম্বা ছিপছিপে শরীরটাকে নানাভাবে দুমড়ে বাঁকিয়েচুরিয়ে হাড়গোড়সুদ্ধ যথেচ্ছ বশে আনার চেষ্টায় দরদর করে ঘাম ছুটতে থাকলে এ-পর্বের শেষ। বানারজুলির দৌড়-ঝাঁপ আর জঙ্গল টহল দিয়ে বেড়ানো বন্ধ হবার পর থেকে বাপীর এই অভ্যেস। কোন দিন বাদ পড়লে বিচ্ছিরি লাগে, গা ম্যাজম্যাজ করে। ঘরের বদলে এখানে খোলা ছাদ পেয়ে আরো সুবিধে হয়েছে। দেড় মাস ললিত ভড়ের বাড়িতে একসঙ্গে কাটানোর সময় সেই পেটুক-ভড় ওর এই কসরত করা দেখে খুশি হয়ে দু-তিনটে যোগ-ব্যায়ামও শিখিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, জানতাম তো অনেক কিছু, এসব করলে রাক্ষুসে খিদে হয়—তাই ছেড়ে দিয়েছি।

ঘাম মরতে সময় লাগে। ততক্ষণে পুবের কোণে লাল সূর্যটা খুব একটু একটু করে আকাশের ডাঙায় উঠে বসে। বাপীর ভিতরে তখন শুচি ভাব-টাব কিছু জাগে না। দেখতে শুধু ভালো লাগে। রোজ দেখে রোজই নতুন মনে হয়।

নিচে নেমে প্রথম কাজ শেভিংয়ের পর নিঃশব্দে স্নান সেরে আসা। আগে তিন দিনে এক দিন শেভ করত।—কিন্তু গৌরী বউদির তাও চোখে লেগেছিল। একবার চারদিন পরের শেভ করা মুখের দিকে চেয়ে চা খেতে

খেতে বলেছিল, কালো মুখখানা তো ভালই দেখায়, খোঁচা খোঁচা দাড়ি রেখে ভূতের মতো থাকিস কেন—রোজ কামাতে পারিস না ?

গৌরী বউদি মিষ্টি কথায় ধার ধারে না। এই বলাটুকুর মধ্যেও বকুনির সুর। শুধু শেভ করা নিয়ে নয়, বাড়িতে আধ-ময়লা ধুতি পরে থাকাটাও তার চক্ষুশূল। সেই গোড়ায় তিন-চার দিনের মধ্যেই বলেছিল, বাড়িতে পরিষ্কার পা-জামা পরবি, টাকা না থাকে তো আমার থেকে ধার নিয়ে কয়েকটা করিয়ে নে—মাস কাবারে দিয়ে দিবি।

পুঁজির টাকায় হাত পড়ে নি। সেই দিনই আপিস ফেরত একসঙ্গে তিনটে পাজামা আর তিনটে সাদা পাঞ্জাবির অর্ডার দিয়ে এসেছিল। আপিসের জন্য পাঞ্জাবি বানানোর কথা আগেই ভেবে রেখেছিল।

...গৌরী বউদির ধারালো মুখে হাসি-ছোঁয়া রসিকতাও ঝরে। প্রথম যেদিন শেভিংয়ের পর স্নান সেরে মাথা আঁচড়ে সেই পাজামা পাঞ্জাবি পরে চায়ের টেবিলে এসে বসেছিল, গৌরী বউদি বড় বড় চোখ করে ওর দিকে চেয়ে ছিল। ঠোঁটে হাসির ফাটলও দেখা গেছল একটু। তারপর বাচ্চু আর মণিদার সামনেই বলেছিল, বাঃ, তোকে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছে যে রে!

মণিদা ভারী মুখ টিপে হাসছিল। মায়ের কথা শুনে আরো বেশি হেসেছিল সাত বছরের ছেলেটা। আর যতটা সম্ভব বোকার মতো লজ্জা পেতে চেষ্টা করছিল বাপী। কিন্তু ভিতরের গোপন সুড়ঙ্গ থেকে কারা যেন কিলবিল করে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

স্নান সারা হবার পর বাপীর একটা বড় কাজ কাতুকুতু দিয়ে আর খুনসুঁটি করে বাচ্চুর ঘুম ভাঙানো। এখানে আসার চার-পাঁচ দিনের মধ্যে মায়ের কাছে বায়না তুলে বাচ্চু তার শয্যা বদল করেছে। এতদিন ছেলেটা বাড়িতে প্রায় নিঃসঙ্গ ছিল। কার সঙ্গে কথা বলবে, কার সঙ্গে খেলা করবে? সন্তু কাকা অবশ্য খুব ভালো, ওকে কত রকমের খেলনা কিনে দেয়, ছবির বই কিনে দেয়, ওর জন্য বড় বড় লজেন্স চকোলেটের বাক্স নিয়ে আসে। কিন্তু এক রবিবার সকালে ছাড়া তাকে আর পাচ্ছে কতটুকু। সন্ধ্যার পরে যখন আসে তখন কেবল মায়ের সঙ্গেই আড্ডা দেয়। বাচ্চুকে তখন পড়ার বই নিয়ে বসতে হয়। বাবা বেশির ভাগ দিন সকাল দশটায় বেরিয়ে রাত দশটার আগে বাড়ি ফেরে না। যেদিন আগে এসে পড়ে সেদিন অবশ্য বাচ্চুর খুব মজা। বাবা ওর সঙ্গে গল্প করে, খেলা করে, নিজের হাতে খাইয়ে দেয়। মায়ের সঙ্গেই ওর সব থেকে কম ভাব। মা মারে-টারে না, কিন্তু একটু কিছু হলেই এমন করে

তাকায় যে তাতেই ওর কান্না পায়। মা কখনো ওর সঙ্গে খেলেটেলে কিনা বা ওকে আদর করে কিনা জিজ্ঞাসা করতে ছেলেটা পরিষ্কার জবাব দিয়েছিল, মা খেলতেও জানে না, আদর-টাদরও জানে না।

দুদিনের মধ্যেই বাপী কাকুকে খুব ভালো লেগে গেছে বাচ্চুর। ওর ভিতরেও তো কত কথা জমা হয়, কিন্তু সে-সব শোনার বাড়িতে আর দ্বিতীয় লোক নেই। বাপীকাকু শোনে, হাসে, ওর বুদ্ধির তারিপ করে। বিকেলে আপিস থেকে ফিরে ওকে নিয়ে বেড়াতে যায়, নয়তো দুজনে ছাদে গিয়ে হুটোপুটি করে। কিন্তু খেলাধুলো বা ছুটোছুটিতে এতবড় মানুষটা কেন যে সব সময় ওর সঙ্গে হেরে যায় বাচ্চু ঠিক বুঝতে পারে না। আর কত রকমের মজার গল্প করে করে পড়ায়। পড়তে একটুও খারাপ লাগে না।

রাতে বাপীকাকুর সঙ্গে শোয়ার হুকুম মিলেছে এই পড়াশুনার ছুতো ধরে। বাবা-মা ঘুম থেকে ওঠে সাড়ে সাতটায়, বাচ্চু তারও পরে। মুখ হাত ধোয়া আর সকালের খাওয়া সেরে পড়তে বসতেই সাড়ে আটটা। ওদিকে ন'টা বাজতে না বাজতে বাপীকাকুর আপিসের তাড়া। সকালে পড়বে কখন। অথচ বাপীকাকু ওকে বলেছে, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে পারলে বাবা-মা ওঠার আগে ওর পড়াই শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সকালে ও ওঠে কি করে?

পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে ছেলের পড়াশুনার উৎসাহ তার মা ঠিকই লক্ষ্য করেছে। আর ফাঁকে ফাঁকে সকাল সন্ধ্যায় বাপীর পড়ানোর ব্যাপারটাও ঠিকই দেখেছে। যত হাঁদাই ভাবুক, গরিবের ছেলের এদিকে যে কিছু পটুতা আছে, সেটা তার মনে হয়েছে। এই জন্যেই শেষে ছেলের বাপীকাকুর সঙ্গে শোয়ার অনুমতি মিলেছে।

বাপী ঠিক ছ'টায় ওকে ঠেলে তোলে। মুখ হাত ধুইয়ে পড়াতে বসতে সাড়ে ছটা। আটটার মধ্যে পড়া শেষ। অত ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতে সহজে চায় না। কিন্তু ওঠার পরে ওইটুকু সকালের মধ্যে স্কুলের সব পড়া সেরে ফেলার মজাটাও জানা ছিল না। আর প্রথম দিনেই ওর পড়া নিয়ে বাপীকাকুর সাহস দেখে তো বাচ্চু অবাক। চায়ের পাট শেষ হতে মা বলেছিল, যা আবার বই নিয়ে বোস্‌গে—

মায়ের হুকুম হলে বাচ্চু প্রতিবাদ জানে না। বাচ্চু কেন, কেউ জানে না। কিন্তু বাপীকাকু টক করে বলে দিল, সকালে দেড় ঘণ্টা টানা পড়া হয়ে গেছে, আবার বই নিয়ে বসবে কি! ওকে বলেছে, না রে, এখন আর পড়তে হবে না, তোর খেলার জিনিস কি আছে বার কর, আমি দেখব। তারপর

আবার হেসে মাকে বলেছে, আমার হাতে ছেড়েছ, কটা দিন সবুর করে দেখো—

বাচ্চু ভেবেছিল, মা রেগেই গেল। বাপীকাকুর দিকে ভুরু কুঁচকে একটু তাকিয়েও ছিল। তারপর বাবার দিকে ফিরে কি রকম মজার সুরে বলেছিল, আবার দেমাকও একটু আছে দেখি!

বাপীর আপিস সেই খিদিরপুরে। নটার মধ্যে সে একলাই ভাত খেতে বসে যায়। মণিদা সাড়ে নটায় খেতে বসে। তার আগে বাপী খাওয়া শেষ করে বেরিয়েই পড়ে। সকালের খাওয়ার সময় কেউ তদারক করতে আসে না। তবু ভিখুর কল্যাণে সকালের সেই তাড়ার মধ্যেও খাওয়াটা ভালই জোটে। দশটা-পাঁচটা আপিস। লোয়ার ডিভিশন হলেও সেখানকার আপার ডিভিশনরাও ইদানীং ওর প্রতি তলায় তলায় ঈর্ষান্বিত একটু। তার কারণ বড়বাবু মন্মথ সোমের অহেতুক স্নেহ। সেই স্নেহ যে এখন বাড়তির দিকে সেটা বাপীই সব থেকে ভালো অনুভব করতে পারে।

বড়বাবুকে হাসতে বড় দেখে না কেউ। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলার সময় মন্মথ সোম একটু-আধটু হাসেনও। প্রায়ই ওকে নিজের খুপরিতে ডেকে নিয়ে সামনে বসিয়ে কাজ করান। সকলের চোখে, বাপীর চোখে তো বটেই, এ-ও এক ভাগ্যের লক্ষণ। কাজের ফাঁকে অন্য কথাও দু-চারটে বলেন। বাপী এখন কোথায় আছে তাও জেনে নিয়েছেন। অত দূর থেকে ট্রাম-বাসের ভিড় ঠেলে ঠিক দশটায় হাজিরা দেওয়া ধকলের ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাপীর কখনো লেট হয় না—এজন্যেও ভদ্রলোক খুশি। নিজের মুখেই সে-কথা বলেছেন। চাকরি-বাকরির মন্দা বাজার আর অনিশ্চয়তার কথাও মাঝে মাঝে বলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ দেন, লেগে থাকো, আমি তো আছি—দেখা যাক।

ছুটোর সময় নিজের একটা খুপরি ঘরে টিফিন করতে যান তিনি। ইদানীং মাঝে মাঝে বেয়ারা মারফৎ সেখানেও ডাক পড়ছে বাপীর। নিজের টিফিন বাক্স থেকে টিফিন বার করে ওকে খেতে দেন। বাপী তখন খুব লজ্জায় পড়ে যায়। কিন্তু ভদ্রলোক বলেন, আমি তো তোমার বাবার মতো, লজ্জা কি, খাও।

কেরানী মহলে মন্মথ সোমের সুনাম খুব নেই। কিন্তু বাপী মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারে না। নিশীথের বাবা তাঁর রোগ সারিয়েছেন, সেই কৃতজ্ঞতায় অজানা অচেনা একটা ছেলের প্রতি এত স্নেহ যাঁর, বাপী তাঁকে খারাপ ভাববে

কেমন করে। নিশীথের রাম-কাকাও মাঝে মাঝে ওকে বলেন, বড়বাবু তোমার ওপর খুব খুশি—তোমার ভাবনা নেই।

অতএব, মাইনে যা-ই হোক, আপিসেও বাপীর সুখের দিনই চলেছে। বিকেলে বাড়ি ফেরার দশ মিনিটের মধ্যে খাবার টেবিলে ভিখু জলখাবার সাজিয়ে দেয়। পরিপাটী ব্যবস্থা। ভিখুর ওঠ--বসা চলা-ফেরা সবই বাড়ির কর্ত্রীর নির্দেশে। এখানে কর্তা কেউ নেই, একজন শুধু কর্ত্রী। ভালো খাওয়া-দাওয়া বা আরামে থাকার ব্যাপারে গৌরী বউদির এতটুকু কার্পণ্য নেই সেটা স্বীকার করতেই হবে। রাতের খাওয়া সকালের থেকেও ভালো। খাবার টেবিলে সে-সময় বাপীর দোসর শুধু বাচ্চু। মণিদা তো থাকেই না, গৌরী বউদিও সে সময় কমই বাড়ি থাকে। থাকলেও রেডিওর গান বা নাটক শোনে। নয়তো গল্পের বই পড়ে। সন্তু চৌধুরী এলে তার সঙ্গে গল্প করে।

রাতের খাওয়ার পর বাচ্চুর সঙ্গে গল্প কবতে করতে আরামের শয্যায় শুয়ে ঘুম।

যা-ই হোক, সুখের এই যদি হিসেব হয়, বাপী সুখে নেই এ সে নিজেও জোর করে বলতে পারবে না। কিন্তু থেকে থেকেই বাপীর কেমন মনে হয়, এরকম সুখের সঙ্গে কোনো শিকড়ের যোগ নেই। একটা আলগা সুখের হাওয়ায় ও ভাসছে। হঠাৎ কোনো কারণে হাওয়াটা বন্ধ হতে পারে। হলে ধুপ করে মাটিতে আছড়ে পড়তে পারে।

ফলে এই দুটো মাস চোখকান সর্বদাই সজাগ তার। সুবিধে এই, মুখ দেখে সেটা কেউ বুঝতে পারে না। এই দেড়টা মাসে বাপী অনেক জেনেছে, অনেক বুঝেছে।

মণিদা তেমন বড় চাকরি কিছু করে না। কাস্টমস-এর ইন্সপেক্টর। আগে ছিল প্রিভেনটিভ অফিসার, তার থেকে ইন্সপেক্টর হয়েছে। মণিদা কথায় কথায় নিজেই গল্প করেছে, এর মধ্যে বার দুই আর একটা প্রমোশনের কথা উঠেছিল তার। কিন্তু আর প্রমোশন-টমোশন সে চায় না। এই বেশ আছে।

কেন বেশ আছে বাপী ভালই আঁচ করতে পারে। সেই আটচল্লিশ সালে ইন্সপেক্টরের মাইনে সর্ব-সাকুল্যে সাড়ে চারশ-পাঁচশর মধ্যে। বাপীর ধারণা, ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে এই হালে মাস চালাতে কম করে বারোশ টাকা লাগে মণিদার। সেটা কি করে আসে আর কোত্থেকে আসে বোঝা কিছু শক্ত নয়। বাবার সেই ঠাট্টা ভোলে নি। বলেছিল, ওখানে তো মাইনের থেকে

উপরি বেশি শুনেছি। প্রমোশন নিলে এই উপরিতে ঘাটতি পড়ে নিশ্চয়। মণিদা কেন সকাল দশটায় বেরিয়ে রাত দশটার আগে ঘরে ফেরে না তাও আঁচ করা সহজ। কাস্টমস-এর ব্যাপারে হানাদারির কাজ লেগেই আছে। এটা যত বেশি হয়, পকেটে কাঁচা টাকার আমদানিও ততো বাড়ে। শুধু টাকা কেন, ভালো ভালো জিনিসও কম আনতে দেখছে না বাপী।

ফাঁকতালে মণিদাকে নিজের ওখানে চাকরির তাগিদ দিতে গিয়ে বাপী আরো কিছু বুঝে নিয়েছে। মণিদা খোলাখুলি বলেছে, কেরানীর চাকরির ভবিষ্যৎ ওখানেও কিছুই নেই। আর প্রিভেনটিভ অফিসারের চাকরি সে-রকম ধরা-করার জোর না থাকলে হয়ই না। তার ওপর ঘুষ লাগে এন্তার। এই প্রসঙ্গেও নিজের সম্পর্কে বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছিল। প্রিভেনটিভ অফিসার থেকে প্রমোশন পেতে আমারই কালঘাম ছুটে গেছল, বুঝলি? বছরের পর বছর ওই এক জায়গায় ঘষ্টে মরছিলাম। শেষে সন্তুর এক খাতিরের মুরুব্বির জোরে হয়েছে—তাও কি এমনি, করকরে পাঁচটি হাজার টাকা তার পকেটে গুঁজে দিতে হয়েছে।

দুয়ে দুয়ে চারের হিসেবটা বাপী বড় সহজে করে ফেলতে পারে। ওর ধারণা মুরুব্বির পকেটে গোঁজা ওই পাঁচ হাজার টাকাও সন্তু চৌধুরীর পকেট থেকেই খসেছে। কিন্তু মণিদার উন্নতির জন্য তার এত উদার হবার কারণ কি?

সন্তু চৌধুরীর গল্প শুনতেও বাকী নেই। মোটামুটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। শিবপুরে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পড়তে মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছিল। মামার কনট্রাক্টরি ব্যবসায় ঢুকে পড়েছিল। সেই মামাটির আবার অনেক রকম বদ দোষ আর নেশা-টেশা ছিল। হুট করে মরেই গেল একদিন। ব্যবসার হাল সেই থেকে সন্তু চৌধুরীর হাতে। রোজগারপাতি আগেও ভালই হচ্ছিল। একেবারে লাল হয়ে গেল এই যুদ্ধের বাজারে। ধুলো-মুঠি ধরলে সোনা।

বাপী বোকা-মুখ করে জিজ্ঞাসা করেছিল, ভদ্রলোকের এত টাকাকড়ি, তবু এত বয়েস পর্যন্ত বিয়ে করলেন না যে?

কত আর বয়েস, বত্রিশ-তেত্রিশের বেশি নয়। করবে হয়তো একদিন। হেসে হেসে মণিদা বলেছিল, মেয়ে জাতটার ওপরেই ওর বিতৃষ্ণা—এখন যারা এগিয়ে আসে তারা কেবল নাকি ওর বাড়ি গাড়ি আর টাকা দেখে এগিয়ে আসে—ওকে দেখে নয়। মামার সঙ্গে যখন ছিল, তখন এক মেয়েকে ওর

মনে ধরেছিল, আর স্মার্ট ছেলে দেখে সেই মেয়েও বেশ ঝুঁকেছিল। কিন্তু মামার ফার্ম শুনে বাড়ির লোক ছেড়ে সেই মেয়েও বেঁকে গেল। সেই মামার ফার্মে তখন যে ও চার আনার মালিক হয়ে বসেছে রাগের চোটে সেটা আর বললই না। আর একবার এক জায়গায় বিয়ে প্রায় ঠিক, কিন্তু সেই বাড়ির লোকেরা চুপি চুপি ওর ব্যাংক-ব্যালেন্সের খবর নিচ্ছে দেখে রেগে-মেগে বিয়ে ভণ্ডুল করে দিল।

আসলে ও একটু স্নেহের কাঙাল, বুঝলি। তোর বউদির কাছে ওটুকু পায় বলেই কেনা হয়ে আছে।

মণিদার এভাবে বলার আগ্রহটা ওর শোনার আগ্রহ থেকে কম নয়। বউদির স্নেহ আর অন্যজনের কেনা হয়ে থাকার নমুনা বাপী এই দেড় মাস ধরেই দেখছে। অবাকও লাগে। এর মধ্যে রাখা-ঢাকার কোনো ব্যাপার নেই। রোববারের সকালে ভদ্রলোকের বেশি বাজার করা এবং এখানে খাওয়া প্রায় বরাদ্দ। তাছাড়া সপ্তাহের মধ্যে সাত দিনই গৌরী-বউদি সন্ধ্যার পর হয় নিজের শোবার ঘরে বসেই তার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, নয় তার গাড়িতে হাওয়া খেতে বেরুচ্ছে, নয়তো ছটা-নটার শোতে সিনেমা বা থিয়েটার দেখাতে যাচ্ছে। মণিদা সাধারণত রাত দশটার আগে ফেরে না, কিন্তু গৌরী বউদি মাঝেসাজে বাইরে থেকে রাতের খাওয়া সেরে আরো পরে ফেরে। এ নিয়ে মণিদার মুখে কখনো কোনো অভিযোগের লেশমাত্র দেখে নি বাপী। এমন কি ফেরার পর কোথায় গেছল, সে-খবরও নেয় না। গৌরী বউদি নিজের থেকে বলল তো শুনল।

বানারজুলির সেই হাসি-খুশি গৌরী বউদির এত উন্নতি দেখে বাপীর তাক লেগে যায়। দুনিয়ায় কাউকে যেন কেয়ার করার কিছু নেই তার।···স্নেহ পাওয়া আর কেনা হয়ে থাকার নমুনা দেখে এখানকার প্রথম সকালেই বাপীর স্নায়ুগুলো এক-প্রস্থ নাড়াচাড়া খেয়েছিল।·· মণিদা কাজে যাবে, সন্তু চৌধুরীর গাড়িতে বাপীর সঙ্গে ছেলেকে চিড়িয়াখানা দেখতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল গৌরী বউদি। তার পলকের কটাক্ষে সন্তু চৌধুরীও যেন কিছু অযাচিত করুণার আশ্বাস পেয়েছিল।···ও-রকম দেখাটা বা ভাবাটা নিজের একটা বিতিকিচ্ছিরি রোগ ভাবতে চেষ্টা করেছিল বাপী।

কিন্তু না। নিজের দুটো চোখ ওকে বড় ঠকায় না।

বাপীর এখন হাসি পায়। মণিদার কথা ভেবে অবাক হয় আবার একটু দুঃখও হয়। মণিদা সত্যি কি কিছু বোঝে না? আর রাগ হয় এই ছোট্ট

ছেলেটার দিকে তাকালে। কাকুকে পেয়ে বাচ্চু বর্তে গেছে।

তবে গৌরী বউদিও বাপীর ওপর সদয় এখন। কারণ ছেলে। দেড় মাসের মধ্যে শেষের পর পর চারটে উইকলি রিপোর্টে বাচ্চু ক্লাসে ফার্স্ট। মাথা খাটিয়ে পড়াটা আনন্দের জিনিস করে তুলতে পারলে আর নিয়ম করে দু'বেলা নিয়ে বসলে ওটুকু ছেলের ফার্স্ট না হওয়াটাই আশ্চর্য।

বৈঠকখানায় বসে রবিবারের সেই সকালে বাচ্চুকে পালোয়ানের গল্প শোনাচ্ছিল বাপী। সামনে সেই পালোয়ানের ছবির বই খোলা। গৌরী বউদি এসে দাঁড়াল আর বিনা ভূমিকায় জিজ্ঞাসা করল, আপিসের চাকরি কেমন চলছে ?

তাৎপর্য না বুঝে বাপী বলল, খাঁড়া তো ঝুলছেই, যে-কোনদিন গলায় নেমে এলেই হল।

গৌরী বউদি বলল, তোকে ভাবতে হবে না, সন্তুকে বলে রেখেছি, ও নিয়ে নেবে। আজ এলে কথা বলে নিস—

ছেলের ফার্স্ট হওয়ার পুরস্কার সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না। বাপীর ফাঁপরে পড়া মুখ। আমতা আমতা করে জবাব দিল, এ-রকম চাকরিতে একজনের মর্জির ওপর ভালো-মন্দ, তার থেকে ওই কাস্টমসেই কিছু হয় কিনা দেখ না বউদি।...সেই গোড়ার দিনে তুমি মণিদাকে বলেছিলে হাত-কড়া পরতে হবে,.. লোভটোভের মধ্যে গিয়ে না পড়লে তা কেন হবে।

ভুরু কুঁচকে তাকালো গৌরী বউদি। অখুশি, আবার একটু অবাকও। এ ছেলে এমন কথা বলতে পারে ভাবে নি। বলল, মাথা তো বেশ খেলে দেখছি। কাস্টমস-এর চাকরি কি আমার হাতের মুঠোয় যে চাইলি আর দিয়ে দিলাম।

বাইরে চটির শব্দ। বাপী আর কিছু বলার ফুরসৎ পেল না। সন্তু চৌধুরী ঘরে ঢুকল আর হেসে প্রথমে ছেলেটাকে তোয়াজের সুরে জিজ্ঞাসা করল, বাচ্চুবাবুর কি করা হচ্ছে ?

গল্প আর খেলার মাঝে মায়ের এসে দাঁড়ানোটা বাচ্চুর তেমন পছন্দ হয় নি। সোৎসাহে নিজের জগতে ফেরার ইচ্ছে। বলল, বাপী কাকুর কাছে পালোয়ানের গল্প শুনছিলাম—আমিও পালোয়ান হয়ে গেছি, বাপী কাকুকে একেবার পাঞ্জায় হারিয়ে দিয়েছি। আর একবার হারাবো দেখবে ?

গল্পের ফাঁকে এই কসরত একবার হয়ে গেছল। সোফায় বসে হাসিমুখে সন্তু চৌধুরী তাল দিল, বেশ, কেমন পালোয়ান দেখা যাক।

—বাপী কাকু চলে এসো।

সামনে ছোট টেবিলে কনুই রেখে আর এক-প্রস্থ পাঞ্জা লড়ার মহড়া হল। বাপী কাকুর হাত নড়ছে না দেখে আগের বারের মতো বাচ্চু তার ছোট্ট শরীরটা ওই হাতের ওপর চাপিয়ে দিতে বাপী হাল ছেড়ে হার মানল।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সন্তু চৌধুরী হাসি মুখেই মন্তব্য করল, ওকে অতটা ঠকানো উচিত নয় ব্রাদার, তোমার ড্র করা উচিত ছিল।

ছোট্ট ছেলেটা কি বুঝল সে-ই জানে। চ্যালেঞ্জের সুরে বলে উঠল, তুমি বাপী কাকুর সঙ্গে জিততে পারবে? লড়ে দেখো দেখি?

সন্তু চৌধুরীর খুশির মেজাজ। তাকেও ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসল। সিগারেট অ্যাশপটে গুঁজে সিল্কের পাঞ্জাবির হাত গোটাতে গোটাতে এগিয়ে এলো। পরিপুষ্ট বাহু। হালকা ব্যঙ্গের সুরে বলল, ওকে জোয়ান বানাচ্ছ, তোমার নিজের কেরামতিটা দেখা যাক।

এই ছেলেমানুষি দেখেই হয়তো গৌরী বউদির ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস একটু। বাচ্চু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। আর বাপী যেন একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল। বলল, লেগে-টেগে যাবে না তো...?

শুনে জোরেই হেসে উঠল সন্তু চৌধুরী। বলল, তোমার পক্ষে ওই বাচ্চুই নিরাপদ তাহলে—

আমতা আমতা করে বাপী বলল, না, আমি আপনার কথা বলছিলাম...

সন্তু চৌধুরী থমকালো এবার। ছোট চোখ গোল হল। নিরীহ গোছের এই শেষের কথা শুনে গৌরী বউদিও কম অবাক নয়।

—আমার লেগে যাবে। এসো এসো, দেখাই যাক্ একবার—

টেবিলের সামনের সোফায় জাঁকিয়ে বসল। এমন কথার পর সমুচিত শিক্ষা না দিলেই নয়।

মাথায় সমান সমানই লম্বা হবে দুজনে। কিন্তু গায়ে-গতরে সন্তু চৌধুরী হৃষ্টপুষ্ট অনেক বেশি। লোকটার গায়ে জোর কেমন বাপীর ধারণা নেই। তবু মনে হয়েছে, এই লোককে জব্দ না করতে পারলে সত্যের জোর বলে কিছু নেই। মনে হয়েছে, শরীরের জোরটাই সব নয়। তাই অমন কথা অতি সহজে ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

টেবিলে কনুই রাখল। হাতে হাত মেলালো। ও-ঘর থেকে মণিদাও এসে হাজির তখন। মজা দেখছে। বাচ্চুর উত্তেজনা চরমে। আর গৌরী বউদি যেন অবিশ্বাস্য কিছু দেখছে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে চাপ দিয়ে বাপীর হাত নোয়াতে চেষ্টা করছে সন্তু

চৌধুরী। কিন্তু হাতটা যেন মাটিতে পোঁতা লোহা একখানা। ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে হয়ে উঠেছে সন্তু চৌধুরীর। নভেম্বরের গোড়ার হালকা ঠাণ্ডা সত্ত্বেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছে। বাপীর মুখে ছেলেমানুষি কৌতুক এক-একবার ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর মিটিমিটি হাসছে। ও যেন তাকে সুযোগ দিচ্ছে, সময় দিচ্ছে।

হাত সোজা রেখেই সোজা হয়ে বসল একটু। তারপর জোর বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসিটুকু ধরে রাখার চেষ্টা বাপীর। ও জিতবে সেটা অবধারিত এখন। সেই চাপ ঠেকানোর চেষ্টায় সন্তু চৌধুরী দরদর করে ঘামছে। তবু ঠেকানো গেল না। কাত হয়ে হাতের পিছনটা টেবিলে শুয়েই পড়ল শেষে।

আনন্দে হাততালি দিয়ে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাগল বাচ্চু। পকেট থেকে রুমাল বার করে সন্তু চৌধুরী ঘাম মুছছে। রীতিমতো হাঁপাচ্ছেও। মণিদা অবাক বেশ। গৌরী বউদি বাপীকেই দেখছে। তার চোখে নতুন বিস্ময়।

পকেটে রুমাল রেখে সন্তু চৌধুরী হাসতে চেষ্টা করল। হাসিটা খুব অকৃত্রিম নয়। বাপীর অন্তত মনে হলে তার পুরুষকার ঘা খেয়েছে। সন্তু চৌধুরী হেসেই বলল, কংগ্রাচুলেশনস।···তোমার চেহারাখানা বেশ ডিসেপটিভ ভায়া, না বুঝে ঠকেছি।

বাপী লজ্জা-লজ্জা মুখ করে সোফা ছেড়ে উঠল। বাচ্চুকে নিয়ে ও-ঘরে যাবে। আর তখনি কেন যেন একটু উদার হতে চাইল সন্তু চৌধুরী। বলল, তোমার বউদি আমার ফার্মে নিয়ে নেবার কথা বলছিলেন তোমাকে··· একদিন বাড়ি এসো, আলোচনা করা যাবে।

বাপী নিরুত্তর। একটু বিব্রতও। জবাব গৌরী বউদিই দিল। তির্যক সুরে বলল, কোনো একজনের মর্জির চাকরি করার ইচ্ছে নেই ওর, কাস্টমস-এ ঢুকতে চায়—

সন্তু চৌধুরী আবারও যেন তেতো গিলল একটু।—তুমি বলেছিলে বলেই বলা, ইন দ্যাট্ কেস আই কান্ট হেল্প।

বাচ্চুর হাত ধরে বাপী তেমনি বিব্রত মুখ করেই বেরিয়ে গেল। পরে সমস্ত দিনের মধ্যে গৌরী বউদি যে অনেকবার লক্ষ্য করেছে ওকে, সোজা না তাকিয়েও বাপী সেটা অনুভব করেছে।···সন্তু চৌধুরী বলেছিল, অ্যাপিয়ারেন্স ডিসেপটিভ। অর্থাৎ বাইরে যেমন দেখায় ভিতরে তেমন নয়। চাকরির

কথায় আর পাঞ্জা লড়ার ব্যাপার দেখে গৌরী বউদিরও সেই সংশয়।

দিন পনের বাদে বাপীরই ভুলে সেই সংশয়ের ওপর আবার নতুন আঁচড় পড়ল একটা। রোববার না হলেও কি একটা ছুটির দিন সেটা। মণিদাও বাড়িতে। ফুরসৎ মিললে তার কাগজ পড়ার বাতিক, বসার ঘরে কাগজ পড়ছিল। এ ঘরে বাপী আর বাচ্চু। ছেলেটার এক্ষুনি বেড়াতে যাবার বায়না। সদ্য কেনা একটা সানগ্লাস পরে গৌরী বউদি ঘরে ঢুকল। হালফ্যাশানের মোটা লালচে ফ্রেমের চশমা। মস্ত মস্ত দুটো কালচে লাল কাঁচ। চোখ দুটির ওপর নিচের অনেকটা ঢাকা পড়েছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিল একটু। তারপর বাপীর দিকে।

—কেমন হল?

, বাপীব মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে এলো, বেশ মিস্টিরিয়াস লাগছে। পরক্ষণে আবার সামাল দিল, বেশ ভালো লাগছে··

গৌরী বউদির নতুন চশমা হাতে নেমে এলো। ভুরু দুটো প্রায় স্বভাবে কুঁচকোয় এখন।—মিস্টিরিয়াস লাগছে মানে বেশ ভালো লাগছে?

বাপী আর তাব দিকে তাকালও না, কথাও বোধ হয় কানে গেল না। বাচ্চুকে তাড়া দিল, যাবি তো চল—

গৌরী বউদি বসাব ঘরে চলে গেল। সেখানে সামনে মণিদা। গৌরী বউদির ধাব-ধার কথা কানে এলো, তোমার ওই ভাইকে যত হাঁদা ভাবি আমরা ততো নয়—বুঝলে? সন্তুও সেদিন ওই কথাই বলছিল।

—কি হল আবাব···। মণিদার গলা।

গৌরী বউদির কথা আর শোনা গেল না। সিঁড়ি দিয়ে ততক্ষণে সে হয়তো নিচে নামছে। কারণ, নিচে থেকে তাগিদ দেবার মতো করেই গাড়ির হর্ন বেজে উঠেছে।

সরলতার মুখোশ খুলে গেলে সুবিধে হবে না বাপী জানত। কিন্তু পরের মাসে অর্থাৎ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ওটা ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে গেল। বাপী তার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ব্রুকলিনের বড়বাবু মন্মথ সোমের ছোট কেরানী বিপুল তরফদারের প্রতি অমন অঢেল স্নেহের কারণটা আকাশ থেকে হঠাৎ একটা গোলার মতো নেমে সোজা ব্রহ্মতালুতে আঘাত করেছে। শনিবার হাফ-ডে। আপিসের কিছু কাজের অছিলায় সেদিন মন্মথ সোম তাকে সঙ্গে করে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন। থাকেন হাওড়ায়।

ফাইল মেলানো দশ মিনিটে হয়ে গেল। তারপর ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা প্রচুর আপ্যায়ন করলেন। ঘরের তৈরি অনেক কিছু খাওয়ালেন। কিন্তু সেই ভালো ভালো খাবার বাপীর গলা দিয়ে নামে না। কারণ, সেই আপ্যায়নে যোগ দিয়েছে বছর একুশ-বাইশের একটি মেয়ে। সোম কর্তা-গিন্নীর একমাত্র মেয়ে। নাম উষা। ফর্সা আর মোটাসোটা, কিন্তু মুখে কোন রকম শ্রীর লেশমাত্র নেই। সেই মুহূর্তে বাপী ব্যাপার বুঝে নিয়েছে। আর সেই প্রথমে ওর বাইশ বছর বয়েস শুনে মন্মথ সোম কেন খুশি হন নি তাও বুঝেছে। এমন কি ছাঁটাইয়ের বাজারে চাকরি কেন পেয়েছিল তাও আর অস্পষ্ট নয়। কর্তা-গিন্নী মেয়ের সামনেই মেয়ের অনেক প্রশংসা করলেন।

পরের সপ্তাহেও এক রকম কাচপোকার মতোই মন্মথ সোম বাড়ি টেনে নিয়ে গেলেন ওকে। আপ্যায়নের ত্রুটি নেই। এবারে মেয়েকে রেখে কর্তা-গিন্নী মাঝে মাঝে উঠেও গেলেন। মেয়ের মুখ দেখেই বাপীর মনে হল সে স্থির জেনে বসে আছে দুজনের সম্পর্কটা কি দাঁড়াবে। বাপীর পছন্দ অপছন্দের কোনো প্রশ্ন নেই, ওই মেয়ের ওকে পছন্দ হয়েছে সেটা স্পষ্ট।

সরাসরি প্রস্তাব এলো মেজবাবু রামনারায়ণ গাঙ্গুলি—নিশীথের রাম কাকার মারফৎ। সঙ্গে লোভের টোপ।—আর কি, বরাত তো ফিরে গেল তোমার, ওই একটিই মেয়ে, বড়বাবুর বাড়ি ঘরদোর যা-কিছু সব তোমারই—আর, মেয়েটারও খুব পছন্দ দেখলাম তোমাকে।

না, তাঁর গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় নি বাপী। বলেছে, মাপ করবেন, বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রামবাবু আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, ঝাঁঝালো মুখে বাপী চেয়ার ঠেলে উঠে চলে গেছে।

চাকরি থাকবে না বুঝেছে। আর সেই দুর্ভাবনার কথাটা মণিদাকে না বলেও পারে নি। মণিদা যে সেটা গৌরী বউদিকে বলে দিয়েছে সেটা পরদিনই বোঝা গেছে। কারণ গৌরী বউদির চোখে কৌতুকের ঝিলিক। বিয়ে করতে রাজি নয় বলে চাকরি যাচ্ছে মণিদা তাও বলে দিয়েছে নিশ্চয়।

বড়বাবু মন্মথ সোমের টেবিলে ডাক পড়েছে। থমথমে মুখ কিন্তু গলার স্বর নরম।—তুমি ভেবে দেখো একটু, লোয়ার ডিভিশন থেকে তোমাকে আপার ডিভিশন করে দিতেও আমার বেশি দিন লাগবে না।

—মাপ করবেন।

নিজের চেয়ারে ফিরে এসেছে।

মাসের সতের তারিখে রামবাবু ছাঁটাইয়ের নোটিস ওর হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, কাল দুটোর মধ্যে এসে এ ক'দিনের মাইনে নিয়ে যেও।

হ্যাঁ, বাপী জলতে জলতেই বাড়ি ফিরছিল। মেয়েরাই ওর জীবনের প্রধান শত্রু। সমস্ত মেয়ে জাতটাকে ছারখার করে দেবার মতোই ভিতরের আক্রোশ আর জলুনি।

দুপুর আড়াইটে তখন। মাথার ওপর শীতের সূর্যটাও আজ বেশি জলছে। বাপী শর্টকাট করে সামনের ছোট পার্কের ভিতর দিয়ে আসছিল। পা দুটো থেমে গেল। সামনের বারান্দায় গৌরী বউদি দাঁড়িয়ে। আর লাগোয়া পাশের বাড়ির বারান্দায় সন্তু চৌধুরী দাঁড়িয়ে। সে যেন চোখের ইশারায় মাথা নেড়ে নেড়ে নিঃশব্দে কিছু আর্জি পেশ করছে। বাপীর মনে হল, গৌরী বউদিকে ডাকছে বা নিজে আসতে চাইছে। গৌরী বউদির ঠোঁটে হাসি, চোখে হাসি। অল্প অল্প মাথা নেড়ে আর্জি নাকচ করছে।

রাস্তাটা পার হবাব পর দু'জনেই দেখল বাপীকে। বাপীর স্নায়ু আর নিজের বশে নেই তখন। ওকে দেখেই সন্তু চৌধুরীর বিমর্ষ বিরক্ত মুখ। গৌরী বউদি সচকিত একটু। তারপর সন্তু চৌধুরীর দিকে চেয়ে হাসছে।

বাপীর ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বসার ঘর দিয়ে ঢুকতে হবে। এটাও দুপুরে বন্ধই থাকে। খটাখট শব্দে জোরেই কড়া নাড়ল।

গৌরী বউদি দরজা খুলে দিল। মুখখানা দেখল একটু ভালো করে। একেবারে অন্য রকম লাগছে। জিজ্ঞেস করল, এই মূর্তি কেন, কে তাড়া করল? সঙ্গে সঙ্গে নিজেরই হয়তো মনে পড়ল কিছু।—এ-সময়ে যে? চাকরিটা গেল বুঝি?

ভিতরের গোপন সুড়ঙ্গের দরজা খোলা পেয়ে এক মুহূর্তে সেই আদিম হিংস্র পশুটা সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল। বাপীর আর অস্তিত্ব বলে কিছু নেই, কাণ্ডজ্ঞান নেই। সামনে খোলা চুল পিঠে ছড়ানো, ঢিলে-ঢালা বেশ-বাসে যে দাঁড়িয়ে—তার মুখ দেখছে, বুক দেখছে—এক উপোসী জানোয়ার বড় লোভনীয় গ্রাসের কিছু দেখছে।

—হ্যাঁ, চাকরিটা গেল।…এ সময়ে এসে গেলাম বলে তোমার খুব অসুবিধে হল?

জবাবটা দেবার আগে হঠাৎ ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে গৌরী বউদি তিন-পা পিছনে সরে গেছে। আর, তারপরে বিস্ময়ের অন্ত নেই তার। সে-ও চেয়ে আছে।

...তারপর। গৌরী বউদি পিছন ফিরে ঢিমেতালে এ ঘরের দরজা দিয়ে মাঝের ঘরে। সে-ঘরের খোলা দরজা দিয়ে নিজের ঘরে।

বাপীর বুকের তলার দানবটার তখনো দাপাদাপি থামে নি।

বসার ঘরের দরজা বন্ধ করে মাঝের ঘরে অর্থাৎ নিজের ঘরে এলো। সামনের ঘরের খোলা দরজার দিকে চেয়ে নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে রইল খানিক। স্নায়ুগুলো কাঁপছে। কটা মুহূর্তের মধ্যে কি ঘটে গেল খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু জানোয়ারটা আবার ভিতরে সেঁধিয়েছে।

আস্তে আস্তে সামনে এগলো। খোলা দরজা দুটো শব্দ না করে বন্ধ করতে গেল। আধখানা বন্ধ করার আগেই নিশ্চল আবার।

ও-ঘর থেকে গৌরী বউদি ডাকল, বাপী শোন্ তো—

গলায় স্বর যেমন সহজ তেমনি নির্লিপ্ত।

আধা-ভেজানো দরজা খুলে বাপী ভিতরে এসে দাঁড়াল। গৌরী বউদি শয্যায় শয়ান। কাঁধের শাড়ি আধখানা খসে বুকের ওপর উঁচিয়ে আছে। ঘাড় ফিরে তাকালো। চোখে হাসি। ঠোঁটে হাসি।

—এদিকে আয়।

ভিতরের জানোয়ারটাকে আর চেষ্টা করেও খুঁজে পাচ্ছে না বাপী। কয়েক পা এগিয়ে এলো।

অল্প অল্প হাসছে গৌরী বউদি। সেই হাসিটা ওকে শয্যার আরো কাছে টেনে নিয়ে যাবার মতো।

—তুই এত পাকা হলি কবে থেকে?

—তোমরা বানারজুলি যাবারও অনেক আগে থেকে।

—হুঁ? চোখে বিস্ময় ঝরল। সেই সঙ্গে আরো কিছু।—তাহলে অত বোকার মতো থাকিস কেন?

—তাতে সুবিধে।

—কি সুবিধে?

—লোকে বোকা ভাবে সেই সুবিধে।

তেমনি অল্প অল্প হাসছে গৌরী বউদি। হঠাৎ বানারজুলির সেই ননদ-ভাজ সাপুড়ে মেয়ে দুটোকে মনে পড়ল বাপীর। বিশেষ করে ছটুমিয়ার বউ দুলারিকে। সাপের ছোবল খাবার লোভ, ছোবল খাওয়ার নেশা। সাপ যত ফোঁসে, সামনে পিছনে সেই মেয়ে ততো দোলে আর হাত বাড়ায়।

...গৌরী বউদির চোখেও সেই লোভ। না, তার থেকেও বেশি কিছু।

তাজা কাঁচা একটা পুরুষ দেখছে গৌরী বউদি।...ব্যভিচার বয়েস জানে না। কিছু মানে না। হাসছে অল্প অল্প। বলল, বসার ঘরে দরজা বন্ধ আছে তো? কেউ ঢুকে পড়লে চেয়ার টেবিলসুদ্ধ যাবে—

শয্যার মাথার দিকের দরজার দিকে তাকালো বাপী। ছিটকিনি তোলা। বসার ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে তিন ঘরের কোনটাতে কারো ঢোকার উপায় নেই বটে।

—দেখছি। বাপী ভিতরের দরজার দিকে পা বাড়ালো।

পিছন থেকে গৌরী বউদি বলল, দেখে আয়—তোর সঙ্গে কথা আছে।

ভিতরের জানোয়ারটার অস্তিত্বসুদ্ধু উবে গেছে। ওর সত্তা বিষাদে ডুবছে, তলিয়ে যাচ্ছে। দেয়ালে বাপীর আর বাচ্চুর নতুন তোলা ফোটো। ছেলেটা দুষ্টু দুষ্টু হাসছে বাপীর দিকে চেয়ে। বাপীর চোখ দুটো শিরশির করছে, বুকের হাড়ে হাড়ে একটা কান্না গুমরে উঠতে চাইছে।

বসার ঘরে এলো। নিঃশব্দে বন্ধ দরজা দুটো খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। দরজা দুটো বাইরে থেকে আবার আস্তে আস্তে টেনে দিয়ে নিচে চলে এলো।

ফিরল রাত দশটার পরে। মণিদা তখনো বসার ঘরে। মাঝের ঘরের বিছানায় বাচ্চু নেই। অর্থাৎ আজ মায়ের কাছে ঘুমুচ্ছে। গৌরী বউদির মুখ দেখা গেল না। কিন্তু বাপী ঠিক জানে সে তার ঘরেই আছে।

...না, পরদিন সকালে মণিদার কোনো শাসন চাবুক হয়ে নেমে আসে নি। উল্টে তারই ভীরু মুখ। আমতা-আমতা করে বলল, হঠাৎ কি যে হল তোর বউদির...তোকে আজই চলে যাবার কথা বলছে।

যেতে হবে বাপী জানত। মাথা নাড়ল। আজই যাবে।

বাচ্চুর চোখে ধুলো দিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ল। মাসের ষোল দিনের মাইনে নেবার জন্য দুপুরে ক্লকলিনে এলো। বেরিয়ে আসার সময় দুঃখ আর সহানুভূতি জানাতে জানাতে রতন বনিক গেট পর্যন্ত এলো। ভালো মানুষ বিপুলবাবুর এত চট করে চাকরিটা চলে যাবে, এ ও ভাবতেই পারে নি।

কি মনে হতে বাপী বলল, যা হবার তো হল। আমাকে দিন কতকের একটু মাথা গোঁজার মতো জায়গা বলে দিতে পারো? তুমি থাকো কোন্ দিকে?

—ভবানীপুরের দিকে। রতন বনিক অবাক একটু।

বাপী হেসেই বলল, আজ থেকে থাকার জায়গাও নেই...যেখানে হোক

একটু জায়গা পেলে হত, টাকাও কিছু দিতাম।

রতন বনিকের মুখখানা দরদে ছেয়ে গেল। বলল, বাড়তি একটা খুপরি ঘর তো আমারই আছে কিন্তু সেখানে তো আপনি থাকতে পারবেন না, একেবারে বস্তির মতো।

বাপী আশার মুখ দেখল। লোকটা সত্যি ভালো।···আর ভদ্রলোকের থেকে অনেক ভালো। সাগ্রহে বলল, আমি খুব পারব, তোমার অসুবিধে হবে না?

রতন বনিক এরপর ছুটে গিয়ে বাকি সময়টুকুর জন্য ছুটি নিয়ে এসেছে। তারপর বাপীর সেই সামান্য মাল-পত্র বয়ে তাকে সঙ্গে করে টালি এলাকার খুপরি ঘরে এনে তুলেছে।

··গৌরী বউদি ঘর ছেড়ে বেরোয় নি। বাচ্চু তখন স্কুলে। মণিদা আপিসে।

॥ ছয় ॥

মিষ্টি হাসছে। বাপী তরফদারও।

মিষ্টি বলল, সেই দস্যি তুমি আজও আমার পিছনে লেগে আছ কি করে বুঝব। আর আমি চিনবই বা কি করে, মাঝের আটটা বছর কি কম নাকি!

বাপী বলল, আমি তো গণৎকারের ওখানে তোমাকে দেখেই চিনেছিলাম।

মিষ্টি যেমন খুশি তেমনি অবাক।—কি করে চিনলে বলো তো! দশ বছরে যা ছিলাম, এই আঠেরো বছরেও কি তেমনি আছি নাকি আমি!··· তখন তো ফ্রক পরতাম।

বাপী হাসছে। কিন্তু সত্যি কথাটা বলছে না।···বানারজুলির দশ বছরের সেই ফ্রক-পরা মিষ্টি আর কলকাতার এই আঠেরো বছরের শাড়ি-পরা আর কলেজে-পড়া মিষ্টি এক নয়। একরকমও নয়। বানারজুলির ফ্রক-পরা মিষ্টির একমাথা ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল, লালচে ফোলা-ফোলা গাল, বিশ্বাস-অবিশ্বাস আর বিস্ময়মাখা দুটো কালো চোখ, ধরে চিবুতে ইচ্ছে করত এমনি দুটো ফর্সা কচি কচি হাত আর আঙুল, গায়ে মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ। আটটা বছর জুড়লে সেই মিষ্টি এই মিষ্টি হয়, এ বাপী কল্পনাও করতে পারত না। মাথায় বড় খোঁপা।··ফর্সা রঙে মেটে ছোপ ধরেছে। ফোলা গাল আর মুখের আদুরে ভাব গিয়ে অন্য ছাঁদ নিয়েছে। চোখের গোল ভাবটা পর্যন্ত এখন আয়ত-গভীর,

তাতে বুদ্ধির ছাপ, কৌতুকেরও।...বেশি লম্বাও নয়, বেঁটেও-নয়, মোটাও নয় আবার রোগাও নয়—পা থেকে মাথা পর্যন্ত ও যেন এখন কায়ো বেশ হিসেবের তৈরি। হিসেবের বাইরে যেটুকু, সেটুকু আরো বেশি লোভনীয় বলেই শাড়ির আড়ালে বেশ করে আগলে রাখার চেষ্টা। তবু সর্ব অঙ্গে তার উঁকিঝুঁকির কামাই নেই।...না, এই মিষ্টি পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে বাপী হয়তো দাঁড়িয়ে যেত, দেখত। কিন্তু চিনতে পারত না। জ্যোতিষীর ঘরে ওর মাকে দেখে পলকে চিনেছিল। মাকে চেনার ফলে মেয়েকে চিনেছে।

কিন্তু এখন আর বুকের তলায় এতদিনের সেই ভীষণ যন্ত্রণাটা নেই। সেই ভয়ংকর আক্রোশও নেই। গোপন সুড়ঙ্গপথের সেই জানোয়ারটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। অনেক—অনেক যুদ্ধ অনেক ক্লান্তির পরে ও যেন তার লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছে। আর তার কোনো খেদ নেই, কোনো ক্ষোভ নেই। এই মিষ্টি এখন তার মিষ্টি-মিষ্টি হাতখানা যদি মাথায় রাখে, যদি একটু হাত বুলিয়ে দেয়, পরম শান্তিতে বাপী তাহলে এখন ঘুমিয়েও পড়তে পারে।

রাগ বা ক্ষোভ না থাকুক, একটু অভিমানের কথা বলতে ইচ্ছে করছে তবু। বলল, এই আট বছরে আমি তোমাকে একটা দিনের জন্যেও ভুলিনি, কিন্তু তুমি দিব্বি ভুলে গেছলে—

মিষ্টির ঠোঁটে দুষ্টু দুষ্টু হাসি, আবার চোখের কোণে প্রতিবাদের হাল্কা কোপও একটু। জবাব দিল, এমনিতে ভুলে গেছলাম বটে, কিন্তু একেবারে ভোলার উপায় ছিল? বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু বুঝতে পারতাম, তখন হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যেত।...মিষ্টি খাব মিষ্টি খাব করে জ্বালিয়ে মারতে, আর হাতের নাগালে পেলে কি কাণ্ড করতে। শেষে সেই একদিন...বাঃ! আমি বলব না—

বাপীর কান জুড়িয়ে যাচ্ছে। ভিতর জুড়িয়ে যাচ্ছে। সেই তাজা রক্তের স্বাদও মুখে আর লেগে নেই। বাপী হাসছে।—সেই একদিন বাবার হাতে শাস্তিখানা কেমন খেলাম তাও তো নিজের চোখেই দেখেছিলে।

মনে পড়তে গা শিউরে উঠল মিষ্টির। বাপীর তাও ভারী মিষ্টি লাগল।

- সে কথা আর বোলো না। আবু যখন তোমাকে ধরে নিয়ে এলো তখনো সবার আগে ছুটে গিয়ে তোমার মাথাটা মনের সাধে মাটিতে ঠুকে দিতে ইচ্ছে করছিল আমার। তারপর তোমার বাবার সেই পাগলের মতো মার দেখে আর তোমার নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুতে দেখে সারা গা ঘুলোচ্ছিল, আর এত রাগ হচ্ছিল তোমার বাবার ওপর যে ইচ্ছে করছিল,

বেঁটে মোটা লাঠিটা কেড়ে নিয়ে তাকেই ঘাকতক বসিয়ে দিই।

...আশ্চর্য! সত্যি একটা মোটা লাঠির খোঁচা লাগছে গায়ে।

চমক ভেঙে বিষম ধড়্ফড়্ করে সোজা হয়ে বসল বাপী তরফদার। না, বাপী স্বপ্ন দেখছিল না। জেগেই ছিল। বসেই ছিল। এখানে বসেই একটা খুব লোভনীয় বাস্তবের খুব কাছাকাছি পৌঁছে লাঠির খোঁচায় আচমকা এখানেই ফিরে এলো আবার। রাতের অন্ধকার ঘুটঘুটি এই পার্কে। বকুলতলার এই বেঞ্চিতে...।

...সেই থেকে বাপী তরফদার জেগেই আছে। বসেই আছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে মনে আছে। ছেলেমেয়েরা এসেছে, খেলাধুলো করছে, ছোটাছুটি হুটোপুটি করছে—মনে আছে। দিনের আলোয় টান ধরতে পার্কটা আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়েছে, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে আসতে একেবারে খালি হয়ে গেছে, তাও খেয়াল করেছিল। তারপর এমনি বসে থেকে এমনি চোখ তাকিয়ে কতক্ষণ কিভাবে কেটে গেল তাই শুধু খেয়াল নেই। সমস্ত সত্তাসুদ্ধ কতক্ষণ উধাও হয়েছিল এখনো ঠাওর করতে পারছে না।

লাঠির খোঁচা পুলিশের। এখন সে পিছনে কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

লোকটা ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করল, সঙ্গে সঙ্গে বড় শ্বাস টানল একটা। মদটদ খেয়ে ঝিম মেরে বসে আছে কিনা বোঝার চেষ্টা। মাথার ওপর বকুল গাছটার জন্য এখানটায় এক চাপ অন্ধকার। লোকটা মাঝবয়সী বাঙালী। কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, এত রাতে এখানে বসে কি হচ্ছে?

বাপী বেঞ্চি ছেড়ে উঠল। সমস্ত দিন পেটে কিছু না পড়ায় মাথাটা ঘুরছে। যে বরাত, সন্দেহ হলে হয়তো টেনে নিয়ে গিয়ে লক্-আপে ঠেলে দেবে। ক্লান্ত সুরে বলল, মনটা ভালো ছিল না সিপাই সাহেব ··বসেছিলাম।

মাতাল-টাতাল নয়, মুখ দেখে চোর-ছেঁচড়ও মনে হল না। তবু পা থেকে মাথা পর্যন্ত আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। বলল, রাত বারোটায় মন ভালো করার জায়গা নয় এটা, অন্য পুলিশের খপ্পরে পড়লে আর কিছু না হোক হাতের ওই ঘড়ি খুলে দিতে হত। পা চালিয়ে চটপট ঘরে চলে যান—

পার্কের গেট পেরিয়ে কব্জির পুরনো ঘড়িতে সময় দেখল বাপী। বারোটা নয়, এগারোটা বেজে কয়েক মিনিট। ঘর এখান থেকে অনেক দূর, কম করে আধ ঘণ্টা লাগবে। শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলল। একটা দোকানপাট খোলা নেই যে কিছু কিনে মুখে দেবে। ইচ্ছে করছে না, আবার শরীরও চলছে না।

...বিমনা হবার মতো রসদ পার্কে বকুলতলায় বেঞ্চিতে বসেই সংগ্রহ

করেছিল। হোক কল্পনা, কিন্তু তারই মধ্যে মিষ্টিকে খুব কাছে পেয়েছিল। খুব কাছ থেকে দেখেছিল। আর এক আশ্চর্য শান্তিতে বাপীর ভিতর-বার ডুবে গেছল। সেই শান্তির ছোঁয়ায় সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছিল কি না কে জানে! নইলে এত রাত হয়ে গেল কি করে…! এখনো সেই তৃপ্তির স্বাদটুকু ভিতরে লেগে আছে।

মনটা সজাগ হয়ে উঠছে আবার। বেশ জোরও পাচ্ছে।…পার্কে বসে নিজের মন থেকে যে ছবি আঁকছিল সেটা এমন কিছু আজগুবী নয়। সত্যি হতে পারে না এমন কিছু নয়। বরং এর বিপরীত চিন্তাটাই বাপীর মাথায় একটা আঘাতের মতো এঁটে বসতে লাগল। আটটা বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে আবার কোনো নিভৃতে মুখোমুখি হতে পারলে বাপী যা ভাবছিল তাই হবে। মিষ্টির চোখে ওইরকমই বিস্ময় ঝরবে। তারপর মিষ্টি ওইরকম করেই হাসবে, আর ওই গোছের কথাই কিছু বলবে।

নিজের অজান্তে পা আরো দ্রুত চলছে বাপীর। দুপুরে ওই পার্কটায় বসে প্রথম যা মনে হয়েছিল, ঘুরেফিরে এখন তাই আবার মাথায় আসছে।… সাতাশি নম্বরের ওই বাড়িটার দোতলায় দাঁড়িয়ে মিষ্টি ঠাণ্ডামুখে আজ ওর নিগ্রহ দেখেছে। ওর ওপর পাড়ার ছেলেগুলোর হামলা দেখেছে। মিষ্টির চোখে সেটা অপরিচিতের নিগ্রহ। অপরিচিতের ওপর হামলা। কিন্তু এ-ই শেষ নয়। শেষ হতে পারে না। চৌদ্দ বছরের একটা ছেলের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মুখ যদি শেষ কথা না হয়ে থাকে, আজকের এই অপমান আর নিগ্রহও শেষ কথা নয়। বাপী তা হতে দেবে না।

সামনে পিছনে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে চলেছে সেই থেকে। রাতের নির্জনে রাস্তা পাহারা দেওয়াটা ওদের যেন ডিউটি। পাড়া জানান দিতে দিতে খানিক সঙ্গ নেয়। ভয় পেলে তেড়েও আসে। ভয়শূন্য নির্লিপ্ততা দেখলে চেঁচানি থামে। তারপর আবার সামনের রাস্তার কুকুরের পালা। মিষ্টিদের সাতাশি নম্বরের বাড়ির সামনের সেই ছেলেগুলোকে আবার মনে পড়ে গেল বাপীর। আর সোনালি ফ্রেমের চশমা-পরা ফুটফুটে ফর্সা সেই ছেলেটাকে— পাড়ার ছেলেদের অসিতদা। তাদেরও কাউকে পাহারায় মোতায়েন রাখেনি কেউ। তারা নিজে থেকেই পাহারা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা খুশির ছবি চোখে ভাসল বাপীর।…এরপর মিষ্টির সঙ্গেই যদি ওরা ওকে ওই সাতাশি নম্বরের বাড়িতে ঢুকে যেতে দেখে তো কি করবে? কুণ্ডলি পাকিয়ে বসবে আর বার-করা জিভ দিয়ে লালা ঝরবে?

পা দুটো থেমে গেল। পৌঁছে গেছে। ঘড়িতে রাত প্রায় বারোটাই এখন। টালি এলাকার বাইরেটা নিঝুম। ভিতরেও। তবু এত রাতে কেউ দেখে ফেললে কি ভাববে ঠিক নেই। কিন্তু সেটা সমস্যা নয়। লোকগুলো এমনিতে সরল। রতন বনিক ওদের যা বুঝিয়েছে তাই বুঝেছে। বিপুলবাবুকে ওরাও লেখাপড়া-জানা নির্বিলিক ভালোমানুষ জানে। সমস্যা অন্য। সমস্যা বাপী নিজে। সেই কারণে বিষণ্ণ। আবার সেই কারণে নিজের ওপর অসহিষ্ণু।

·· সমস্যা ওর ভিতরের সেই জানোয়ারটা। ওটা খোলস থেকে বেরিয়ে পড়লে নিজের ওপরে বাপীর আর এতটুকু দখল থাকে না। মেয়েরা দেখা-মাত্র সেই মাংসলোলুপ জানোয়ারটাকে চেনে।···গৌরী বউদি দেখেছিল! দেখেই চিনেছিল। প্রশ্রয় দিতে চেয়েছিল। জানোয়ারটা আবার খোলসে ঢুকে গেছল বলেই মণিদার সেই আরামের ঘর ছেড়ে আজ ও এইখানে ···আজ আবার তেমনি দিনেদুপুরেই ওটা আচমকা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। খুব কাছে এসে ঝুঁকে ছেঁড়া জামার ভিতর দিয়ে পিঠে আঘাতের দাগ আছে কিনা দেখতে গেছল রতন বনিকের বউ কমলা বনিক। জানোয়ারটা তখন দুটো চোখের ভেতর দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে ওর ওপরেও ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল। কমলা ওটাকে দেখেছে। চিনেছে। বিষম হকচকিয়ে গিয়ে কয়েক পা পিছনে সরে গেছে।

···হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে গৌরী বউদিও খানিক পিছনে সরে গেছল। তারপর চোখের সামনে কাঁচা তাজা পুরুষ দেখেছিল। বয়েস ভুলে, সব ভুলে, পতঙ্গ পোড়ানোর নেশায় পেয়েছিল তাকে।

কমলা বনিক কি করবে?

পুলিশ তাড়া না করলে রাতটা ওই পার্কেই কাটিয়ে দিত।

পায়ে পায়ে উঠোনে চলে এলো। নিশ্চিন্ত একটু। কেউ জেগে নেই। কমলার ঘরের দরজা বন্ধ। যত সন্তর্পণে খুপরি ঘরের দরজা খুলুক, ক্যাঁচ করে শব্দ একটু হবেই। কিন্তু দরজা ঠেলতেই বাপী হাঁ একেবারে।

খাটিয়ার কাছে ছোট্ট একটা হারিকেন ডীম করা। ওটার সামনে ঝাঁপিতে কিছু চাপা দেওয়া! দেখেই বুঝল, ওটার নিচে বাপীর রাতের খাবার। এদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে মেঝের ওপর হাত পা ছড়িয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে রতন বনিক।

বাপী নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল খানিক।···

সমস্ত দিন লোকটার মেহনতের মধ্যে কাটে। আপিসের কাজ কিছু আছেই, তার ওপর ভাগ্য গোনার ধকলে জিভের কামাই নেই। সন্ধ্যার পর এই খুপরি ঘরে বসে মৌজ করে একটু নেশা করে। ইচ্ছে করেই বাপী সে সময় ঘরে আর থাকেই না। নেশা বেশ জমে উঠলে রতন নিজের ঘরে যায়, খেয়েদেয়ে রাত সাড়ে আটটা ন'টার মধ্যে অঘোরে ঘুম।

···আজ বউয়ের হুকুমে ওর এই বাড়তি ধকল সম্ভবত।

কাঁধ ধরে জোরে নাড়া দেবার পর রতনের ঘুম ভাঙল। লণ্ঠনটা এত ডীম্ করা যে ভালো মুখ দেখা যায় না। তবু বাপীর মনে হল, ও এখানে এভাবে পড়ে ঘুমুচ্ছিল কেন নিজেই চট করে ঠাওর করে উঠতে পারছে না। বাপী বলল, ঘরে গিয়ে ঘুমোও গে যাও।

বিপুলবাবুর গলা শুনে মাথা পরিষ্কার হচ্ছে। শিথিল শরীরটা মেঝে থেকে টেনে তুলল। ঝুঁকে ছোট লণ্ঠনটা উসকে দিল। তারপর চোখ বড় করে বিপুলবাবুর মুখখানা দেখল। জিজ্ঞেস করল, রাত কত এখন?

—অনেক। বাপী বিব্রত বলেই ভিতরে ভিতরে বিরক্ত। এরকম কষ্ট করার কি দরকার ছিল, শুয়ে পড়োগে যাও।

রতনের দু চোখ ঘুমে বোঝাই। বলল. ওই আপনার খাবার ঢাকা দেওয়া আছে, খেয়ে নিন—

কথা না বাড়িয়ে ও বাইরে গিয়ে দরজা দুটো টেনে দিল। ঘুরে বাপী নির্দয় চোখে ঝাঁপিটার দিকে তাকালো। কারণ ওটার নিচে যা আছে তাই এখন সব থেকে বেশি দরকার ওর। ওটা দেখার পর পেটের তাগিদ এমনি যে গোগ্রাসে এখন গিলতে না বসে উপায় নেই।

খেতে বসল। সামগ্রী বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু থালায় সাজিয়ে রাখার মধ্যে যত্নের ছোঁয়া আছে।···এটুকুর মধ্যেই কমলার সঙ্গে গৌরী বউদির একটা বড় তফাৎ। তবু এই রাতটা না কাটলে, বাপী কাল কি করবে? কাল কেমন করে মুখ দেখাবে? তার খাবার সাজিয়ে রাখা দেখে তলায় তলায় ভরসাও পাচ্ছে একটু।···সেই কটা স্তব্ধ হিংস্র মুহূর্তের মধ্যে কমলা সত্যি কতটা ভিতর দেখেছিল ওর? কতটুকু বুঝেছিল?···গৌরী বউদির মত অতটা নাও হতে পারে। কমলা হয়তো বা চণ্ডাল রাগ ভেবেই অমন হকচকিয়ে গেছল। আর তারপর সামলে নিয়ে নিজের জোর ফলিয়েছিল। বলেছিল, আমার ঘর থেকে আমাকে চলে যেতে বলার তুমি কে?···বাপী নিজেই চলে যাবার জন্য পা বাড়াতে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বলেছিল, কই

খাও?...মজা করে জিজ্ঞেস করেছিল, এক কাপ চা এনে দেবে কিনা। তারপর মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য ওকে চানে যেতে বলে ধীরেসুস্থে রান্না চড়াতে চলে গেছল। না খেয়ে ওকে বেরিয়ে যেতে দেখে আকৃতি নিয়েই পিছন থেকে ডেকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিল।

খেতে খেতে নিজের দিক টেনেই ভাবছিল বাপী। কিন্তু ভিতরের অস্বস্তিটা থিতিয়েই থাকল।

সমস্ত দিনের এত ধকলের পর খাটিয়ায় গা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু ঘুম চট করে চোখের ধারেকাছে ঘেঁষবে না জানে।

...নিশীথ বলেছিল, তুই একটা রামবোকা। একটা মাত্র মেয়ে, তাও কালো-কোলো নয়, বেশ ফর্সা, স্বাস্থ্য ভালো। কোথায় জামাই হয়ে জাঁকিয়ে বসবি, বাড়িঘরের মালিক হবি, শ্বশুর ওদিকে নিজের দায়েই তোর পাকা চাকরি আর প্রমোশনের জন্য ওপরওয়ালার কাছে হত্যা দেবে—তা না, নিজের গোঁয়ে চাকরিটাই খুইয়ে বসলি। কি লাভ হল?

রতন বনিকের এই খুপরি ঘরে এসে ওঠার পরদিন, অর্থাৎ চাকরিতে জবাব হয়ে যাবার তিন দিনের মধ্যে বাপী বন্ধুর কাছে ছুটে এসেছিল। কিন্তু কিছু বলার আগেই নিশীথের ওই কথা।

সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটা ওরই ওপর উগ্র হয়ে উঠেছিল বাপীর।—তুইও তাহলে সব জেনেশুনেই এই চাকরি নেবার জন্য আমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলি?

পাল্টা ঝাঁঝ দেখে নিশীথ ওকে বুঝিয়েছিল, সে সময় ও সত্যি কিছু জানত না। পরে রামকাকা ওকে বলেছিল। তাও চাকরি হবার অনেক পরে, আর বড়বাবু মন্মথ সোমের ছেলে পছন্দ হবার পরে। বন্ধুকে একটু খুশি করার জন্যেও হতে পারে, নিশীথ আরো বলেছিল, তোর গায়ের রং ফর্সা না হলেও মুখের মধ্যে তো বেশ একটু মিঠে ভাব আছে—রামকাকার মুখে শুনেছি, শুধু বড়বাবুর নয়, তার মেয়েরও তোকে ভারী পছন্দ হয়েছিল...আমি কোথায় আশায় দিন গুনছিলাম, এর মধ্যে কাল রামকাকার কথা শুনে বুঝলাম সব চিত্তির। তুই বড়বাবুর আশায় ছাই দিয়েছিস, আর বড়বাবুও তোকে আপিস থেকে ছেঁটে দিয়েছে।...আমারই ভুল হয়েছে, ঘাড়ে চেপে থেকে তোকে রাজি করানো উচিত ছিল।

নিশীথের দোষ নেই বুঝে বাপীর রাগ পড়ে এসেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, তুই হলে কি করতিস?

—আমি? ওষুধের বড়ির মতো গলায় ফেলে টুক করে গিলে বসে থাকতাম। আরে বাবা, আমার কথা আলাদা, আমার যদি তেমন কোনো মেয়ে চোখে পড়ে বা মনে ধরে, তাতেই বা কি? কবিরাজের ছেলে হবু কোবরেজের সঙ্গে কোনো আধুনিক মেয়ে প্রেমে পড়ে এমন কথা নাটক-নভেলেও কখনা পড়েছিস?

...বাপী হেসে ফেলেছিল। নিশীথ আবার বলেছিল, তোর মাথারই ঠিক নেই, নইলে কোন রূপসী আর বিদুষী তোর জন্যে মালা গাঁথছে যে এমন মওকা হেলায় হারালি।

খাটিয়ায় শুয়ে নিশীথের কথাগুলো মনে পড়ছিল। মিষ্টির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা সেদিন কোনো কল্পনার মধ্যেও ছিল না। যত অবাস্তবই হোক, তবুও ওই কথা শোনার পর মনে হয়েছিল, কোথাও কেউ একজন ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, করবে। করতে বাধ্য!... রুকলিনের বড়বাবু মন্মথ সোমের প্রস্তাব শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল কেন? এই কলকাতায় শিকড় গেঁথে বসতে পারাটাই তো তখন একমাত্র কাম্য ছিল, প্রাণপণে চাকরিটা রক্ষা করতেই তো চেয়েছিল, তবু অমন দিশেহারা দশা কেন সেদিন?

...বাপী ভাবছে কেন। মিষ্টির সঙ্গে অচিরে দেখা হওয়াটা সেদিনও কোনো কল্পনার মধ্যে ছিল না। কিন্তু নিশীথ যা বলেছিল সেই অসম্ভব ব্যাপারটা সত্তার মধ্যে ছিল।... কোথাও কেউ একজন ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, করবে। করতে বাধ্য।

...কল্পনার বাইরে ব্যাপারটা ঘটেছে। সেই একজনের দেখা পেয়েছে। বাপীকে চিনতে পারেনি। কিন্তু পারলে কি হত? কি হবে? নিশীথ তবু কবিরাজের ছেলে হবু কবরেজ। বাপী কে? বাপী কি? এখন পেট ঠাণ্ডা, মাথা ঠাণ্ডা। ফলে করকরে বাস্তবটাও বেশি স্পষ্ট। এখন আর জোর দিয়ে ভাবা যাচ্ছে না কেউ একজন ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, করবে বা করতে বাধ্য। আধুনিক মেয়ের হবু কবরেজের প্রেমে পড়ার থেকেও এ বেশি হাস্যকর অবাস্তব।

স্নায়ু তেতে উঠছে আবার। যত অবাস্তবই হোক সেটা নস্যাৎ করার চেষ্টা।...হিসেবের বাইরে কত কি ঘটে, কত কি হয়। বানারজুলির বিশালকায়া বনমায়ার চেহারাখানা সামনে এগিয়ে এলো। বুনো হস্তির ডাকে ভয়ে কুঁকড়ে না গিয়ে ওই বজ্জাত সকলের সব হিসেব বানচাল করে শিকল ছিঁড়ে কি বছর

তার সঙ্গেই পালায় কেন? জাতের ভয় আর সমাজের ভয় সিকেয় তুলে ভীমবাহাদুর আর তার ভালবাসার কালো মেয়ে কাছাকাছি আসে কেমন করে? আবু রববানী কি এতদিনে রেশমাকে নিজের ঘরে এনে তুলতে পেরেছে? এ-ও তো কোনো হিসেবের মধ্যে পড়ে না।

…অন্ধকারে বড় করে চোখ তাকিয়ে আরো কিছু দেখছে বাপী। বানারজুলি বাংলোর বড়সাহেবের সেই মেয়ে মিষ্টি আর সাতাশি নম্বর বাড়ির এই মিষ্টিকে পাশাপাশি দেখছে। কিছু ভেঙে আর অনেকটা জুড়ে সেই মিষ্টি থেকে এই মিষ্টি। বাপীও তাই। কিন্তু বাপী আর কত বদলেছে? আট বছর আগের সব কিছু তো একেবারে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে। তাহলে সেই মিষ্টি বা কতটা বদলাতে পারে? কতটা বদলানো সম্ভব?

পার্কে নিজের কল্পনায় ছবিগুলো সামনে এগিয়ে আসছে আবার। বাস্তব অবাস্তব সম্ভব অসম্ভবের দরিয়া পারের ছবি।…মাথায় বড় খোঁপা। আগের ফুটফুটে ফর্সা রঙে এখন মেটে ছোপ। ফোলা গাল আর আদুরে ভাব গিয়ে এই মুখের অন্য ছাঁদ। চোখের সেই গোল-ভাব এখন আয়ত গভীর। তাতে বুদ্ধির ছাপ, কৌতুকেরও।…মিষ্টি। পার্কে দেখা মিষ্টির সেই হাসি। সেই সব কথা। মন জুড়নো হাসি, প্রাণ জুড়নো কথা।

…মিষ্টি। আমি বড় ক্লান্ত। তোমার একখানা হাত আমার মাথায় রাখো। আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

বাপী ঘুমিয়েই পড়ল।

কলকাকলির কলরব জমে ওঠার আগে বাপী মুখ-হাত ধোয়া সেরে আসে। নইলে মেয়েদের জটলার মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু অনেক দিন বাদে আজই ঘুম ভাঙতে দেরি। মাথাটাও অন্যদিনের মতো ভার-ভার নয়। উল্টে ঝরঝরে লাগছে। ওদিকে কলতলা জমজমাট।

কলসির জল গড়িয়ে মুখ ধোয়ার কাজটুকু জানলা দিয়ে সারল। তারপর আবার শুয়ে চায়ের অপেক্ষা। এই সকালেও কমলার মুখোমুখি হওয়ার চিন্তা অস্বস্তিকর। সেটুকু চাপা দেবার জন্যেই বাপী বেশি গম্ভীর। তার কেন যেন ধারণা, চা দিতে এসে কমলা আজ মুখে কোনো কথা বলবে না। শুধু চেয়ে দেখবে একটু। তারপর চায়ের গেলাস বাড়িয়ে দিয়ে চুপচাপ চলে যাবে। হাসা বা কথা বলার সুযোগ দিতেও চায় না বলে বাপী এমন গম্ভীর। …কিন্তু চা দিতে আজ দেরিই হচ্ছে।

ক্যাঁচ-করে দরজা ঠেলার সেই পরিচিত শব্দ। পরের মুহূর্তে বাপী বিমূঢ়।

এক হাতের ডিশের ওপর ওর চায়ের গেলাস আর অন্য হাতে নিজের গেলাস নিয়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকছে রতন বনিক। আর সেই কটা মুহূর্তের মধ্যে বাপীর মনে হল, কমলার মুখে রোজ সকালের বড়বাবু ডাকটা বড় মিষ্টি লাগত।

রতন বলল, জেগে আছেন দেখছি-নিন। হাসছে।—পিওনের বউ হলে কি হবে, দেমাক খুব। বলে, আমাকে অপমান করলে আমি যাব কেন, তুমি যাও।

ডিশে বিস্কুটসহ গেলাসটা হাতে নিল বাপী। কমলা এলো না, স্বস্তি। রাগই যদি হয়ে থাকে তাহলে আরো স্বস্তি। কিন্তু এখানে অপমান শব্দটা খুব প্রাঞ্জল নয়। হাসতে চেষ্টা করে বলল, অপমান কি করলাম···।

—মেয়েছেলের কথা ছাড়েন। আপনার জন্যে রান্না হচ্ছে জেনেও আর পিছন থেকে ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও আপনি নাকি না খেয়ে চলে গেলেন—সেই অপমান। আর বলে কি, আপনার খাবার-টাবার এবার থেকে আমাকেই দিয়ে যেতে হবে, ও পারবে না।

বাপী বলল, কিছু দরকার নেই, কাউকে দিয়ে যেতে হবে না।

রতন এবার মাথা নাড়ল—সে হবে না। বউ বলছিল, রাতে ছেড়ে দিনেও নাকি সব দিন আপনার খাওয়া হয় না। অতিথি না খেয়ে থাকলে গেরস্তের অকল্যাণ হয় এ সম্বন্ধে বউয়ের সঙ্গে আমি একমত। দিনে আপনিও কাজের ধান্ধায় ঘোরেন, আমিও সকাল সকাল আপিসে চলে যাই— যে ক-দিন না বউয়ের রাগ পড়ে, আপনার রাতের খাবার আমিই দিয়ে যাব। ফের আপনি রাতে উপোস দিচ্ছেন জানলে বউটা সত্যি ক্ষেপে যাবে···যত দেমাকই দেখাক, ওর ভেতরটা ভালো, বুঝলে বিপুলবাবু।

বাপী একটুও খুশি হতে পারছে না। বলল, তোমার বউয়ের কি ধারণা আমি পয়সার অভাবে উপোস দিচ্ছি?

রতন জিভ কাটল।—তা কেন, ছি-ছি-ছি, বউও জানে নিজের খেয়ালে থাকেন, তাই সময়ে খাওয়া হয় না—এই জন্যেই তো আরো বেশি মায়া। আপনার যদি সম্মানে লাগে না-হয় মাসের শেষে ধরে দেবেন কিছু—খাওয়াটা তো হবে।

আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই বুঝে বাপী চুপ। রতন বনিক এবারে একটু নিরীক্ষণ করে দেখল ওকে।—আপনার কপালের রঙ এখন অবশ্য আরো একটু কালো হয়েছে···তা ভাল হবার আগে অনেক সময় অমন হয়। আপনার দিন ফিরতে আর খুব বেশি সময় লাগবে না, দেখে নেবেন।

হাত বাড়িয়ে ডিশ আর গেলাস নিয়ে রতন চলে গেল। বাপী বিমনা একটু। এরকম আশার কথা রতন অনেক বলেছে। বাপী কানে তোলেনি। কখনো বা হেসেছে। আজও ওর কথা বেদবাক্য ভাবছে না। শুধু রতনের এই বিশ্বাসের জোরটুকুই ভিতর থেকে কে যেন আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

মাথার মধ্যে সময়ের একটা হিসেব ঘুর-পাক খাচ্ছিল বাপীর। স্নান সেরে জামাকাপড় বদলে সেই সময় ধরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ট্রাম বা বাস ধরার দরকার নেই, হাতে সময় যথেষ্ট। হাঁটার ব্যাপারে পা দুটো বাধ্যও খুব। ট্রাম-বাসের ভিড়ে হাঁপ ধরে।

…সাতাশি নম্বরের সেই বাড়ির রাস্তা সকলের জন্য খোলা। শুধু বাপীর জন্য নয়। কিন্তু খোলা থাকলেও বাপী আজ ও-পথ মাড়াতো না। পাড়ার ওই ছেলেগুলোর হামলা করার কোনো দরকার ছিল না। ওদের চোখের সাধ মেটানোর ভাগীদার নয় বাপী। পরের ভাবনা তাকে এমনিতেই ভাবতে হত। ভাবা হয়েছে।

…সাতাশি নম্বর বাড়ির সাদাটে গাড়ি রাস্তার বাঁক নিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ে। তারপর ডাইনে যায় কি বাঁয়ে, উত্তরে কি দক্ষিণে সেটুকুই আজ দেখা দরকার। আজ আর এর বেশি কিছু নয়।

সাদা গাড়ির নম্বরসুদ্ধ জানা। তাই বড় রাস্তার মুখোমুখি দাঁড়ানোরও দরকার নেই। সেখান থেকে কম করে একশ গজ দূরে একটা গাড়িবারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল। সময় ধরে এসেছে। খুব অপেক্ষা করতে হবে না জানে। আট-দশ মিনিটের মধ্যে সেই সাদা গাড়ি বড় রাস্তার মুখে। ভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বাপী জানে না। হর্ন বাজিয়ে গাড়িটা বাঁয়ে অর্থাৎ বাপী যেদিকে দাঁড়িয়ে সেইদিকে ঘুরল। তারপর একশ গজ গড়াতে আর কতটুকু?

মিষ্টি গাড়ির বাঁ দিকে। আপনা থেকেই বাপীর পা দুটো ফুটপাথ ঘেঁষা রাস্তার দিকে এগিয়ে এসেছে। কয়েক পলকের মুখোমুখি, চোখাচোখি। মিষ্টি চিনেছে। চিনেছে বলতে বে-পাড়ার যে ছেলেটাকে বাড়ির সামনে কদিন হ্যাংলার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে আর গতকাল দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাড়ার ছেলেগুলোর হাতে যার দুর্ভোগ দেখেছে—তাকে চিনেছে। আজ এইখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থটাও ওর কাছে যেন খুব স্পষ্ট। সেই কটা মুহূর্তের মধ্যে বাপীর মনে হয়েছে, মিষ্টি ওকে দেখেছে আর দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেন তাকাতেও অরুচি।

গাড়িটা এগিয়ে গেল। বাপীর চোখে আগুন। বুকের তলায় সেই

অসহিষ্ণু দাপাদাপি। কাল ওর পাড়ার ছেলেরা যে অপমান করেছিল, আজ এই বিতৃষ্ণা অবজ্ঞার চাউনি ছুঁড়ে ও যেন তার দ্বিগুণ অপমান করে গেল।

গাড়িটা কোন্ দিকে কোন্ রাস্তা ধরে যায় আজ শুধু একটু জানতে বুঝতেই এসেছিল। কিন্তু ওপরঅলার ইচ্ছে অন্য রকম। বাপী শ্যেনদৃষ্টিতে ওই চলন্ত গাড়িটার দিকেই চেয়ে ছিল। সামনেই বড় রাস্তার চার-মুখে দাঁড়িয়ে গেল ওটা। ট্র্যাফিকের লাল আলো জ্বলে উঠেছে. সবুজ হলে আবার চলবে।

সত্যি কেমন বরাত আজ বাপীর কে জানে। পরের যা প্ল্যান সেটা এই মুহূর্তে এভাবে হাতের মুঠোয় পাবে ভাবেনি। গাড়িবারান্দার ও-মাথায় একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। আট-দশ গজের মধ্যে। বাপী ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল। বাঙালী ড্রাইভার ঘাড় ফেরাতে আঙুল তুলে সামনেটা দেখিয়ে দিল।

বাঁ দিকে পাঞ্জাবীর বুক পকেটের ওপর হাত রেখে চাপ দিল একটু। ধপ ধপ কতটা করছে দেখার জন্যে নয়। খুচরো পয়সা নিচের পকেটে থাকে, আর টাকা পাঞ্জাবির ভিতরের পকেটে। কলকাতার ট্রাম-বাসে চড়তে হলে সব জামার ভিতরে একটা করে পকেট দরকার সেটা নিশীথ ওকে গোড়াতেই বলে দিয়েছিল। যে কটি টাকা খরচ মাসে, ব্যাঙ্ক থেকে একবারেই তুলে ফেলে। খরচ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে-টাকা ওর জামার সঙ্গেই ঘোরে। তবু সাবধানের মার নেই। আজ জামা আর পাজামা বদলেছে। আনতে ভুলেছে কিনা একবার ওপর দিয়ে স্পর্শ করে বুঝে নিল।

সাদা গাড়ির দুটো গাড়ি পিছনে ওর ট্যাক্সি। কলকাতার ট্যাক্সিতে বাপী এই প্রথম। এর আগে বারকয়েক নিশীথের বাবার পুরনো গাড়িতে চাপা হয়েছে।···হলদে আলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই সবুজ আলো। এ-দিকের গাড়ির সারি চলল।

খুব গম্ভীর গলায় বাপী ড্রাইভারকে বলল, ওই সাদা গাড়িটার পিছনে চলুন তো···। গাড়ির নম্বরও বলে দিল।—গাড়ির ওই মেয়েটি যে কলেজে পড়ে, আমার আগে সেখানে একবার যাওয়া দরকার, কলেজের নামটা মনে পড়ছে না···।

সাদা গাড়ির পিছনের কাচ দিয়ে ওই মেয়ের শুধু মাথা আর গলা দেখা যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের উৎকণ্ঠার পর বাপী নিশ্চিন্ত একটু।—মিষ্টিদের বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করতে গিয়ে জ্যোতিষীর হাতে নাকাল হওয়াটা ভোলেনি। ড্রাইভার ঘাড়ও ফেরালো না। সাদা গাড়ির পিছনে চলল।

হাওরায় সাদা গাড়ি ডাইনে বাঁক নিল। বাপীর ট্যাক্সিও। তারপর বেশ খানিকটা সোজা গিয়ে তারপর কোথা দিয়ে কোথায় চলল ঠাওর করা গেল না। এদিকের সব রাস্তাই বাপীর অচেনা। আরো খানিক বাদে সচকিত। এবারে চেনা লাগছে জায়গাটা। গাড়ি আর পিছনের ট্যাক্সি পার্ক সার্কাসের ময়দানের দিকে চলেছে। মণিদার বাড়ি থেকে মাইল দেড় দুই হাঁটা পথ। ওই ময়দানে বাপী অনেকবার এসেছে।···ট্যাক্সি এখন ছেড়ে দিলেও চলে। বাপী বুঝে নিয়েছে ওই মেয়ের কোন কলেজ। মেয়েদের একটাই নামডাকের কলেজ এখানে।

সামনের সাদা গাড়ি বড় ফটকের সামনে থামল। মস্ত কাঠের গেটের এক পাট খোলা। বাপী পঁচিশ-তিরিশ গজ পিছনে ট্যাক্সিটা দাঁড় করালো। সাদা গাড়ি থেকে নেমে মিষ্টিকে ভিতরে ঢুকে যেতে দেখল। গাড়িটা ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাপী ট্যাক্সি থেকে নামল। মিটার দেখে ভাড়া মেটানোর সময় ট্যাকসিঅলা শুধু মুখের দিকে তাকালো একবার। সে হয়তো আশা করেছিল তাকে অপেক্ষা করতে হবে। কারণ ট্যাক্সিতে উঠে বাপী বলেছিল, মেয়েটি যে কলেজে পড়ে আগে একবার সেখানে যাওয়া দরকার। মুখে কিছু বলল না ট্যাক্সিঅলা, কিন্তু একবার চোখ তাকিয়ে যেন বলে গেল তোমার মতো সোয়ার আমার অনেক দেখা আছে।

পায়ে পায়ে ফটকের দিকে এগলো। গাড়িতে বাসে পায়ে হেঁটে দলে দলে মেয়ে আসছে আর ঢুকে যাচ্ছে। কলেজের চারদিক ঘেরা উঁচু পাঁচিল। এক-পাট খোলা, ফটকের ভিতর দিয়ে সামনের বিশাল হলদে দালান দেখা যাচ্ছে। দুদিকে বাগান।

···না, এখন নয়। আরো ঘণ্টা কয়েক বাদে। বাপীর আর তাড়া কিছু নেই। ফিরে চলল। ময়দানে ঘোরাঘুরি করে কাটাল খানিক। তারপর আবার রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা হেঁটে একটা বড় রেস্তর্াঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেল। নিশীথের সঙ্গে ছোট রেস্তর্াঁয় খেয়েছে। কিন্তু এইদিন অন্য সব দিনের থেকে তফাৎ কিছু হবেই। ঢুকে পড়ল। মুখ-হাত ধোবার জায়গায় বড় আয়না। নিজেকে দেখে নিল। পা-জামার বদলে পরনে ধুতি থাকলে ভাল হত। তবু পাটভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবিতে খারাপ দেখাচ্ছে না। এ ব্যাপারে গৌরী বউদি ওকে একটু শৌখিন করে দিয়েছিল।

বেশ করে খেয়ে নিল। অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল। হোক।

সব থেকে বড় ফয়সলাই হয়তো আজ হয়ে যাবে। ছোট কিছু ভালো লাগছে না।

বাপী কিছু চিন্তা করছে না। কিচ্ছু ভাবছে না। সব ভাবনা-চিন্তা পরে। এলোমেলো ঘোরাঘুরি করে সময় কাটাতে লাগল। ছুটো যেন আর বাজবেই না।

বাজল একসময়। বাপী তখন কলেজ-ফটকের কাছাকাছি। দরোয়ান বসে আছে একজন। এখান থেকেই বাধা পড়বে কিনা কে জানে। না, কিছু বলল না। বাপী সোজা কলেজের দালানের দিকে চলল। ছ-দিকের বাগানে ছুটো-চারটে করে মেয়ে বসে।

হলঘরের সামনের কাঠের বেঞ্চিতে জনাতিনেক বেয়ারা বসে। ওদের মধ্যে বুড়ো মতো অবাঙালী লোকটাকে ডাকল। সে উঠে এলো।

—মালবিকা নন্দীকে চেনো?···থার্ড ইয়ারে পড়ে।

পুরনো বেয়ারা, পুরনো ছাত্রীদের অনেককেই চেনে।—মালবিকা নন্দী কোন ডিপার্ট, হিস্টরি?

বাপী মাথা নাড়ল।

—কি দোরকার আপনার?

—খুব দরকার—একটু যদি খবর দাও···

আঙুল তুলে সে একটা ঘর দেখিয়ে দিল।—ওই আপিস ঘরে গিয়ে বোসন—শ্লিপ ভেজিয়ে দেন—

বাপী বলল, তুমি একটু সাহায্য করো না ভাই, আমি বাইরে থেকে এসেছি, কিছুই জানি না, একটা খবর দেওয়া খুব দরকার।

বিনয়ে তুষ্ট প্রায় সকলেই। আধবুড়ো বেয়ারা ওকে সঙ্গে করে আপিস ঘরে নিয়ে এলো। কেরানীবাবুকে নিজেই কি বলে একটুকরো সাদা কাগজ ওর হাতে দিল।—আপনার নাম লিখে দেন, আওর ঠিকানা।

পেন্সিলও সে-ই এগিয়ে দিল।

বাপী প্রথমে লিখল, মালবিকা নন্দী। তলায় লিখল, বাপী তরফদার। বানারজুলি ফরেস্ট।

বেয়ারা স্লিপ নিয়ে চলে গেল। বাপী আবার বাইরের বারান্দায়।

ছটা-সাতটা মিনিট নয়, যেন একটা যুগ। বেয়ারা ফিরে এসে জানালো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে ক্লাস শেষ হোবে—ওপেক্ষা করুন, আসছেন।

অনেকক্ষণের একটা রুদ্ধ শ্বাস মুক্তি পেয়ে বাঁচল। বাপী পায়ে পায়ে

বারান্দা ছেড়ে নিচে নেমে এলো। তারপর ফটকটার দিকে কয়েক পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

…মিষ্টি তাহলে আসছে!

॥ সাত ॥

মিষ্টি এলো। বারান্দায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

স্লিপটা পেয়ে আগ্রহ নিয়ে নেমে এসেছিল মনে হয়। কারণ বাপীর পুরো পাঁচ মিনিটও অপেক্ষা করতে হয়নি। কিন্তু চোখাচোখি হওয়া মাত্র তার দু'চোখে ধাক্কা খেল। বানারজুলির বাপী তরফদার এই লোক সেটা কল্পনার মধ্যেও ছিল না। শুধু অবাক নয়, অপ্রস্তুতও। কারণ, এখন হয়তো দেখা মাত্র মনে হয়েছে এই লোক বা এমন লোক বাপী তরফদার ছাড়া আর কে হতে পারে?

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলার ইচ্ছে থাকলে বাপী এদিকে সরে আসত না। চুপচাপ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। চেয়ে রইল। দু চোখে হাসি ছুঁয়ে আছে কি নেই। বাকিটুকু প্রতীক্ষা। দেখার পর আর চেনার পর ওই মেয়ে এখন যদি মুখ ঘুরিয়ে আবার ভিতরে চলে যায়, জীবনের পুরনো অধ্যায় পুরোপুরি শেষ করে নিয়ে বাপীও নিজের পা দুটোকে গেটের বাইরে টেনে নিয়ে যাবে।

শেষ নয়। বারান্দা থেকে নামল।

…পরনে গাঢ় খয়েরি রঙের ওপর চকচকে সাদা বুটির শাড়ি। গায়ে ধপধপে সাদা ব্লাউজ। পায়ে হালকা খয়েরি শৌখিন স্যাণ্ডাল। বাপী ভোলে না কিছু। বানারজুলির সাহেব বাংলোয় লাল ডুরে শাড়ি পরা দশ বছরের মিষ্টিকে দেখে রূপকথার রাজকন্যার মতো মনে হয়েছিল। ওর সেই ঝলমলে শাড়ি সামলানোর বিড়ম্বনাটুকুও মনে আছে।…এখন এই পাতলা দামী শাড়ি দেহের ভাঁজে ভাঁজে অনায়াসে লেপটে আছে। একটুও বাড়তি নয়।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। আসার এই নিস্পৃহ ধরনটা বানারজুলির বাংলো থেকে সেই মিষ্টির নেমে আসার সঙ্গে মেলে কিছুটা। আসার আগ্রহ যদি থাকেও, বুঝতে দিতে আপত্তি। দেড় গজ তফাতে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর একটুকুরো হাসি ঠোঁটের ফাঁকে যেন এসেই গেল।

—এত দিনে চিনতে পেরেছ তাহলে?

বাপীর গলায় বাড়তি উচ্ছ্বাস নেই। অভিমানও না।

সোজা মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি দেখছে ওকে। বানারজুলির সেই দুরন্ত দস্যি ছেলেটাই যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হাসল। মাথা নাড়ল। চিনতে পেরেছে। হাসিমাখা কালো দুচোখ ওর মুখের ওপর নড়াচড়া করল একটু। জিজ্ঞাসা করল, তুমি চিনলে কি করে?

চোখে এর মধ্যে ওকে অনেকবার দেখেছে। আর মনে মনে তো অবিরাম দেখে চলেছে। আট বছর বাদে গলা এই প্রথম শুনল। কচি ছেলের মতো হাল্কা মিষ্টি।

বাপী কি জবাব দেবে? বলবে গত আট বছরের মধ্যে আটটা দিনের জন্যেও তুমি আমার চোখের আড়ালে ছিলে না—আমি চিনব না কেন? গত্যাকারের সত্যি কথাই বেরুলো মুখ দিয়ে। বলল, তোমাদের বাড়ির রাস্তার এ মাথায় এক জ্যোতিষীর চেম্বারে রাত্রে মায়ের পাশে বসে তুমি হাত দেখাচ্ছিলে…আমি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখছিলাম।

মাত্র দিন কতক আগে মা জ্যোতিষীর কাছে টেনে নিয়ে গেছল সেটা মনে না পড়ার কথা নয়। মিষ্টি হাসছে অল্প অল্প আর দেখছে। একসঙ্গে অনেক দেখার আছে যেন। বলল, মা সঙ্গে ছিল বলে চিনেছ। ডেকে কথা বললে না কেন?

—এভাবে হঠাৎ তোমার দেখা পেয়ে খুব অবাক হয়ে গেছলাম।… তোমাদের বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় ছিলাম।

—তারপর? মিষ্টি উৎসুক।

—তোমরা বেরিয়ে এলে। তখনো আমাকে হাঁ করে তোমার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে তোমার মা ঝাঁঝালো গলায় স্টুপিড বলে গাড়িতে উঠলেন। তুমিও খুব বিরক্ত হয়েছিলে—

মিষ্টির মুখে মিষ্টি বিড়ম্বনার খেলা।—কক্ষনো না, আমার কিছু মনে পড়ছে না।

মনে পড়ছে কি পড়ছে না তা নিয়ে বাপীর কোনো মাথাব্যথা নেই। মন বলছে আট বছর বাদে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ওকে দেখে আর চিনে এই মেয়ে অখুশি নয়। আট বছর আগের সেই বানারজুলির দিনগুলি এই দুটো কালো চোখে একসঙ্গে ভিড় করে এসেছে। আসছে।

—তোমার ক্লাস আছে?

—ছিল। হাত উল্টে ঘড়ি দেখে নিল।—ক্লাস বসে গেছে, আর ঢোকা যাবে না।

—খুব ক্ষতি হল?

মিষ্টি হেসেই মাথা নাড়ল।—খুব না।

—এ ঘণ্টার পরে ছুটি?

—না, আর একটা ক্লাস আছে।

—একদিন এ ক্লাসও কামাই হলে?…

হাসি-ছাওয়া দু'চোখ মুখের ওপর থমকালো একটু। নাকচ করার কথা কেন যেন ভাবাও গেল না। জবাব দিল, হলে আর কে কি কচ্ছে।… আচ্ছা একটু দাঁড়াও আসছি—

কয়েক পা এগিয়েই ঘুরে তাকালো।—এই একদিনই তো?

বাপী চেয়ে রইল। জবাব দেবার মতো প্রশ্ন কিছু নয়। কান-মন ভরে দেবার মতো কিছু। হালকা পা ফেলে মিষ্টি চলে গেল।

চারদিকে চেয়ে বাপী দেখছে। এটা গতকালের সেই পার্ক নয়। মিষ্টির এই আসা বা যাওয়া গতকালের মতো দিবাস্বপ্ন নয়। কিন্তু গতকালের সেই আমেজটুকুর সঙ্গে এই বাস্তবের বড় অদ্ভুত মিল। এক আশ্চর্য শান্তিতে সেই রকমই ভিতর-বার ডুবে যাবার মতো। পার্কে পুলিশের লাঠির খোঁচায় ঘোর কাটার পরেও ঘরের দিকে পা চালিয়ে বাপী ভাবছিল, আটটা বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে কোনো নিভৃতে এই মেয়ের মুখোমুখি হতে পারলে পার্কের সেই কল্পনার ছবিটা একেবারে মিথ্যে হয়ে যাবে না। হতে পারে না।

মিথ্যে হয়নি। বিস্ময়ের সেই হাবুডুবু ব্যাপারই দেখেছে। খুশির চাপা তরঙ্গ দেখেছে। হাসিটুকুও সেই রকমই।

মানুষের ভিতরের কোন দিকটা আসল সত্য, অনুভূতির এই জোয়ারে তারও হদিস মেলা ভার। জ্যোতিষীর ঘরে মায়ের পাশে এই মিষ্টিকে দেখা মাত্র অনেক—অনেক দিনের ক্ষুধার্ত স্নায়ুগুলো একসঙ্গে টান-টান হয়ে উঠেছিল। তারা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞানশূন্যের মতো এই বাপী তরফদার দু'হাতের মধ্যে এসে মাকে ছেড়ে ওই মেয়েকে ব্যভিচারী দুটো চোখের বাঁধনে আগলে রাখতে চেয়েছিল। পিছনে লাল আলো জ্বেলে সাদা গাড়িটা চলে যাচ্ছিল যখন, তখনো চৌদ্দ বছর বয়সের সেই প্রবৃত্তির আগুন বাইশ বছরের দেহের শিরায় শিরায় দাউ দাউ করে জ্বলছিল। পরেও সাতাশি নম্বরের বাড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে যতবার দেখেছে ওকে, বাসনার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলেছে। আর গতকাল বাড়ির দোতলার বারান্দার রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত মুখে ওর ওপর কতগুলো হায়নার হামলা দেখছিল আর

মজা পাচ্ছিল যে মেয়ে—তাকে কোন পাতালে টেনে নিয়ে যেতে পারলে সঠিক জবাব হয়, বুকের তলায় সেই নরক খুঁজে বেড়াচ্ছিল। প্রবৃত্তির সেই নিষ্ঠুর আদিম অভিলাষে সমস্ত মেয়ে জাতটাকেই দগ্ধে নিঃশেষ করতে চেয়েছে। ভিতরের পশুটা থাবা চেটেছে। তারপর একজনকে না পাওয়ার আক্রোশে আর একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছে। কমলা বনিক কতটা দেখেছে কতটা বুঝেছে বাপী জানে না।

আজ?

পার্কের গতকালের অনুভূতিটুকুই ঠাণ্ডা প্রলেপের মতো ভিতরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে। বুকের তলায় দুমড়নো গুমরনো সেই ভীষণ যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই। সেই ভয়ংকর আক্রোশ নেই। সুড়ঙ্গপথের সেই জানোয়ারটাও উধাও। তার পরিত্যক্ত শূন্য গুহা-গহ্বর খুঁজে বাপীর শান্ত দৃষ্টি আবার ওই হলঘরের বারান্দার দিকে।

আর ঘড়ি দেখেনি। তবু আট-ন' মিনিটের বেশি হবে না বোধ হয়। মিষ্টি আসছে। হাতে দুটো মোটা বই আর একটা বাঁধানো খাতা। লালচে মুখ। চোখে এখনো হাসি চিকচিক করছে। বানারজুলির বাপী ভাবত মিষ্টি কবে বড় হবে। বড় হয়েছে। বড় হবার পর বানারজুলির সেই সব কাণ্ড যদি মনে পড়ে তাহলে কোন মেয়ের মুখে না লালের আভা ছড়াবে?

বাপী হলপ করে বলতে পারে মনে পড়েছে। নইলে আসত না। পাত্তা দিত না।

কাছে এসে হাসি মুখে মিষ্টি বলল, দাদুকে অফিস চেম্বারে একটা ফোন করলাম। গাড়ি নিয়ে আসার দরকার নেই বলে দিলাম।

এই পুরস্কারটুকুও বাপী দুটো চোখ দিয়েই গ্রহণ করল। এখানে আর দাঁড়ানোর ইচ্ছে নেই। বানারজুলির মতো এই মিষ্টি মায়ের খুব পরোয়া করে মনে হয় না। তবু গেটের দিকে পা বাড়িয়ে জিগ্যেস করল, তোমার মা ভাববেন না?

মিষ্টির কথাবার্তায় আগেও ঘোরপ্যাচ ছিল না খুব, এখনো অনেকটা তাই, পাশে চলতে চলতে হালকা সুরে বলল, মাকে নিয়েই মুশকিল, সব সময় বেশি ভাবে—

—কি রকম?

—তাঁর ধারণা, দুনিয়ার সব ছেলে তাঁর মেয়েকে গিলে খাবার জন্য হাঁ করে আছে। হেসে ফেলে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো একবার।—কোথায় যাচ্ছি,

এখানে তো বানারজুলির মতো জঙ্গল নেই…

কথাগুলো ভবল হলেও একেবারে সবল ভাবা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে সহজ হবার দায় বাপীরই। সেও তাকালো একবার। স্বীকার করে নিয়েই জবাব দিল।—না, এখানকার জঙ্গল বানারজুলির মতো নয়…।

—এখানকার জঙ্গল মানে? মিষ্টির মুখে পলকা বিস্ময়।

বাপী হাসছে অল্প অল্প। গেটের বাইরে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। হালকা করে একটু ভারি জবাবই দিয়ে বসল।—বানারজুলির জঙ্গলে আর যাই বলো কোনরকম কৃত্রিমতা বা ছলনা নেই। পাঁচ মাস হল এসে দেখছি এখানে সবটাই তাই। শব্দ করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সামাল দেবার চেষ্টা। বলল, কেবল এই খানিকক্ষণ হল অন্য রকম লাগছে—

অর্থাৎ খানিক আগের এই যোগাযোগের পর থেকে কৃত্রিমতা বা ছলনা দূরে সরেছে। মিষ্টির আয়ত দু চোখ ওর মুখের ওপর।

কি দেখছে বাপী অনায়াসে বলে দিতে পারে। নিজের গায়ের রং কোনদিনই ফর্সা নয়। কিন্তু ছাঁদ-ছিরির কিছু প্রশংসা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছে। ড্রইং-মাস্টার ললিত ভড় বলতেন, ললিত-ঋজু-দাক্ষিণ্যে পুষ্ট হলে তবে পুরুষ। লক্ষ্য করলে ওর মধ্যেও পুরুষের এই দাক্ষিণ্যটুকু এখন মেয়েদের চোখে পড়ে। রতন বনিকের বউ কমলা বনিকের চোখে পড়েছে। মণিদার বউ গৌরী বউদির চোখে পড়েছে। ক্লাবঘরের বড়বাবু মন্মথ সোমের মেয়ে উষার চোখে পড়েছে। মিষ্টির চোখেও পড়ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভেতর দেখে নেওয়ার চেষ্টা। বানারজুলি জঙ্গলের চৌদ্দ বছরের বেপরোয়া ছেলের সেই হিংস্র লোলুপ তাড়না কতটা আড়াল নিয়ে আছে বোঝার চেষ্টা।

বাপীর মজা লাগছে। মুখে কিছু না বলে ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

মিষ্টি সচকিত। বাংলো থেকে ওকে বার করে জঙ্গলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হাতের ওপর দখল নিত তাও মনে না পড়ার কথা নয়।—কি?

—বইখাতা আমাকে দাও।

মিষ্টি হেসে ফেলল। দিয়েও দিল।

বাপী বলল, শহরের রীতি অনুযায়ী এখন কোথাও গিয়ে তোমাকে একটু চা খাওয়ানোর প্রস্তাব করা উচিত বোধ হয়…

তেমন হেসেই মিষ্টি জবাব দিল, শহরের রীতি অনুযায়ী আমারও সায় দেওয়া উচিত।

সামনের দিকে এগলো দুজনে। বইখাতায় নরম হাতের স্পর্শ লেগে আছে। সংগোপনে সেটুকু অনুভব করার লোভ বাপীর।

মিষ্টি এদিকে ফিরল। দু চোখে কৌতুহল ছেয়ে আছে।—জ্যোতিষীর ওখানে দেখে তুমি আমাদের বাড়ি চিনলে কি করে?

বাপী ঘটা করে বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা।—সেজন্য অনেক মেহনত করতে হয়েছে। প্রথম সেই জ্যোতিষীর কাছ থেকে মিথ্যে অজুহাতে ঠিকানা আদায় করতে গিয়ে চোরের দায়ে ধরা পড়ার দাখিল হয়েছিল।

চলতে চলতে সকৌতুকে আবার ঘাড় ফেরালো মিষ্টি।—তারপর?

—তার পরের দিন দুপুর থেকে তোমাদের ওই রাস্তা চষেও কোনো হদিস পাওয়া গেল না। শেষ কলেজ স্ট্রীটে এক বন্ধুর বাড়ি এসে টেলিফোন ডাইরেকটরিতে তোমার বাবার নাম খোঁজা হল—

—বাবা তো অল ইণ্ডিয়া সার্ভিসে চলে গেছেন, এখন মধ্যপ্রদেশে পোস্টেড। আমি আর মা দাদুর কাছে থাকি, টেলিফোন দাদুর নামে—পাবে কি করে।

—পাইনি। এরপর তোমাদের গাড়ির নম্বর সম্বল। সেটা মনে ছিল। বন্ধুর সাহায্যে মোটর ভেহিকিলস-এ এসে একজন দালালকে এক টাকা ঘুষ দিয়ে তবে ঠিকানা হাত করা গেল।

সাদামাটা সত্যি কথার সহজ প্রতিক্রিয়াটুকু লক্ষ্য করছে বাপী। মিষ্টি হাসছে। আগের কথা ভোলেনি বলেই অবিশ্বাস করছে না। বলল, ঠিকানা হাতে পেয়েও বাড়িতে না ঢুকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে কেন?

—তোমার মায়ের ভয়ে।

বিব্রত মুখে মিষ্টি বলল, ভিতরে এলে মা কি তোমাকে সেই বানারজুলির মতো তাড়া করে আসত নাকি?

তেমনি সাদাসিদে মুখে বাপী জবাব দিল, না চিনেই স্টুপিড বলেছিলেন, চিনলে তাড়া করার কথা নয়?

মিষ্টি আর যেন তেমন জোর দিয়ে অস্বীকার করতে পারল না। বাপী বলল, তবু গতকাল কপাল ঠুকে ঢুকেই পড়ব ভেবেছিলাম। অদৃষ্টে দুর্ভোগ লেখা ছিল। তোমার পাড়ার ভক্তের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে টানা-হেঁচড়া শুরু করে দিল। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে তুমি সেই দুর্দশা দেখছিলে। তোমার ভক্তদের তাইতে আমাকে শায়েস্তা করার উৎসাহ আরো বেড়ে গেছল।

এও সত্যি। মিষ্টির সহজ হবার চেষ্টা।—আজ তাই অন্য রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলে?…আমার এই কলেজ জানলে কি করে?

—গাড়ি থেকে আমাকে দেখে তুমি বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে। তখন ট্যাক্সিতে ফলো করে তোমাকে এই কলেজে ঢুকতে দেখলাম।

একটুও বাড়িয়ে বলেনি। রং ফলায়নি। আট বছর আগের ছেলেবেলার সেই দুরন্ত দস্যিকে এর সঙ্গে মেলানো সহজ নয়। কিন্তু মিলছেও আবার। জিগ্যেস করল, তারপর এই বেলা দুটো পর্যন্ত অপেক্ষা করে স্লিপ পাঠালে?

বাপী হাসল। বলল, স্লিপ পেয়েও তুমি আসবে কি আসবে না সন্দেহ ছিল। এতবার দেখেও যখন চিনতে পারলে না, ভাবলাম ভুলেই গেছ।

সামান্য ফিরে মিষ্টি তেরছা চোখে আর একবার দেখে নিল ওকে। পাতলা দুই ঠোঁট কৌতুকে টসটস করছে। তারপর সংকোচের কথাটা বেশ সহজেই বলে ফেলল।—তোমাকে চিনতে না পারলেও বানারজুলির বাপীকে ভোলা শক্ত।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাপীর মনে হল আট বছরের ফারাকের অর্ধেকটাই জুড়ে গেছে। তরল সুরে মিষ্টি আবার বলল, তবু কদিন দেখে তোমাকে চেনা আমার উচিত ছিল।

—কেন?

—তুমি ছাড়া এত কাণ্ড আর কে করবে। কাল তো আরো চেনা উচিত ছিল।

—কেন? 'দু' কান ভরে কেবল শুনতেই ইচ্ছে করছে বাপীর।

—পাড়ার ওই পাজীগুলো যখন তোমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তুমি দোতলার দিকে একবার ফিরে তাকিয়েছিলে। এমন তাকানো যেন অতটা দূর থেকেই একেবারে ভস্ম করে ফেলবে আমাকে।…আট বছর আগে বাবা বানারজুলি থেকে দিনাজপুরে বদলি হতে আমরা যখন বাংলো ছেড়ে জিপে করে যাচ্ছিলাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তখন ওই রকম করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলে তুমি। আমার ভয়ই করছিল, এই বুঝি চলন্ত জিপে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে একেবারে শেষ করে ছাড়বে।

বাপী সন্তর্পণে নিঃশ্বাস ফেলল একটা। এ কথার পর এতদিনের ব্যবধান আরো কিছুটা জুড়ে গেল। লঘু সুরে জিজ্ঞাসা করল, কালও ভয় করছিল নাকি?

হাসি মুখে মাথা দোলালো।—তা অবশ্য করছিল না।…এখন আর কোনো

ভয়-ভয়ের ধার ধারি না।

শেষেরটুকু যেন পুরনো দিনের এক দামাল ছেলেকে শোনানোর জন্যেই। বাপী সামনে হাঁটছে, কিন্তু ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। চেয়েই আছে। সেটুকু অনুভব করার ফলে আবার চোখোচোখি। মিষ্টির ভুরুর মাঝে পলকা ভাঁজ পড়ল একটু।—কি দেখছ?

…মিষ্টি।

হেসে উঠল।—জল দিয়ে গিলে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে কচ্ছে?

বাপীর হাসিতে খুশির বিড়ম্বনা। আট বছরের ফারাক এবারে জুড়েই গেল বুঝি। দিনমানের এই কলকাতা না হলে হাত বাড়িয়ে আগের মতো ওর একখানা হাতের ওপর দখল নেওয়াও একেবারে অসম্ভব কিছু হত না।

এবারে মিষ্টি গম্ভীর একটু। কিন্তু হাসির ছোঁয়া লেগেই আছে। বলল, এখানে আমি মালবিকা, এক মা আর দাদু শুধু মিষ্টি বলে ডাকে।

—দীপুদা?

—দাদা বিলেতে।

ভালো খবর। তাকে নিয়ে বাপীর কথা বাড়ানোর ইচ্ছে নেই। বলল, আমি মিষ্টি ছাড়া আর কিছু ডাকতে পারব না--

তার দিকে না ফিরে এবারে একটু নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল, তেমন ডাকা-ডাকির চান্স পাচ্ছ কোথায়…।

বাপী ভিতরে ভিতরে থমকালো। এই জবাব আশা করেনি। আড়-চোখে একবার দেখে নিয়ে হাল্কা গলায় জোর দিয়ে বলল, আমি কোনো চান্সের ওপর নির্ভর করি না, গত আট বছর ধরেই ডেকে চলেছি, কোনো একটা দিনও বাদ পড়েনি।

মিষ্টি ঘাড় ফিরিয়ে সোজা তাকালো এবার। মুখ আরো একটু গম্ভীর। কিন্তু ঠোঁটে হাসির আভাস। চোখের কোণেও। তবু বাপীর মনে হল এত-ক্ষণের সহজ স্পষ্টতা থেকে ওর যেন একটু তফাতে সরার চেষ্টা। মন্তব্যের সুরে মিষ্টি বলল, ভালো কথা নয়। সঙ্গে সঙ্গে এ-প্রসঙ্গ বাতিল।—কটা দোকান তো পার হয়ে গেল, চা খাওয়াবে কোথায়?

বাপী অপ্রস্তুত।—তাই তো, তোমাকে কাছে পেয়ে কেমন দিশেহারা দেখো…ভুলেই গেছলাম।

কাছে পাওয়ার কথাটা এমন নিঃসংকোচে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে যে মিষ্টি আবারও না তাকিয়ে পারল না। বাপী বুঝল। কিন্তু বুকের ভিতরটা

তার ভরাট এখন। মনে-মুখে লাগাম নেই। বরং ওই মুখের বিড়ম্বনাটুকু রসিয়ে দেখার মতো।

সামনের বড় রেস্তরাঁয় ঢুকে পড়ল। পাশে মিষ্টি। বাপীর বাদশাই মেজাজ। পর্দা ঠেলে একটা ক্যাবিনে বসল। মুখোমুখি মিষ্টি। বেয়ারা হাজির।

—চায়ের সঙ্গে আর কি খাবে বলো।

দু চোখ মুখের ওপর তুলে মিষ্টি কিছু. বুঝতে চেষ্টা করল।—সেই সকাল দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত অপেক্ষা করলে, সমস্ত দিনে তোমার খাওয়া হয়েছে কিছু?

কথাগুলো একটু দরদের স্পর্শের মতো কানের ভিতর দিয়ে বুকের দিকে এগোতে থাকল। বাপীর খুব ইচ্ছে হল মাথা নাড়ে, বলে হয়নি। বলা গেল না। এই দিনে কোনো মিথ্যের জায়গা নেই। সরস সত্যি জবাবই দিল।—ভাগ্যটাকে ভালো করার ঝোঁকে অন্য দিনের থেকে আজ বরং ভালো খাওয়া হয়েছে।

—তাহলে শুধু চা-ই হোক।

—তা কখনো হয়! বাপী সাগ্রহে টেবিলের মেনু কার্ড দেখতে লাগল। কিন্তু কি ছেড়ে কি আনতে বলবে ভেবে পেল না। আজ কোনো হিসেবের দিন নয়। মেনু কার্ডে যা আছে সব আনতে বললে কি হয়?

কিন্তু চায়ের সঙ্গে মিষ্টি শুধু একটা মাছের ফ্রাই ছাড়া আর কিছু নিতে রাজি হল না। অগত্যা দুজনেরই তাই। অর্ডার নিয়ে বেয়ারা চলে গেল। মিষ্টি বাপীর দিকেই চেয়ে আছে। ব্যস্ততা দেখে টিপটিপ হাসছে।

—ছেলেবেলায় তুমি কিন্তু বেশ খেতে ভালবাসতে।

মিষ্টি চট করে জবাব দিল, ছেলেবেলা আর কদিন থাকে।

বাপীর আবারও মনে হল, প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পর এই মেয়ে নিজেকে একটু গুটিয়ে নিচ্ছে। কথা কম বলছে। শুনছে বেশি। দেখছে আরো বেশি। শোনা বা দেখাটা নিরাসক্ত নয় অবশ্য। দেখে শুনে বা বুঝে পা ফেলার মতো শুধু নিজের সম্পর্কেই সতর্ক একটু। অস্বাভাবিক নয়। বাপীর ছেলেবেলাটা এই মেয়ের কাছে এক বিষম স্মৃতি বটেই। তাই ছেলেবেলা নাকচ করে ওকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা।

কিন্তু বাপীর কাছে তার ছেলেবেলার জোরটাই সব। সেই জোরেই এ মেয়ের আজ দু-দুটো ক্লাস কামাই। সেই জোরেই আট বছর বাদে মুখোমুখি

হবার সঙ্গে সঙ্গে কালো চোখের গভীরে আগ্রহের বন্যা। নিজেকে নিয়ে ও এখন একটু হিসেবী হয়ে উঠছে মনে হতে বাপীর মজাই লাগছে।

বয় বড় ডিশে দুটো ফিশ ফ্রাই এনে দুজনের সামনে রাখল। আনুষঙ্গিক টুকিটাকি আরো কিছু সাজিয়ে দিয়ে গেল। অভ্যস্ত হাতে মিষ্টি কাঁটা-চামচ তুলে নিতে সপ্রতিভ মুখে বাপী বলল, আমি এখনো জংলিই থেকে গেছি—এ দুটো ঠিক চলবে না।

জবাবে অতি-আধুনিকতার বক্রাভাস কিছু দেখা গেল না। বরং শুনে এবং বুঝে যা করল সেটুকু আরো মিষ্টি। নিজের কাঁটা-চামচ ডিশের একপাশে রেখে বেল বাজালো। বয় আসতে বলল, ওয়াটার বোউল—

হাতের চায়ের পট আর পেয়ালা সমেত ট্রে-টা টেবিলে রেখে বয় গেল আর ফিরল। এক ট্রেতে মাঝারি আকারের দুটো সাদা বাটি। তাতে হাত ধোয়ার গরম জল।

আট বছর বাদে দাক্ষিণ্যের ভরা ডালিসুদ্ধ খসে পড়ার মতোই দিন এটা। বাপীর দুচোখে লোভ চিকিয়ে উঠছে কিনা জানে না। উঠলেও এখন আর বাপী একে ঠিক লোভ বলতে রাজি নয়। সামনে যে বসে তাকে আর নিছক লোভের দোসর ভাবতে চায় না। আরো কিছু। ঢের বেশি কিছু।

মিষ্টি টান হয়ে বসে আছে এখন। পরিপুষ্ট দু হাতের কনুই টেবিলের ওপর। দু হাতের দু জোড়া আঙুলের মাথায় ফ্রাইটা ঝুলছে। অল্প অল্প দাঁতে কাটছে আর টুকটাক এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করছে। বাপী জবাব দেবে, না এই সহজ সুঠাম ভঙ্গীটুকু দেখবে?

মিষ্টি পিসীর কথা জিজ্ঞাসা করল। তারপর বাবার কথা। কেউ নেই শুনে চাউনি উতলা একটু।—তোমার আর কে থাকল তাহলে?

কে থাকল বলায় একটা অসম্য লোভ ঠেলে তল করতে হল। কিন্তু চোখে গোপন থাকল না বোধ হয়। কারণ এই চোখে চোখ পড়তে মিষ্টির দুই হাতের আঙুলে ঝোলানো ফ্রাইয়ে বড় কামড় পড়ল একটা। চকচকে দাঁতের সারি দেখা গেল। দৃষ্টিও প্লেটের দিকে নেমে এলো।

একটু পরেই ঠোঁটের ফাঁকে আবার চাপা হাসি।—তোমাদের সেই বনমায়ার খবর কি?

প্রসঙ্গান্তর সরস বটে।—গত চার-পাঁচ বছরের খবর রাখি না। তার আগে পর্যন্ত বছরে একবার করে সাধ্বী মেয়ের মতো বনমায়া সেই একই পুরুষ-হাতির সঙ্গে শিকল ছিঁড়ে পালিয়েছে আর ওর সময়মতো ফিরেও এসেছে। এখনো

সেই রকমই চলছে মনে হয়।

মিষ্টির মুখে লালের ছোপ একপ্রস্থ। সেধে বিড়ম্বনা ডেকে আনা। তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করল, আর তোমার জঙ্গল-গুরু সেই আবু রব্বানী?

বাপী হাসছে মিটিমিটি।—বীটম্যান হবার পর সও আর এক বীটম্যানের বউয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখেছিলাম। সেই লোকটা মদে বেহুঁশ হয়ে থাকে, আর হুঁশ ফিরলে বউ ঠেঙায়। আবু তার লিভার পচে মরার অপেক্ষায় ছিল, এতদিনে বউটাকে নিজের ঘরে এনে তুলতে পেরেছে বোধ হয়।

—ি বিচ্ছিরি। মিষ্টির মুখ আরো লাল। ফ্রাইয়ের শেষের সামান্যটুকু ডিশে ফেলে রুমালে হাত মুছে চায়ের পটসুদ্ধ ট্রে-টা কাছে টেনে নিল।

বাপীর আগেই খাওয়া হাত-মোছা শেষ। টেবিল থেকে মিষ্টির মোটা বইটা হাতে তুলে নিল। খুলে দেখল, ইংরেজি ইতিহাস বই। আর একটু কাছে তুলে সন্তর্পণে নিঃশ্বাস নিল। প্রত্যাশিত একটু সুবাস বইটার মধ্যেও ছড়িয়ে থাকতে পারে।

বইটা আবার যথাস্থানে রেখে জিগ্যেস করল, হিস্ট্রি অনার্স পড়ছ?

চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে মিষ্টি মাথা নেড়ে সায় দিল।

—থার্ড ইয়ার তো?

—তুমি জানলে কি করে?

—আমার হিসেব আছে। ম্যাট্রিকে তুমি ইতিহাস আর সংস্কৃতয় লেটার পেয়েছিলে, আই-এতে শুধু ইতিহাসে। হিংসেয় আমার বুক চড়চড় করেছিল। এখন আনন্দ হচ্ছে।

মিষ্টির দু চোখ এবার যথার্থ বিস্ফারিত।

খুশি মেজাজে রহস্যটা এবারে নিজেই ফাঁস করল বাপী।—তোমার পাশের দু বছরের দুটো গাবদা গেজেট আমাকে পড়তে হয়েছে—কলকাতার সব কটা মালবিকা নন্দীর থেকে ঠিক তোমাকে বেছে নিয়েছি।

এই ছেলের অসাধ্য কি, মিষ্টি যেন নতুন করে আবার তাই দেখছে। চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিল। নিজের পেয়ালা কাছে টেনে নিল। এখন গম্ভীর-গম্ভীর। কেন বাপী আঁচ করতে পারে। আজও ও কত আগ্রহ আর কত কৌতূহল নিয়ে বসে আছে সেটা বড় বেশি স্পষ্ট।

—গেজেট পড়ে তোমার হিংসে হত কেন? নিজে ওদিক মাড়াওনি?

আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে বাপীর নিজেরও বলার তাগিদ। জানানোর তাগিদ ছেলেবেলার মতো প্রবৃত্তিসর্বস্ব হয়েই গত আটটা বছর কাটিয়ে দেয়নি।

নিজের বিদ্যে-বুদ্ধির বড়াই কখনো করেনি, আজও করার ইচ্ছে নেই। কিন্তু এই একজনেরই যেন ওর সবটুকু জানা দরকার, চেনা দরকার, বোঝা দরকার।

তাই বরাতজোরে নিজের ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করার কথাটা এসেই গেল। পাশের পরে জঙ্গলের ছোট কেরানীর চাকরি না নেওয়ার জন্য বাবার সঙ্গে মন-কষাকষি আর বাড়ি ছেড়ে জলপাইগুড়ি পালানোর কথাও। তারপর চার-চারটে বছর টিউশনের জোরে আর কপালজোরে আই. এসসি আর ডিস্টিংশনে বি. এসসি উতরে যাওয়ার বৃত্তান্ত।

হালকা চালেই বলেছে। প্রাণান্তকর অনিশ্চয়তা বা অনটনের দিকটাও ফাঁপিয়ে তোলেনি। মিষ্টির অপলক দু চোখ ওর মুখের ওপর। যেটুকু বোঝার বুঝেছে হয়তো।

—তারপর কলকাতায় কি, চাকরি না এম. এসসি ?

বাপী হাসতে লাগল।—চাকরি। এখানকার এক বন্ধুর সাহায্যে একটা লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরি যোগাড় করে চলে এসেছিলাম। দেড় মাসের ওপর হয়ে গেল সেটাও গেছে—

পরের প্রশ্নটা যাতে করে সেই আশা নিয়েই বাপী ওরকম হাসছিল।

—চাকরি গেল কেন ?

—যুদ্ধের আপিসের টেম্পোরারি চাকরি…তবে আমার গেল অন্য কারণে। হাসিটুকু এখন শুধু চোখে লেগে আছে বাপীর।—সেখানকার বড়বাবুর এক মাত্র মেয়েকে বিয়ে করে গলায় ঝোলাতে রাজি হলে চাকরিতে প্রমোশন হত আর তাদের বাড়িটাও দখলে আসত। রাজি হলাম না বলে সেই মেয়ে যেমন মনমরা তার বাপের তেমনি রাগ। এই দুইয়ের ধাক্কায় চাকরি খুইয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলাম। -

যেভাবে বলল, মিষ্টিরও হেসে ফেলার কথা। কিন্তু মুখে হাসির লেশমাত্র নেই। শোনার পর চায়ে মনোযোগ।

মিনিট পনের বাদে পায়ে পায়ে বড় ময়দানের দিকে আসছিল দুজনে। ময়দানের অন্য প্রান্তে সেই সভা। গান্ধী-প্রয়াণের শোকসভা। আটচল্লিশের ফেব্রুয়ারির দশ কি,এগারো তারিখ এটা। এরই মধ্যে বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। দুজনের কারো সঙ্গেই গরম কিছু নেই। কিন্তু বাপী অন্তত ঠাণ্ডা-গরম কিছুই টের পাচ্ছে না।

এবারে সামনের রাস্তার দিকে এসে মিষ্টি দাঁড়িয়ে গেল। স্বাভাবিক সুরেই বলল, আর দেরি করলে মায়ের বকুনি খেতে হবে।

বাপীও মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ যাবৎ কেন যেন চিনচিন করছে ভিতরটা। সেটা আরো বাড়ল।—আবার কবে দেখা হবে?

—অনার্স ক্লাস তো বেশি কামাই করা চলে না, ওদিকে ক্লাস শেষ হবার আগেই দাদুর গাড়ি এসে হাজির হয়—

—আমি জিজ্ঞেস করছি, আবার কবে দেখা হবে?

মিষ্টির দু চোখ এবারে ওর মুখের ওপর থমকে রইল।—তুমি থাকো কোথায়?

শিরায় রক্তের তাপ বাড়ছে বাপীর। গড়গড় করে বলে গেল, ভবানীপুরের টালি কোয়ারটার্স-এ। আসলে সেটা একটা টালির বস্তি। পঁচিশ ঘর বাসিন্দা থাকে। চাকরি যাবার পর সে অফিসের পিওন রতন বনিক আর তার বউ কমলা বনিক সেখানে তাদের একটা খুপরি ঘরে আমাকে আদর করে রেখেছে।···শুনে আরো ঘাবড়ে গেলে বোধ হয়?

হকচকিয়ে গেল যে তাতে কোনো ভুল নেই। বাপীর দু চোখ তার মুখের ওপর এঁটে বসল আরো।—শোনো মিষ্টি, কেরানীগিরির চাকরির আশায় আমি কলকাতায় ছুটে আসিনি—এসেছি একদিন না একদিন তোমার দেখা পাব বলে। আজই আমি খুব ভালো করে জেনেছি, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক হওয়াটা যেমন আমার অদৃষ্ট নয়, রতন বনিকের বস্তিতে থাকাটাও তেমনি আর বেশিদিনের সত্যি নয়। সব বদলাবে, একেবারে অন্য রকম হয়ে যাবে—তুমি চাইলেই হবে।

মিষ্টি শুনছে। চেয়েও আছে। ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসি ফোটানোর চেষ্টা।—ভালো কথা তো, আমি চাইব না কেন···

—তাহলে কবে দেখা হবে, কাল বিকেলে তোমাদের বাড়ি যাব?

মিষ্টি যেন নিজের সঙ্গেই যুঝছে—পাড়ার সেই ছেলের দঙ্গল আছে না? বাড়িতে মা আছে না? মায়ের আজকালকার মেজাজ জানো?

বাপী কানেও নিতে চাইল না।—পাড়ার ছেলেদের আমি পরোয়া করি না। মায়ের ভাবনা তোমার। যাব?

মিষ্টির ঠোঁটের ফাঁকের আয়াসের হাসিটুকু মিলিয়ে যেতে লাগল। আয়ত কালো দু চোখ বাপীর মুখের ওপর স্থির হয়ে বসতে লাগল। দেখছে। দেখছেই। অপলক।

—দেখা করতেই হবে?

—দেখা করতেই হবে।

—তাহলে এসো।...তবে বাড়িতে নয়।

—কোথায়?

—লেক চেনো?

মাথা নাড়ল। চেনে।

একটা নিশানা বলে দিল।—কাল বিকেল সাড়ে চারটেয় এসো। আমি বাসে চলে যাচ্ছি, সঙ্গে আসার দরকার নেই।

উল্টো দিক থেকে বাস আসছে একটা। হনহন করে রাস্তা পার হয়ে গেল। বাস এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে উঠে পড়ল।

বাসটা ছেড়ে যাবার পরেও বাপী নিশ্চল দাঁড়িয়ে। অনেকক্ষণের একটা দমবন্ধ নিঃশ্বাস আস্তে আস্তে মুক্তি পেয়ে বাঁচছে।

রাতের খাবার কে ঢাকা দিয়ে রেখে গেছল বাপী জানে না। সকালে আজও চা-রুটি নিয়ে রতন বনিক ঢুকল। কমলা নয়। অর্থাৎ কমলা বনিকের রাগ হোক বা আর কিছু হোক এই দুদিনেও সেটা তেমনি আছে।

সে না আসায় গতকালের থেকে আজ আরো বেশি স্বস্তি।...কমলা বনিকের সামনে সেদিনের সেই হিংস্রলোলুপ মুহূর্তের ছায়াসুদ্ধ মুছে দিতে পারলে বাপী তরফদারের আত্মশুদ্ধি হত। প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও কমলার পরের আচরণ ভোলেনি। আজকের এই দিনে বাপী সেই স্মৃতি থেকেও নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে আসতে চায়।

রতন বলল, আজ আবার একটু ফ্যাসাদ হয়েছে বিপুলবাবু, নাইট ডিউটি পড়েছে। ওই দেমাকীকে বুঝিয়ে বললাম, আজকের রাতে অন্তত আপনার খাবারটা যেন দিয়ে যায়! কিছু বলল না...দেবে নিশ্চয়, রাগ করুক আর যাই করুক, আপনার ওপর দরদ তো একটু আছেই—

বাপীর মুখে গরম চায়ের ছেঁকা লেগে গেল। তাড়াতাড়ি বাধা দিল, না—না, তার কিছু দরকার নেই, রাতে আমি খেয়ে আসব।

—তা কি হয়!

বাপী সত্যি বিরক্ত।—কথা শোনো, রাতে আমার এক জায়গায় খাবার কথা আছে, আমি নিজেই তোমাকে বলতাম—ওকে বারণ করে দাও আজ খাবার রাখার দরকার নেই।

—তাই বলুন, রতন নিশ্চিন্ত, আমি ভাবলাম আপনিও বুঝি আবার রাগটাগ করলেন।

বাপী মিথ্যে বলেনি খুব। সকালে ঘুম ভাঙতেই ভেবে রেখেছে বিকেলের কথাবার্তার পর সন্ধ্যায় মিষ্টিকে কোনো ভালো জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাতের খাওয়া সারবে। মিষ্টির কোনো ওজর আপত্তি শুনবে না।

বেলা বারোটা নাগাত একেবারে তৈরি হয়ে বেরুলো। আগে ব্যাঙ্ক থেকে কিছু টাকা তুলতে হবে। এ মাসের খরচটা হিসেবের মধ্যে থাকবে না। সঙ্গে কিছু বেশি থাকা ভালো। তারপর দুপুরে কোথাও যা হোক কিছু খেয়ে নেওয়া। তারপরের সময়টুকু কি করে কাটাবে সে দেখা যাবে।

ঘরের বাইরে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ও-ঘরের দাওয়ার সামনে কাঠের থামে ঠেস দিয়ে কমলা দাঁড়িয়ে। একঝাঁক খোলা শুকনো চুল পিঠে ছড়ানো। চান করেনি এখনো।

ওকে দেখে একটুও নড়ল না। চোখ বেঁকিয়ে তাকালো।

বাপী তাড়াতাড়ি দাওয়া থেকে উঠোনে নামল। তারপরেই সহজ হওয়ার তাড়না একটু। না এগিয়ে কমলার দিকে ফিরল।—রাতে খাবার রাখার দরকার নেই, রতন বলেছে তো?

কমলা জবাব দিল না। মাথাও নাড়ল না। সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। সেই রকমই চেয়ে রইল।

এবারে বাপীর দ্রুত প্রস্থান। ওই চাউনি দিয়েই কমলা যেন সারা গায়ে জলবিছুটি ছড়িয়ে দিল খানিকটা। আর বলতে চাইল, যত ভালো মুখ করেই থাকো, তোমার ভেতর দেখা চেনা আর বোঝা আমার হয়ে গেছে।

বাইরে এসে বাপী সেইদিনটার জন্য নিজেকেই চাবকাতে চাইল আর এক প্রস্থ।

অনেক ধৈর্য আর অনেক প্রতীক্ষার সেই বিকেল। ঘড়িতে চারটা পঁচিশ। দূরে দাঁড়িয়ে বাপী দেখল যেখানে থাকার কথা, মন্থর পায়ে মিষ্টি সেদিকে চলেছে। বাপী আরো বিশ মিনিট আগে থেকে একটু আড়াল নিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে।

দু'চোখে খুশি উপচে উঠল। ডাকল না। নিজেও তক্ষুনি এগিয়ে এলো না। এই দেখাটুকু বাড়তি পাওনার মতো। আজ ফিকে বাসন্তী রঙের শাড়ি পরেছে। মিষ্টি তো জানেও না এই রংটা বাপীর কত পছন্দ।

মিষ্টি বেঞ্চিতে বসল না। পায়ে পায়ে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। পিছন ফিরে একবার চারদিক দেখে নিয়ে আবার জল দেখতে লাগল।

বাপী এগিয়ে এলো। হাসিতে খুশিতে উদ্ভাসিত মুখ। মিষ্টি ঘুরে দাঁড়াল।

তার ঠোঁটে বা চোখে হাসির ছিটেফোঁটাও নেই। কাল বাসে ওঠার আগে যেমন দেখেছিল তেমনি চাউনি। তারপর সামনের রাস্তাটার দৃষ্টি ফেরালো একবার।

বাপী অবাক একটু।—কি?

মিষ্টি জবাব দিল না। তেমনি চেয়ে রইল। পরক্ষণে দু'চোখ আবার ওই রাস্তার দিকে। কি ব্যাপার ভেবে না পেয়ে বাপীও সেদিকে ঘাড় ফেরাতেই সমস্ত শরীরের প্রচণ্ড ঝাঁকুনি একটা। মাথার মধ্যিখানে আচমকা একটা মুগুরের ঘা পড়েছে।

···হনহন করে এদিকে আসছে একজন। এসেই গেছে। চেনা মুখ। পরনে ট্রাউজার আর সিল্কের শার্ট। ফর্সা রং। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। মিষ্টিদের উল্টো দিকের বাড়ির দোতলার সেই একজন। পাড়ার ছেলেদের অসিতদা।

বিমূঢ় মুখে মিষ্টির দিকে ফিরল বাপী। পরমুহূর্তে শরীরের সমস্ত রক্ত মাথার দিকে ধাওয়া করল। মিষ্টির ঠোঁটের ফাঁকে এখন একটু হাসির আভাস।

সোনালি চশমা হাজির।—এই যে ব্রাদার, মালবিকার কাছে তোমার ছেলেবেলার কিছু কথা আর কালকের অ্যাডভেঞ্চারের কথা শুনলাম। সেদিন গলাধ কা খেয়েও শিক্ষা হল না, আজ যে ভায়া আরো কপাল মন্দ।

মুখের কথা শেষ হবার আগেই কোথা থেকে আরো তিন-তিনটে ছেলে ছুটে এলো। পাড়ার সেই ছেলেরাই। এসেই একজন জামার বুকের কাছটা মুঠো করে ধরল।

—এই যে চাঁদ, আজ তোমাকে কোন বাবা রক্ষা করবে?

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে উঠল, না অসিতদা, আজ আর তোমার কোনো কথা শুনছি না চাঁদুকে তুমি আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, আমরা ওদিকে নিয়ে গিয়ে যা বোঝাবার বেশ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু পলকের মধ্যে যা ঘটে গেল তার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। যে ছেলেটা জামা চেপে ধরেছিল, মিষ্টির দু হাতের আচমকা ধাক্কায় তার হুমড়ি খেয়ে পড়ার দাখিল। মিষ্টির মুখ টকটকে লাল, ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত গলার স্বর।—এ কি? এদের কে আসতে বলেছে? ও যাতে বুঝতে পারে সেইজন্য আমি তোমাকে আসতে বলেছিলাম—তুমি এদের এনেছ কেন?

সোনালি চশমার ভেবাচাকা মুখ। ছেলে তিনটেরও। ওই তিনজনের

দিকে ঘুরে মিষ্টি আবার ফুঁসে উঠল, যাও বলছি এখান থেকে—চলে যাও।

ছেলে তিনটে গুটিগুটি সরে দাঁড়াল একটু। রমণীর মতিগতির কূলকিনারা পাচ্ছে না তারা।

কিন্তু বাপীর পৃথিবী উল্টে গেছে। মাথায় সেই পুরনো আগুন দ্বিগুণ জ্বলে উঠেছে। বুকের পাতালের শূন্য গুহায় সেই জানোয়ারের দাপাদাপি। সবার আগে ওই মেয়ের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্রুর অভিলাষ।

বাপীর গলার স্বর চড়া নয়, কিন্তু সকলের শোনার মতো। মিষ্টিকে বলল, আর বোঝানোর দরকার নেই। আমি বুঝতে পেরেছি।...তোমার এই বীরপুরুষেরা যদি মায়ের ছেলে হয়, একে একে আসতে বলো, এই চারজনকেই লেকের জল খাইয়ে আনতে পারি কিনা দাঁড়িয়ে দেখো।

—কি! সোনালি চশমা রুখে এলো।

চকিতে মিষ্টি এগিয়ে এসে বাধা দিল আবার।—থাক্, হয়েছে। বাপীর দিকে ফিরল। গলার স্বর তপ্ত।—বুঝে থাকলে চলে যাও। আর এসো না।

রাত অনেক। সেদিনের পুলিশের লাঠির খোঁচা মনে ছিল। এত হেঁটেও পা দুটোকে অবশ করা গেল না। বাপী তরফদার ঘরের দিকে চলেছে এখন। মুখে আবার আট বছর আগের সেই রক্তের স্বাদ। ভিতরের জানোয়ারটা অবিরাম ফুঁসছে। গজরাচ্ছে।

টালি এলাকার নিঝুম উঠোন পেরিয়ে নিঃশব্দে দাওয়ায় উঠে এলো। খুপরি ঘরের দরজা ঠেলতে ক্যাঁচ করে সেই পুরনো শব্দ একটু। আজ খাবার ঢাকা নেই, তাই ডীম করা হারিকেনও নেই। জামাটা খুলে ঘুটঘুটি অন্ধকারে দড়ির ওপর ফেলল। তারপর শরীরটা খাটিয়ার ওপর আছড়ে পড়তে চাইল।

কিন্তু এ কি! এ কি! এ কি!

মাথায় বিদ্যুৎতরঙ্গ। ভালো করে বোঝার আগেই অন্ধকারে ওই শয্যা থেকে দুটো হাত অমোঘ নিবিড় বেষ্টনে তাকে বুকের ওপর টেনে নিল। রমণীর হাত। রমণীর বুক। সর্বাঙ্গে তপ্ত স্পর্শের তড়িৎপ্রবাহ। শুকনো দুটো ঠোঁট বিস্মৃতির উষ্ণ ঘন অধরের গ্রাসে।

॥ আট ॥

রাতের অন্ধকার ফুঁড়ে ট্রেন ছুটেছে। কামরার বেশির ভাগ লোক ঘুমোচ্ছে। জায়গা না পেয়ে কেউ কেউ বসেই ঝিমুচ্ছে। বাপীর কারো দিকে চোখ নেই। দু' চোখ জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে। ভিতরে আরো বেশি দমবন্ধ-করা অন্ধকার।

মা বলে কি কেউ কোথাও আছে? নিজেরই বিষে ভিতর-বার কালি হয়ে গেলেও যার কাছে ছুটে যাওয়া যায়, যার বুকে মুখ গোঁজা যায়, মুখ লুকনো যায়? বুকের জমাট-বাঁধা কান্নার স্তূপ যার স্পর্শে গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যায়? বাপী জানে না। মা কাকে বলে জানে না। কিন্তু মায়ের মতো করে কেউ ডাকছে ওকে। বানারজুলি ডাকছে। বানারজুলির জঙ্গল হাতছানি দিচ্ছে। এত বড় পৃথিবীতে শুধু সেখানে একটু আশ্রয়। সেখানে একটু মুখ লুকানোর জায়গা।

বাপী তরফদার সেইখানে চলেছে।

সেই রাতের পর আরো দুটো রাত রতন বনিকের খুপরি ঘরে বিনিদ্র কেটেছে। নাইট ডিউটি দিয়ে রতন বনিক সকাল সাতটার মধ্যে খুশি মেজাজে ঘরে ফিরেছিল। সপ্তাহে একদিনের নাইট ডিউটিটা ওর চক্ষুশূল। বাকি ছ'টা দিন নিশ্চিন্ত। কমলা নয়, ও-ই চায়ের গেলাস হাতে করে ঘরে ঢুকেছে। জিগ্যেস করেছে, রাতে খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো হয়েছিল তো?

নিঃশংক, নিশ্চিন্ত মানুষ। কথাগুলো তাই বিবেকের পিঠে চাবুক হয়ে নেমে এসেছিল। তার থেকে যদি বাপীর মুখের দিকে চেয়ে এই সাদাসিধে ভালোমানুষটার চাউনি ঘোরালো হয়ে উঠত, তাহলেও কিছু সান্ত্বনা থাকত। মুখের দিকে না চেয়ে বাপী বিড়বিড় করে জবাব দিয়েছে, রাতে খাব না বলেই তো রেখেছিলাম—

...সকাল দশটার মধ্যে রাস্তায় নেমে এসেছিল। কিন্তু যাবে কোথায়? দুর্ভর দিন কাটবে কেমন করে? সঙ্গোপনের পশুটা প্রাণভয়ে গুহা ছেড়ে উধাও। তখন তার অস্তিত্বও নেই।

কমলা বনিক কোনদিন তার শিকার ছিল না। সেই রাতেও না। দেহ যারই হোক, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে শেকল-ছেঁড়া ক্ষিপ্ত আহত জানোয়ার অপটু উল্লাসে যাকে নিয়ে বিস্মৃতির অতলে ডুবেছিল, সে আর কেউ। আর একজন। তারপর চেতনার কশাঘাতে জেগে ওঠা সেই রূঢ় বাস্তব। বাপী

তরফদারের যন্ত্রণা সম্বল।

বিকেলের দিকে কে যেন লেকে টেনে এনেছে তাকে। আগের দিনের সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতর ওপর হিংস্র নখের আঁচড় পড়েছে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছে। মাথায় আগুন জলেছে।

বাপী তরফদার এরই মধ্যে সচকিত। একটা অস্বস্তির ছায়া পড়ছে।··· জানোয়ারটা ওঁত পেতে ছিল কোথায়। সুযোগ আর সময়ের প্রতীক্ষায় ছিল। গুটি গুটি এবারে তার আশ্রয়ের দিকে এগোচ্ছে। বিবেকের কশাঘাতে বাপী তরফদার ওটাকে ধরাশায়ী করতে চেয়েছে, নির্মূল করতে চেয়েছে। কিন্তু ওই শয়তান তার সময় জানে। সুযোগ জানে। পায়ে করে তাকে থেঁতলে থেঁতলে বাপী তরফদার হনহন করে লেক থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবু তার পায়ের শব্দ বাড়ছেই, বাড়ছেই। যত বাড়ছে, নিজের ওপর বাপীর ততো দখল কমছে।

···রাত সাড়ে আটটায় কে তাকে ঘরে টেনে এনেছে। হাতের ধাক্কায় নড়বড়ে দরজা দুটো আর্তনাদ করে উঠেছে। এখন ওর কাছে পাশের ঘরের ওই একজন ক্ষমার পাত্রী নয়, দয়ার পাত্রী নয়। কোনো মেয়েই নয়। আগের রাতের তিমির তৃষ্ণার অনুভূতি হাড়ে-পাঁজরে যন্ত্রণার বাষ্প ছড়াচ্ছে।

···ছোট লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকেছিল রতন বনিক। খোশ মেজাজ। টেনে টেনে বলেছিল, ক'দিনের মধ্যে আজই একটু তাড়াতাড়ি ফিরলেন দেখছি।

সকালে যে মানুষটার কথায় বিবেকের চাবুক পড়েছিল পিঠে, এখন তাকে ঠেলে সরানোর তাগিদ।—খেয়ে এসেছি। খাবার আনার দরকার নেই।

—কেন? আমার বউটার ওপর আপনি রেগেই গেলেন নাকি?

অসহিষ্ণু ঝাঁঝে বাপী বলেছে, কি বাজে বকছ!

—ঠিক আছে, আপনার যেমন সুবিধে।

লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ দুলছিল রতন বনিক। মুখের খুশি কাঁচা-পাকা দাড়ি বেয়ে চুয়ে পড়ছিল। মাছের মতো চোখ। চার হাত দূর থেকেও চেনা গন্ধ বাপীর নাকে আসছিল। মাত্রার ঠিক ছিল না। বোঝা যায়। কিন্তু ওর ঢলো-ঢলো কথা শুনে বিরক্তির বদলে বাপীর দু' কান সজাগ।

—বউটার মতিগতি আজ বদলেছে বিপুলবাবু—বুঝলেন। বোতল নিয়ে আজ আর এ-ঘরে আসতে হল না, ঘরে বসেই খেতে দিলে। আর তোয়াজ করে সেই সঙ্গে এটা-সেটা ভেজে খাওয়ালে। ফুর্তির চোটে একটা গোটা বোতল সাবড়ে দিলাম দেখেও রাগ করল না। শব্দ করে রতন বিশাল হাই

তুলল একটা।—আপনার খাওয়ার পাট নেই যখন, যাই শুয়ে পড়িগে—

ঢুলতে ঢুলতে চলে গেল। লণ্ঠনটা রেখে যেতেও ভুলেছে।

দুর্বার লোভে দু' চোখ কতখানি চকচক করে উঠেছিল, বাপী খবর রাখে না। কিন্তু অনুমান করতে পারে। রতনের কথাগুলো শেষ হতে না হতে বুঝেছিল, এই রাতেও কমলা আসবে।

…এসেছিল।

তার পরের রাতেও।

একই আধারে ওই অবুঝ লুব্ধ জানোয়ার আর মানুষ পাশাপাশি বাস করে কেমন করে? নগ্ন উল্লাসে জানোয়ারটা যখন নখ-দাঁত বার করে, মানুষটার তখন অস্তিত্ব নেই। আবার লজ্জায় ক্ষোভে নিদারুণ ধিক্কারে মানুষ যখন যন্ত্রণার মাটিতে মুখ ঘষে ঘষে নিজেকেই রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে, ওই শয়তান তখন নিখোঁজ। বাপী তরফদার এমন দুটো দুর্বার সত্তা আর কত বইতে পারে?

রাতে ঘুম হয়নি। সকালের মধ্যে মনস্থির। ভালো করে ভোর হবার আগে সকলের অগোচরে এখান থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়ার দুর্বল ইচ্ছেটা বাতিল করেছে। অন্য সব বাসিন্দাদের মনে খট্‌কা লাগতে পারে, সংশয়ের আঁচড় পড়তে পারে। রতন বনিকের সেটা প্রাপ্য নয়।

আজও সকালে রতনই চা-রুটি নিয়ে হাজির। বাপী ওইটুকু ঘরেই পায়চারি করছিল। আসা মাত্র বলল, আমি আজ চলে যাচ্ছি রতন।

শুনে রতন বনিক একেবারে হাঁ। যাবার কথা বিপুলবাবু মাঝেসাঝে বলে বটে, কিন্তু কাজকর্মের সুরাহা হবার আগে সত্যি যাবে ভাবেনি। তাই ধাক্কাই খেল।—আজই যাবেন!… আমাদের ওপর রাগ করেছেন?

সামান্য কথায়ও বুকের তলায় মোচড় পড়ে। বাপী মাথা নাড়ল। বলল, তোমাদের ঋণের কথা ভুলব না, তোমার মতো ভালোমানুষও আমি কম দেখেছি রতন।

রতন বনিক নিশ্চিন্ত, খুশিও।—কি যে বলেন, আপনি ছিলেন, আমাদের কত ভাগ্যি।…আজই যাবেন কেন, কাজটাজের কিছু খবর পেয়েছেন?

—দেশে যাব, সেখানে একটু তদ্বির-তদারক করতে পারলে চা-বাগানের কাজ কিছু পেয়ে যেতে পারি। বাপী ভেবে বলেনি, কিছু বলা দরকার তাই বলেছে। আসলে বাপী কোথায় যাবে সে ফয়সালাও নিজের সঙ্গে তখন পর্যন্ত হয়নি। এখান থেকে নড়বে এটুকুই স্থির।

রতন বনিক চেয়ে রইল একটু। বলল, কাজ পেতে পারেন না—পেয়ে যাবেন। ক'দিন আগে যা দেখেছিলাম, তার থেকে আপনার কপালের রং অনেকটা ভালো হয়ে গেছে। আমার কথা মিলিয়ে নেবেন, দিন ফিরলে ভুলবেন না যেন। বউটাকে বলি, ভালো কিছু রাঁধুক আজ, আমি না-হয় এ-বেলা হাফ-ডে ছুটি নিয়ে ও-বেলা আপিস যাব।

বাপী ব্যস্ত হয়ে উঠল, না-না, তার কিছু দরকার নেই, আমি ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়ব, সকালের দিকে গাড়ি। মুখে হাসি টানার চেষ্টা, খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন, কম খেলাম নাকি এ পর্যন্ত!

—তাহলে ভালো করে একটু জলটল খেয়ে নিন, আমি চট্ করে দোকান থেকে ঘুরে আসছি।

দু' ঘণ্টার আগেই বাপী বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। চলে যাচ্ছে শুনে এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকে দেখা করে গেল। রতন তাদের বলেই ফেলেছে, চা-বাগানের মস্ত একটা কাজের খবর পেয়ে বিপুলবাবু চলে যাচ্ছেন।

রতন ট্যাক্সি ডাকতে গেল। খুপরি ঘরে বাপী একা নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে।...ও-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একবার কি বলে আসবে, আমি চলে যাচ্ছি?

কমলা নিজেই এলো। দরজা দুটো খোলা। আজ এক পাটও বন্ধ করল না। বাইরে থেকে সরাসরি চোখে না পড়ে সেই ভাবে দেয়ালের দিক ঘেঁষে দাঁড়াল।

কিন্তু কমলার এই মুখ দেখবে বাপীর কল্পনার মধ্যেও ছিল না। গত তিন রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে লোলুপ সান্নিধ্যের উদ্‌ভ্রান্ত মুহূর্তেও তার মুখ দেখতে পায়নি। নিঃশব্দে এসেছে। নিঃশব্দে চলে গেছে। একটি কথাও বলেনি। আজ ওকে দেখে বাপীরই বিস্ময়। কমলার এমন ঢলঢলে অথচ প্রশান্ত কমনীয় শামলা মুখ আর কি কখনো দেখেছে? সংকোচের লেশ নেই, অনুতাপের চিহ্ন নেই, বিবেকের তাড়নার এতটুকু ছায়ামাত্র নেই। মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু, বলল, তুমি চলে যাবে জানতাম, আজই যাবে ভাবিনি ...ভালই হল।

বাপীর খুব ইচ্ছে জিগ্যেস করে, কেন ভালো হল। মুখে কথা সরল না। নির্বাক দু' চোখ ওর মুখের ওপর।

কমলাও দেখছে। বলল, এর পর তুমি কেবল আমাকে ঘেন্নাই করবে

জানি। কিন্তু আমি হয়তো তোমাকে পুজো করেই যাব, আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব যেন তোমাকে ভালো রাখে।

ভিতরে ভিতরে বাপী হঠাৎ বড় রকমের নাড়াচাড়া খেল একটা।...ওর জন্যে, ওর ভালোর জন্যে দু' চোখে এত মায়া বাপী আর কার দেখেছে? মনে পড়ছে কার দেখেছে। বানারজুলিয় পিসিমার দেখেছে। আর সেই মুহূর্তে সত্তার নাড়িতে টান পড়েছে একটা। পিসিমা নেই। বানারজুলি আছে। মা কাকে বলে বাপী জানে না। মায়ের মতো করে বানারজুলি তাকে ডাকছে। অনেক ডেকেছে। বাপী শোনেনি। এখন আবার ডাকছে।

বাপী চলেছে।

জলপাইগুড়িতে এবারে আর দু' ঘণ্টাও ভালো লাগল না। যাঁর টানে এসেছিল, তিনি নেই। ড্রইং-মাস্টার ললিত ভড়। তাঁর ঘরে সেই মরচে-ধরা তালা ঝুলছে এখনো। চারদিক আগাছায় ভরে গেছে, দু'ঘরের পিছনেরটা পড়ো-পড়ো। বুকের তলায় কারো জন্য এখনো যে একটু দরদের জায়গা আছে বাপী জানত না। এখন টের পাচ্ছে। ভিতরটা টনটন করছে। সপরিবারে একটা মানুষ একেবারে হারিয়েই গেল।

জলপাইগুড়ি থেকে বানারহাট পর্যন্ত টানা বাস ছিল। সেখানে এসে শুনল আরো একটু সুব্যবস্থা হয়েছে। বানারহাট থেকে বাস সার্ভিস চালু হয়েছে বানারজুলির চা-বাগানের কল পর্যন্ত।

আসতে আসতে বাপী ভাবছিল, তার ঘরদোরেরই বা কি অবস্থা কে জানে। ভেঙে পড়ার কথা অবশ্য নয়। আবু রব্বানী থাকলে বে-দখল হবার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু যে মেজাজের মানুষ ও, এখনো বীটম্যানের কাজ নিয়ে পড়ে আছে কিনা কে জানে। থাকলেও বাড়ি খালি পড়ে আছে কি ভাড়াটে বসানো হয়েছে জানে না। বাবা মারা যাবার পরে চলে আসার সময় আবুকে বাড়িটা বেচে দিতেই বলে এসেছিল। আবু রাজি না হওয়াতে ভাড়াটে দেখতে বলেছিল। দেড়ঘরের কাঠের বাড়ির পাঁচ-সাত টাকা যা ভাড়া জোটে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে বাপী নিজে একটা চিঠি লিখেও খবর নেয়নি। এর মধ্যে কত কাণ্ড। যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়েছে। দেশ দু-খণ্ড হয়েছে, স্বাধীন হয়েছে। এই তোড়ে তার দেড়ঘরের বসতবাড়ির অদৃষ্ট চোখে না দেখা পর্যন্ত ভরসা করার কিছু নেই।

চা-কলের সামনে বাস এসে দাঁড়ানোর আগেই বাপী ভাবনাচিন্তা ভুলে

গেল। সেই বানারজুলি। আকাশের গা-ঘেঁষা সেই পাহাড়ের সারি। তার গায়ে থাক-থাক পেঁজা তুলোর মতো সাদাটে মেঘ।…ওই বানারজুলির জঙ্গল। দিনটা ঠিক মেঘলা নয় আজ। কিন্তু জঙ্গলের দিকটা মেঘলা দিনের মতোই লাগছে।

…ওই মাথা-উঁচু শাল শিশু অর্জুন জারুল দেবদারু ইউক্যালিপটাস গাছগুলো যেন সেই আগের মতো বাপী নামে এক দুরন্ত ছেলের পা ফেলার অপেক্ষায় ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। বাসের মাথা থেকে টিনের সুটকেস আর বাঁধা বিছানা নামানো হতেই বাপীর ছোটার তাড়া। কিন্তু বাক্সবিছানা নিজে বয়ে নিয়ে যাবার মতো এখন আর অত হাল্কা নয়। জিনিস তো কিছু বেড়েইছে।

পয়সা কবুল করে একটা লোক জোটানো গেল। তারপর জুতোর তলা দিয়েও পায়ে সেই পরিচিত পথের স্পর্শ। এদিকের চা-বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সেই পুরনো দৃশ্য চোখে পড়ল। নানা বয়সের নানা রংয়ের মেয়েরা আড়াই-পাতি তুলছে আর কোমরের সঙ্গে বাঁধা বেতের ঝুড়িতে ফেলছে। বাপী একটু না দাঁড়িয়ে পারল না। হঠাৎ দেখলে মনে হবে কিছুই বদলায়নি, জীবনের স্রোত সেই একভাবেই চলছে।

বদলেছে শুধু বাপী নিজে। আগের মতো ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ওরা আর সেরকম করে হাসবে না, রঙ্গকৌতুকে উছলে উঠবে না। ওরা মতলব দেখবে, লোভের ছোবল ভাববে। অথচ সেই চৌদ্দ-পনের বয়সে যেমন ছিল এই মুহূর্তে অন্তত সেটুকু লোভেরও ছিটেফোঁটা নেই।

চা-বাগানের সাহেববাংলো কটা পার হবার সঙ্গে সঙ্গে বাপীর উৎসুক দু চোখ আর এক দিকে ছুটল। রাস্তার ঢালের ওধারে শালগুঁড়ির দিকে। তারপর সেই ছেলেবেলার মতোই ছুটে যেতে ইচ্ছে করল।

বনমায়া। একটা পা শালগুঁড়ির সঙ্গে শেকলে বাঁধা। সামনে ডালপালা ছড়ানো। বনমায়ার খাবার তাড়া খুব নেই। বেছে একটা দুটো তুলে মুখে দিচ্ছে। সঙ্গের লোকটাকে দাঁড়াতে বলে বাপী নেমে গেল। শালের ছায়ায় বছর আঠেরো-উনিশের একটা ছেলে মাটিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

বাপী আট-দশ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল। এবারে হাতিটা দেখল ওকে। পেল্লায় শরীরের ক্ষুদে চোখ দুটো স্থির খানিক। তারপরেই বিশাল দেহে আনন্দে তরঙ্গ তুলে শুঁড় উঁচিয়ে মস্ত সেলাম। গলা দিয়ে আনন্দের টানা ঘড়ঘড় শব্দে গাছতলায় ছোকরার ঘুম ভেঙে গেল।

বাপীর গলার কাছে আনন্দের ডেলা আটকেছে একটা। আর চোখের ছ কোণ শিরশির করছে। এগিয়ে যেতে বনমায়া ওকে শুঁড় দিয়ে আলতো করে জড়িয়ে ধরে সোহাগ জানালো। যেন বলতে চায়, এতদিন কোথায় ছিলে, কত খুঁজেছি তোমাকে। ছেড়ে দিতে বাপী ওর শুঁড়ে হাত বুলিয়ে আদর করল খানিকক্ষণ। বলল, ছ বছর বাদে দেখেও তুই আমাকে ঠিক চিনে ফেললি! কি করে চিনলি? একবার চিনে রাখলে তোরা আর ভুলিস না?

গাছতলার ছেলেটা মুখ উঁচিয়ে এই আদরের মাখামাখি দেখছিল। ভূমি-শয্যা ছেড়ে অবাক মুখে উঠে এলো। বাপী দেখেনি। বনমায়ার নাকেমুখে এবার ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে ঘুরে তাকালো। মনে হল, এই ছেলেটাকে বনমায়া তেমন পছন্দ করে না।

বাপীর পরনে পরিষ্কার পাজামা-পাঞ্জাবি। এই এখন সর্বদার পোশাক। কিন্তু বনমায়ার হাবভাব দেখে হোক বা যে কারণেই হোক ছেলেটা হয়তো বিশেষ কেউ ভেবে বসল ওকে। ফিরে তাকাতে সসম্ভ্রমে সেলাম ঠুকল।

—তুমি কে?

—জী লছমন……

—ওর মাহুত ভীমবাহাদুর কোথায়?

লছমন সবিনয়ে জানালো, ভীম বাহাদুর চার বছর আগে এ-জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এখন ও-ই বনমায়ার মাহুত।

বাপী তক্ষুনি বুঝে নিল এই পালানোর সঙ্গে ওর সেই ভালবাসার মেয়ের কিছু যোগ আছে। কিন্তু চাকরি ছেড়ে বনমায়াকে ছেড়ে একেবারে পালানোর দরকার হল কেন বোঝা গেল না। যতদূর মনে পড়ে, আবুর মুখে শুনেছিল ভীমবাহাদুর পণের টাকা জমাচ্ছে। যে মেয়েকে চায় তাকে পেতে হলে তার বাপকে পণের টাকা গুনে দিতে হবে।

কথার ফাঁকে বাপী বনমায়ার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। বনমায়ার হঠাৎ ফোঁস-ফোঁসানি তাইতে থেমেছে ছেলেটা তাও লক্ষ্য করল। একটু আগ্রহ নিয়ে বলল, আপনাকে হুজুর এই গোঁয়ার হাতিটা খুব ভালোবাসে দেখছি।

এক প্রেমিকের সঙ্গে পালানো ছাড়া বনমায়া গোঁয়ার এমন অপবাদ বাপীর কানে এই প্রথম। জিজ্ঞেস করল, কেন, তোমাকে ভালবাসে না?

লছমনের মুখখানা বিষ একটু। মাথা নেড়ে জানালো, ভালবাসে না। তারপর ওর কথা থেকে সমস্যা বোঝা গেল। ভীম বাহাদুর চলে যাবার পর চার বছরে একে একে পাঁচজন মাহুত বনমায়ার কাজে লেগেছে। ও ছ নম্বর।

গোড়ায় তিন-তিনটে মাহুতকে এই জিদ্দী হাতি কাছেই ঘেঁষতে দেয়নি। কাছে গেলে তেড়ে এসেছে। টানা দুটো বছর ওকে দিয়ে জঙ্গলের কাজ হয়নি। পরের দুটো মাহুতও খুব সুবিধে করতে পারেনি। এখন অবশ্য আগের তুলনায় অনেক ঠাণ্ডা, কিন্তু এখনো রাগে ফোঁস ফোঁস করে, আর মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায়। কদিন বেশ ঠাণ্ডা ছিল, আজ আবার মতিগতি সুবিধের নয়।

বাপীর ধারণা, ওকে দেখে বনমায়ার ভীমবাহাদুরকে আজ বেশি মনে পড়ছে। তাই রাগ। জিজ্ঞেস করল, ও কি বছর একবার করে পালাতো—এখনো পালায়?

লছমনের হাসি-হাসি মুখ। জবাব দিল, সে-বেলায় ঠিক আছে। কোনো বছর বাদ যায় না। আবার ফিরেও আসে। ও পালালে সাহেবরা এখন আর রাগটাগ করে না, জানে ফিরে আসবে। কেবল যতদিন না আসে আমার হয়রানি। আমি কাজ নেবার তিন সপ্তাহের মধ্যেই ও পালিয়েছিল।

বাপী ভেবে পেল না, এই মেজাজ যখন, বনমায়া পালিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে কেন? হয়তো ভীমবাহাদুরের টানে আসে। ভাবে ফিরে এলে ওকে দেখতে পাবে। হয়তো বা সভ্যভব্য হাতি জংলি দোসরের সঙ্গ খুব বেশিদিন বরদাস্ত করতে পারে না। আবুর একটা কথা মনে পড়তে বনমায়াকে আর একবার ভালো করে দেখে নিল।····· সেবার ফিরে আসার পর বনমায়াকে একটা বড়সড় আদরের চাপড় মেরে আবু বলেছিল, তিন বছর ধরে পালিয়ে গিয়ে রস করে আসছিস—বাচ্চা-কাচ্চা হবার নাম নেই কেন? তোর মরদটাকে ধরে এনে ডাক্তার দেখা।

বাচ্চা আজও হয়নি বোধ হয়। হলে দেখতেই পেত। লছমনকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি আবু রব্বানীকে চেনো?

সঙ্গে সঙ্গে ও ঘাড় হেলিয়ে জানালো, খুব চেনে। আঙুল তুলে জঙ্গলের দূরের দিকটা দেখিয়ে দিল। ওই জাঙলে থাকে।

আবু এখানেই আছে জেনে বাপী নিশ্চিন্ত একটু। তারপরেই মনে হল সঙ্গের মাল নিয়ে সোজা নিজের ডেরায় গিয়ে কি লাভ। খালি আছে কিনা ঠিক নেই, আর খালি যদি থাকেও, ও আসবে বলে কি কেউ ঘরদোর খুলে বসে আছে? আবুর সঙ্গেই আগে দেখা হওয়া দরকার।

লছমন এতক্ষণে ভরসা করে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে হুজুর?

বাপী হেসেই জবাব দিল, আমি তোমাদের হুজুর-টুজুর কেউ নই।

এখানেই জন্মেছি এখানেই বড় হয়েছি। পাঁচ-ছটা বছর এখানে ছিলাম না——

কোনো ভদ্রলোক এভাবে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সদালাপ করে না হয়তো। খুশিমুখ দেখল। সেই সঙ্গে হঠাৎ কিছু প্রত্যাশাও যেন।—আমার একটু উপকার করবেন বাবু?

বাপী অবাক।—আমি আবার তোমার কি উপকার করতে পারি?

গলায় আব্দারের জোর ঢেলে লছমন বলল, আপনি একটু চেষ্টা করলেই পারবেন বাবু—ওই জেদী হাতি আপনাকে কত ভালবাসে স্বচক্ষে দেখলাম। এক ভীমবাহাদুরকে এ-রকম ভালবাসত শুনেছি। আপনি একটু চেষ্টা করলে ও আমাকেও ঠিক পছন্দ করবে—ওরা যাকে ভালবাসে তাদের কথা শোনে, বোঝে। ওকে দিয়ে এখনো জঙ্গলের কাজ ভালো করে করাতে পারি না, না পারলে সাহেবরা বা ঠিকাদার খুশি থাকে না। এরকম হলে আগের মাহুতদের মতো আমারও কাজ যাবে—

এমন উপকারের বায়না বাপী আর শোনেনি। হড়বড় করে এতগুলো কথা বলার পর ছেলেটার কালো মুখ প্রত্যাশায় জলজল করছে। বাপীর হাসি পাচ্ছে। বানারজুলিতে পা দিয়েই একটা কাজের মতো কাজ পেল বটে।

—আবু রব্বানীকে বলোনি কেন, ওকেও তো বনমায়া ভালবাসে।

এবারে লছমনের মুখ দেখে মনে হল প্রায় অসম্ভব প্রস্তাব কিছু। বলল, সে তো এখন মস্ত লোক বাবু, অনেককে টপকে জঙ্গলের হেড বীটম্যান হয়েছে, বন্দুক নিয়ে ঘোরে, বড়সাহেব তাকে পছন্দ করে—তার কাছেই তো যেতে সাহস হয় না! কখনো দেখা হয়ে গেলে বনমায়াকে একটু আদর করে, আর আমাকে বলে, ভালো সেবা-যত্ন করে ওকে বশ কর, নইলে তোরও সময় ঘনালো বলে। না বাবু, তাকে দিয়ে হবে না, আপনি চেষ্টা করলেই হবে—আপনাকে ও আবুর থেকেও বেশি ভালবাসে স্বচক্ষে দেখলাম।

...আবু রব্বানী তাহলে এখন হেড বীটম্যান আর মস্ত লোক। একটা বন্দুক বাগাতে পারেনি বলে নিজের বাপকে অকর্মণ্য ভাবত, তাও মনে আছে। কি ভেবে নিয়ে রাস্তার বাক্সবিছানা মাথায় লোকটাকে ডাকল। অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। লছমনকে বলল, আমার এই জিনিসগুলো তোমার জিম্মায় রাখো, আমি একটু ঘুরে আসছি। আবু রব্বানীর ওখানেই যাব—

সভয়ে লছমন বাবু থেকে আবার হুজুরে উঠে এলো তক্ষুনি।—আমার কথা যেন কিছু বলবেন না হুজুর!

বাপী হেসেই আশ্বাস দিল, তোমার কিছু ভয় নেই, বনমায়া যাতে তোমাকে পছন্দ করে আমি নিজেই সে-চেষ্টা করব। বনমায়ার শুঁড় চাপড়ে দিল, লছমনকে ভোগাচ্ছিস কেন, অ্যা?

লোকটার পয়সা মিটিয়ে আবার রাস্তায় উঠে এলো। যত এগোচ্ছে চোয়াল ছুটো এঁটে বসছে। ধমনীতে রক্তের স্রোত বদলাচ্ছে। আর খানিক এগোলেই সেই বাংলো। বানারজুলি জঙ্গলের বড়সাহেবের বাংলো।

এলো। রাস্তা ছেড়ে সেইধারের গাছটার সামনে দাঁড়াল। যে গাছের নিচু ডালে বসে মিষ্টিকে নানা কৌশলে ওই বাংলো থেকে টেনে আনত। বাইরের কাঠের বারান্দায় মাঝবয়সী একজন আয়া গোছের কেউ বসে।

আট সাড়ে আট বছর আগে ওই বারান্দায় এই শরীরটা বাবার চাবুকে লুটোপুটি খেয়েছিল। গায়ের চামড়া ফেটে ফেটে যাচ্ছিল। ঠোঁট ফেটে কেটে মুখ রক্তে ভরে গেছল।...ওই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মিষ্টি দেখছিল। আর এই সেদিন বিকেলে লেকের ধারে ভিতরটা যখন তার থেকেও বেশি ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছিল...মিষ্টি দেখছিল।

কিন্তু আশ্চর্য! বাপীর চোয়াল ছুটো আরো এঁটে বসছে, একটা ক্ষমা-শূন্য অভিলাষ ভিতরে দাপাদাপি করছে, অথচ প্রতিশোধের সেই সাদা আগুন এই মুহূর্তে ঠিক তেমন করে জ্বলছে না।...কেন? নিজে ভ্রষ্ট হবার ফল? অপরাধ-চেতনা?

বাপী সামনের ওই বাংলোর দিকে চেয়ে আছে বটে, কিন্তু দেখছে নিজেকে। আরো কিছু দেখার আছে যেন, বোঝার আছে। সব প্রত্যাশার বুকে ছুরি-বসানো আচমকা অপমানের আঘাতে আর আত্মঘাতী ক্রোধে আর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে প্রবৃত্তির ক্রূর উল্লাসে সেই আরো-কিছু-দেখা বা বোঝার ব্যাপারটা দূরে সরে গেছল। বাপীর ভেতর-বার এই মুহূর্তে আবার অদ্ভুত ঠাণ্ডা। এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বনের হাতি বনমায়া সেই ঠাণ্ডা প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে।

...পুরনো দিনের অন্তরঙ্গ সঙ্গীকে বনের পশুও ভোলে না। মানুষ ভোলে?...মিষ্টি কি একেবারে ভুলতে পেরেছিল? স্লিপ পাঠানোর তিন চার মিনিটের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এসেছিল, তার দু'চোখে বিস্ময় আর আগ্রহের বন্যা দেখেছিল—সে কি মিথ্যে?...সেই সন্ধ্যায় চলে যাবার আগে ওর জুলুমে

পড়ে অমন করে মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি কি দেখছিল? শুধু দেখছিল, না নিজের সঙ্গে যুঝছিল? তারপর ভব্যভাবে বাপীকে অকরুণ কিছু বুঝিয়ে দেবার জন্যে একই সঙ্গে ওই সোনালী চশমাকেও ডেকে ডেকেছিল বটে। আট বছরের ফারাকে কেউ যদি তার মন কেড়েই থাকে, ছেলেবেলার সাথীকে দেখামাত্র তাকে নাকচ করে দেবে, এমন আশা বাতুলে করে। ঠাণ্ডাভাবে এটুকুই হয়তো বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল। পাড়ার ভক্তের দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে সে-আঘাত চারগুণ হয়ে বাপীর বুকের ভিতরটা ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছিল সত্যি কথাই। কিন্তু মিষ্টি যে মূর্তিতে ওদের ধাওয়া করে তাকে আগলেছিল আর সেই মন-কাড়া সোনালি চশমার ওপর যে-রকম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল—সেই সত্যটা কি কম কিছু?

…পুরনো লোভ পুরনো আশা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে আবার। ওই মাখমের দলা সোনার চশমা মিষ্টির জীবনের দোসর হতে পাবে না। মিষ্টি বাপীর জগৎ থেকে একেবারে মুছে যাবে এমন হতে পারে না। দুনিয়া যত বড়ই হোক, আবার যোগাযোগ হবে, আবার কিছু ঘটবে। ঘটতে বাধ্য। যা ঘটেছে সেটা এখনো শেষ নয়, শেষ কথা নয়।

কিন্তু এই উদ্দীপনার পিছনে বিষাদের ছায়া দুলছে। সত্তার দুর্বার জোরের অনেকখানি কলকাতার সেই টালি এলাকায় খুইয়ে এসেছে। দোষ কমলা বনিকের কি নিজের সেটা কোনো সান্ত্বনা নয়।

অসহিষ্ণু তাড়নায় চিন্তাটা বাতিল করার চেষ্টা বাপীর।… এখান থেকেই জঙ্গলে ঢুকত মিষ্টিকে নিয়ে। বাপী নেমে এলো। জঙ্গল তেমনি আছে, শুধু অনেকদিন না দেখার ফলেই হয়তো ঘন লাগছে একটু।

… সব যেন সেদিনের কথা, সেদিনের ব্যাপার। এদিকটায় ওরা রঙিন প্রজাপতি আর কাঠবেড়ালি আর খরগোশের পিছনে ছোটাছুটি করত। বাপী তরফদার দেখছে, দাঁড়াচ্ছে, আবার চলেছে।…ওই সেই ছোট গাছটা। বাপী এই ছোট ডালটায় পা ঝুলিয়ে বসেছিল, দু হাতে দুটো হাত ধরে মিষ্টিকে প্রথমে পায়ের ওপর তুলেছিল, তারপর বুকে জাপটে ধরে পাশে বসিয়ে দিয়েছিল। নামার সময় তেমনি বুকে করে নামিয়েছিল— দশ-বারো গজ ওমনি টেনে নিয়ে তবে ছেড়েছিল।

পা দুটো আড়ষ্ট আবার এক জায়গায়। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।… সামনে সেই শিশুগাছ যার মোটা গুঁড়িতে পাকে পাকে জড়িয়ে ছিল সাদা-কালো ছোপের বিশাল ময়াল সাপ, চ্যাপ্টা মুখটা সামনে টান হয়ে মিষ্টির দিকে।

ওটার সোঁ-সোঁ নিঃশ্বাসে মিষ্টির সর্বঅঙ্গ অবশ, নড়াচড়ারও ক্ষমতা ছিল না। ওকে দুচোখে আটকে নিয়ে সাপটা আস্তে আস্তে গাছের গুঁড়ি থেকে নিজের শরীরের প্যাঁচ খুলছিল।… বাপীর আচমকা প্রচণ্ড ধাক্কায় মিষ্টি চার-পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়েছিল। তারপর পাগলের মতোই ছুটেছিল দুজনে।

বাপীর কপালে ঘাম। সংকট যেন সদ্য কেটেছে। পুরস্কারও পেয়েছিল। মেয়েকে জঙ্গলে টেনে আনার অপরাধে মেমসাহেব সকলের চোখের সামনে বাপীর কান টেনে ছিঁড়তে চেয়েছে, আর গালাগাল করে ঘাড় ধরে বাংলো থেকে নামিয়ে দিয়েছে।

সেই বাপী আজ এই মুহূর্তেও ভাবছে যে-মেয়েকে ধরা-বাঁধা মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে এনেছে, তার ওপর সব দখল কার? শুধু তার ছাড়া আর কার হতে পারে?

পা দুটো আরো এক জায়গায় থেমে গেল। যেখানে সেই শেষ কিছু ঘটেছিল। যার ফলে মুখের গা-ঘুলনো রক্তের স্বাদ জীবনে ভুলবে কিনা জানে না। স্থান-কাল ভাল-মন্দ ভুলে, পরিণামের হিসেব ভুলে উন্মাদ লোভে আর আক্রোশে সেই মেয়েকে এখানে এনে ফেলেছিল আর তার সর্বাঙ্গর নরম মাংস খুবলে নেবার উল্লাসে মেতেছিল। বাপী তরফদারের মুখের রেখা কঠিন। কপালে ভ্রূকুটি। শিরায় শিরায় উষ্ণ তাপ। টালি এলাকার খুপরিঘরে আত্মবিলোপের দাহ বুকে লেগে আছে। কিন্তু এখানকার সেই স্মৃতির কোনো দাহ নেই। অনুতাপ নেই। বরং সেই দখল অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ায় পরিতাপ। ওই একজনের ওপর তার সত্তার অধিকার। কোথা দিয়ে কেমন করে সেই অধিকার এসেছে, চোদ্দ বছরের বাপী জানত না, আজকের বাপী তরফদারও জানে না। সেই অধিকার নাকচের যন্ত্রণা সেদিনও যেমন, আজও তেমনি।

আবু রব্বানীর ডেরার সামনে এসে বাপীর ধোঁকা লাগল বেশ। খুব ভালো জানা না থাকলে চেনা যেত না এমনি ভোল পাল্টেছে। দুখানা ঘরের পাশে এখন আরো একটা ঘর। সামনে পিছনের অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। চারদিকের সবটা জুড়ে শক্তপোক্ত বাঁশের বেড়া। সামনে বাঁশের মজবুত গেট। এদিকে পাহাড়ী ফুলের বাগান।

বনামায়ার ছোকরা মাহুত লছমন সসম্ভ্রমে বলেছিল, আবু রব্বানী মস্ত মানুষ একজন। এখন তার ভেতর কেমন কে জানে। গেট খুলে পায়ে পায়ে ঘরের দিকে এগলো। ঘর থেকে মোটাসোটা তিন-সাড়ে তিন বছরের কালো-

কোলো হ্যাংলা ছেলে ছুটে বেরিয়ে এলো। ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল, তারপর হাঁ করে চেয়ে রইল।

ছেলেটা নয়, ভেবাচেকা খেয়ে গেল বাপীই বেশি। শুধু বিয়ে নয়, আবুর এর মধ্যে ছেলেও হয়ে গেছে! এরপর যে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তাকে দেখে বাপী সত্যি হাঁ। ছট্টু মিঞার বউ দুলারি। তার কোলে আর একটা আট-ন'মাসের বাচ্চা। কিন্তু দুলারি কেন? রেশমা নয় কেন?

বাড়ির আঙিনায় ঢুকে একটা লোককে সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দুলারি ছেলে কোলে নিয়েই গম্ভীর মুখে আরো খানিকটা এগিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কাকে চাই বা কি চাই করা হল না। তামাটে মুখে বিস্ময়ের আঁচড় পড়তে লাগল।

—বাপীভাই না?

অবাক চোখে দুলারির দিকে চেয়ে বাপী মাথা নাড়ল। আগে ওকে কখনো বাপীভাই বলে ডেকেছে মনে পড়ে না। তামাটে রঙে এখন আর অতটা কালচে ভাব নেই। ঢ্যাঙা শরীর এখনো প্রায় আগের মতোই আঁটো-সাঁটো। মাথার চুল এলোমেলো, লালচে নয় আগের মতো। বেশ সুবিন্যস্ত আর তেল চকচকে। মুখের সেই রুক্ষভাব আর নেই, চাউনিও তেমন ধার-ধার নয়।

তবে স্বভাব-গম্ভীর মেয়ের আপ্যায়নে উচ্ছ্বাস বেশি ধরা পড়ে না। এত বছর বাদে ওকে দেখে অখুশি নয় এটুকুই বোঝা গেল।

—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, দাওয়ায় উঠে এসো। কত বড়টি হয়ে গেছ, অনেক লম্বাও হয়েছ—আমি হঠাৎ চিনতেই পারিনি। কবে এলে?

—আজই। বাপী খানিকটা এগিয়ে এলো বটে, কিন্তু মাটি ছেড়ে দাওয়ায় উঠল না। কোলের বাচ্চাটা আঙুল চুষছে আর কুতকুত করে তাকাচ্ছে। বড়টাও দুলারির গা ঘেঁষে ড্যাবডেবে চোখে ওকে নিরীক্ষণ করছে। জিজ্ঞেস করল, আবু কোথায়?

—খানিক আগে তো তোমার ঘরের দিকেই যাচ্ছে বলে গেল, তুমি ও-দিক থেকে আসছ না?

না। ব্যাপারটা এখনো বোঝার চেষ্টা বাপীর।—ছট্টু মিঞার খবর কি?

সামনের আকাশের দিকে একবার একটু মুখ উঁচিয়ে নির্লিপ্ত গলায় দুলারি জবাব দিল, তার খবর তো ওখানে, সেই যেবারে তুমি শেষ এলে সে-বছরই চলে গেল—

বাপী ভাবল, আর কেউ নেই বলে আবু রেশমার সঙ্গে ওকেও ঘরে এনে রেখেছে। তবু কেন যেন বোকার মতোই জিজ্ঞাসা করল, এরা কার ছেলে?

এত অবাক হতে দেখেই হয়তো তামাটে মুখে হাসি ফুটল একটু —যার কাছে এসেছ তার, আবার কার?

—রেশমা কোথায়?

জবাব দেবার আগে দুলারি এবারে ওকে ভালো করে দেখে নিল একটু। তারও অবাক লাগছে বোধ হয়। সাপ নাচাতো যে মেয়ে সে বাঁকা তাকাতে জানে, বাঁকা কথাও বলতে পারে।—এতকাল বাদে এসেই রেশমার খোঁজ কেন—সে তার ঘরেই হবে।

বাপী এখনো কি শুনছে কি বুঝছে ঠিক নেই।·· রেশমা তার ঘরে আর দুলারি আবুর ঘরে! হঠাৎই রহস্যের পর্দাটা উঠে গেল। কিন্তু সে-ও তো বিস্ময়ে হাবুডুবু খাবার মতোই ব্যাপার!

বিড়ম্বনার ধকল সামলে বলল, আচ্ছা এখন যাই, আবুকে ধরতে পারি কিনা দেখি। পরে আবার আসব—

তড়িঘড়ি পা চালিয়ে একেবারে আঙিনার বাইরে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিজের ঘরের পথ ধরেও মাথায় এই বিস্ময়টুকুই ঘুরপাক খাচ্ছে। সাপ খেলানোর ব্যাপারে দুলারি রেশমার থেকেও ঢের বেশি চৌকস ছিল বটে। হতেই পারে, ঘরের লোকের কাছ থেকে সরাসরি শিখেছে। রুক্ষ মুখে পেট-মোটা বাঁশি লাগিয়ে গাল ফুলিয়ে হেলেদুলে সাপের ফণার সঙ্গে তালে তালে ঝোঁক মিলিয়ে সাপ খেলানোর দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুলারি এ কি খেলা দেখালো।

আরো একটু ধাক্কা বাকি ছিল বাপীর।

নিজের বাড়ির সামনে এসেও হাঁ। এরও ভোল বদলে গেছে। ছোট-বড় দুখানা ঘরের পাশের খালি জমিতে লাগোয়া আর একটা বড় ঘর গজিয়েছে। কাঠের বাড়িতে আগে রঙের বালাই ছিল না, এখন ওটার সর্বাঙ্গে রঙের জেল্লা। হালে সংস্কারও করা হয়েছে সন্দেহ নেই। তকতকে ছোট্ট বাংলোর মতো দেখাচ্ছে। সামনের চিলতে বারান্দায় বেতের চেয়ার বেতের টেবিল। ধপধপে সাদা টেবিল-ক্লথ।

আবু রব্বানী সত্যি কি-রকম মস্ত মানুষ হয়েছে বাপী ভেবে পেল না। সামনের দরজা খোলা দেখে ভাবল আবু ভিতরেই আছে।

পায়ে পায়ে উঠে এলো। তারপর খোলা দরজার ভিতরের দিকে এক পা

ফেলে মুখ বাড়াতেই বিষম চমক।

—হু ইজ্ ইট! হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট?

মহিলা কণ্ঠের ঝাপটা খেয়ে দু' পা পিছনে ছিটকে এলো বাপী। সঙ্গে সঙ্গে উগ্রমূর্তি মহিলাটিও বাইরে। বাঙালীর মতোই শাড়ি পরা, কিন্তু এক নজরেই বোঝা যায় বাঙালী নয়। নেপালী। চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যে বয়েস। ফর্সা মুখে লালিত্য কম। এই মুহূর্তে অন্তত উগ্রমূর্তি, রুষ্ট চাউনি। তার পিছনে বছর উনিশের একটি মেয়ে। কমনীয় মুখ, হৃষ্টপুষ্ট সুডৌল চেহারা। পরনে রঙিন ঘাগরা, গায়ে লম্বাটে সাদা ব্লাউস।

বাপীর অমন বিমূঢ় মুখখানা দেখেও মহিলা সদয় নয়। তেমনি রুক্ষ স্বরে আবার জিজ্ঞাসা করল, হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট?

বাপীর গলা দিয়ে শুধু বেরুলো, আবু রব্বানী···

ওর আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে নেপালী মহিলা এবারও একটু কড়া গলায় কিন্তু পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলে, আবু রব্বানীর খোঁজে এসে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন কেন? কি দরকার তাকে?

পিছনের সুদর্শনাটি মহিলার মেয়েই হবে হয়তো। দুর্দশা দেখছে। বাপী নিজেকে অথৈ জল থেকে টেনে তুলল এবার। মোলায়েম করেই বলল, দরকার কিছু না···। এতকাল আমি জানতাম এটা আমারই বাড়ি···বছর কয়েক ছিলুম না এখানে, দরজা খোলা দেখে ভিতরে আবু আছে ভেবে ঢুকতে যাচ্ছিলাম।

এমন জবাব আশা করেনি বোঝা গেল। মহিলার গোল চোখ আর একটু গোল হতে দেখা গেল। মেয়ের চাউনিও বদলেছে।

এর পরেও মচকাবার পাত্রী নয় মহিলা। গলার ঝাঁঝ একটু কমল শুধু। কি নাম আপনার?

—বাপী তরফদার।

ভুরু কুঁচকে কিছু স্মরণ করার চেষ্টা। স্মরণ হল কিনা বোঝা গেল না। তারপর সাফ কথা—আবু রব্বানী খানিক আগে এসেছিল, চলে গেছে। আপনার কিছু জানার বা বোঝার থাকে তো তার সঙ্গে দেখা করুন।

কথা শেষ হবার আগেই ঘরে চলে গেল। বাপী এবারে কয়েক পলক মেয়েটার মুখোমুখি। ভিতর থেকে আবার একটা তাড়া খাওয়ার সম্ভাবনা মনে আসতেই বাপী তাড়াতাড়ি নেমে এলো।

বিশ-বাইশ গজ দূরে এসে সন্তর্পণে ফিরে তাকালো একবার। মেয়েটা

দাঁড়িয়েই আছে আর তাকিয়েই আছে। যার ঘর-বাড়ি তারই এমন হেনস্থার প্রহসনটা বেজায় উপভোগ্য যেন।

অগত্যা সামনের সোজা রাস্তা ধরে বাপীর দ্রুত প্রস্থান।

নয়

হাসি আর থামেই না। হাসির দমকে জঙ্গলের গাছপালাকে সুদ্ধু তাক লাগিয়ে দিচ্ছে আবু রব্বানী। অদূরের নতুন চারা বেড়ে-এ যে তিন-চারটে লোক কাজ করছে তারাও মাঝে মাঝে এদিকে ঘাড় ফেরাচ্ছে। আবু রব্বানী জঙ্গলের অনেকগুলো খেটে খাওয়া লোকের মুরুব্বি এখন। দস্তুরমতো কড়া মানুষ আর দাপটের মানুষ। সেই লোকের এত ফুর্তি আর এমন হাসি ওদের কাছেও নতুন কিছু।

একটু সামলে আবু বলল, তুমি বাপীভাই সেই আট বছর আগে থেকে ধরে নিয়ে বসে আছ আমি রেশমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি! এত চৌকস হয়েও তুমি ভাবলে কিনা রেশমার জন্য আমার কলজে পুড়ছে। রোসো, ঘরে ফিরি আগে, দুলারি শুনলেও হেসে গড়াবে।

বোকা বনলেও বাপী হাসছে। নিজের এমন বিতিকিচ্ছিরি ভুলটা স্বীকার করতে আপত্তি নেই। ওর এত হাসি আর এত আনন্দ দেখে স্বস্তও বোধ করছে। বাইরে যত হোমরাচোমরা হয়ে উঠুক ভিতরের মানুষটা খুব বদলায়নি।

নিজের ঘর-বাড়িতে অমন একখানা ঝাপটা খেয়ে তিক্ত মেজাজে বাপী আবার জঙ্গলে ঢুকেছিল। বাড়তি ঘর তুলে সাজিয়েগুছিয়ে ওই নেপালিনী যে-রকম জাঁকিয়ে বসেছে, তাতে নিজের ডেরার ঠাঁই মেলার আশায় জলাঞ্জলি। ভরসা আবু রব্বানী।

জিগ্যেস করতে আঙুলের নিশানায় একটা লোক বলে দিল, ওদিকে নয়া চারা বেড হচ্ছে, আবু রব্বানী সেদিকে আছে—

নিশানা ধরে এগোতে এগোতে বাপীর মনে হল জঙ্গলটার কিছু উন্নতি হয়েছে। বড় বড় গাছগুলোর সাদা রং মাখানো গুঁড়ির ওপর কালো কালো নম্বরগুলো বেশ চকচকে লাগছে। পড়ন্ত বেলাতে এদিক সেদিকে দুই-একটা করে লোক কাজ করছে। রবারের নল দিয়ে কেউ গাছে জল দিচ্ছে, কেউ আগাছা পরিষ্কার করছে। কাগজে-কলমে কাজের লোক আগেও ছিল, কিন্তু

বেশির ভাগ সময় তাদের খুঁজেপেতে বার করতে হত। বাপীর মনে হল জঙ্গলটা কিছু যত্নের ছোঁয়া পেয়েছে।

পিছন ফিরে থাকলেও দূর থেকে আবুকে চিনতে অসুবিধে হল না। পরনে খাকি ফুল প্যাণ্ট। গায়ে চক্রাদার মোটা আঁট গেঞ্জি। চওড়া কাঁধ, আগের থেকেও কিছু লম্বা লাগছে ওকে। কালো সুপুষ্ট দুই বাহু। এক হাতের কব্জিতে ঘড়ি অন্য হাতে ছোট মোটা ছড়ি। ছড়ি দেখে ওর হাতের সেই লম্বা শক্ত পোক্ত লাঠিটার কথা মনে পড়ে গেল, যার একদিকে ইস্পাতের ঝকঝকে ধারালো ফালা গোঁজা আর তার ওপরে লোহার ক্যাপ। ওই লাঠি আবুর চোখের মণি ছিল একদিন। মস্ত মানুষ হয়ে এখন কি সেটা বাতিল করেছে? দেখলে মনে হবে জঙ্গলের কোনো ছোটখাটো অফিসার লোক দিয়ে কাজ করাচ্ছে।

—হেঁজিপেঁজি ব্যাপার নয়, এ চন্দ্রায় বেড ইয়াদ রেখো সাঙাতরা—বড় সাহেবের স্পেশাল অর্ডারের জিনিস। চারা গজালেই সাপে ছুবলোনো বেজির উৎপাত হবে—খুব হুঁশিয়ার, নষ্ট হলে কারো কাঁধে মাথা থাকবে না।

পিছন থেকে আলতো করে বাপী বলল, কাঁধের ওপর নিজের মাথাটা তো খুব টান দেখছি—এদিকে ফেরাও।

ঝটকা মেরে ঘুরে দাঁড়াল। আর তার পরেই খুশিতে আনন্দে দুই চক্ষু বিস্ফারিত একেবারে। ঠিক দেখছে কিনা সেই সন্দেহ।

—বাপী তুই! মা-মানে বাপীভাই তুমি!

দেমাক না বেড়ে থাকলে এই উচ্ছ্বাসই প্রত্যাশিত। বাপী হাসছে।—আবার তুমি কেন!…

লাঠিসুদ্ধু দু হাতে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরল ওকে। সঙ্গের লোক কটা হাঁ মেরে গেছে দেখে ছেড়ে দিল। কপট গাম্ভীর্যে ইশারায় ওদের কাজে মন দিতে হুকুম করল। তারপর আবার বে-সামাল খুশির উচ্ছ্বাস।—আরে বাপরে বাপ, এখন তুমি কত বড় আর কত বিদ্বান মানুষ -আর এখানে থাকলে তো কবেই আমার মুরুব্বি হয়ে বসতে—আনন্দে মুখ ফসকে ওরকম বেরিয়ে গেছল—এবার থেকে বাপীভাই-ই বলব। কিন্তু তুমি আজ কোত্থেকে? তোমাকে কত খুঁজেছি, তোমাদের কলেজের ঠিকানায় চিঠি লিখেছি—চার-পাঁচ মাস আগে তোমার খোঁজে জলপাইগুড়িও চলে গেছলাম। শুনলাম প্রায় দেড় বছর আগে গ্র্যাজুয়েট হয়ে তুমি নিপাত্তা—

কাঁধ জড়িয়ে ধরে পনের-বিশ গজ সরে এসে ওকে নিয়ে বসল এক জায়গায়।

—পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে একটা চিঠি নেই, একটা খবর নেই—ভাবলাম বানারজুলির এই জংলিটাকে ভুলেই গেছ। কবে এলে? আজই?

হাসি মুখে মাথা নেড়ে বাপী বলল, এসেই পর পর দুটো রাম ধাক্কা।

—সে আবার কি, কোথায়?

—প্রথমটা তোমার বাড়িতে।

—গেছলে বুঝি? তা ধাক্কা কেন, দুলারিকে দেখে?

বাপী হাসতে লাগল। লজ্জা লজ্জা মুখ করে আবু বলল, ওকে যখন ঘরে আনি তোমার কি কোনো পাত্তা ছিল যে খবর দেব!

—সে জন্যে নয়, আমি বরাবর জানতাম রেশমাকে নিজের ঘরে এনে তোলার জন্য তুমি হাঁ করে আছ।

আবু রব্বানীর এবারে আকাশ থেকে পড়া মুখ।—রেশমাকে! এ আবার তোমার মাথায় গজালো কি করে?

অবাক বাপীও কম নয়। কারণ তখনো ধারণা বিশেষ কোনো ঘটনার ফলেই রেশমার বদলে দুলারি তার ঘরে। কিন্তু আবুর মুখ দেখে আর কথা শুনে মনে হচ্ছে তাও না। কি মনে পড়তে বাপী বলল, বাবা মারা যাবার পর বানারজুলি ছাড়ার আগে তোমার বিয়েটা কবে হবে, জিগ্যেস করতে বিরক্ত মুখ করে তুমি বলেছিলে, শালার মরদ ঘরে থাকতে তার বিবিকে বিয়ে করা এত সোজা!…সে তবে কার কথা বলেছিলে?

—কেন, সেই ছটু মিঞার কথা। তুমি কি ভেবে বসেছিলে রেশমার মরদ কাঁদনা?

বাপী বোকার মতো মাথা নাড়ল। এতদিন সেই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল বটে।

তাই শুনে আবুর সেই হাসি।—এমন হাসি যে আশপাশের ওই লোক-গুলোও সচকিত। তারপর বলল, তোমার দোষ নেই, বলতে গেলে তো ছেলেমানুষই ছিলে তখন। তাছাড়া আধ-মড়া মরদের সেবাযত্ন করলেও আমার ভিতরের মতলবখানা দুলারি টের পেয়ে গেছল। তাই কড়া ভাব দেখাতো আর ছুবলোতে আসত। রেশমা আঁচ পেয়েছিল দুলারির কাছ থেকে —ননদ-ভাজে ভারী ভাব তো—তাই রেশমা আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত। এই সব দেখেই তুমি উল্টো-পাল্টা ভেবে বসে আছ।

চওড়া বুক চিতিয়ে আর এক দফা হাসল!—আরে 'আমি হলাম গিয়ে জঙ্গলের সেই অপদেবতা আবু রব্বানী—আমার যুগ্যি বিবি তামাম বানার-

জুলিতে দুলারি ছাড়া আর কেউ আছে নাকি! ছটু মিঞা মারা যাবার তিন দিনের মধ্যে দুপুরের নিরিবিলিতে ছোঁক ছোঁক করে যখন গিয়ে হাজির হলাম, দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল, তারপর বলল, কাল কেউটের ঝুপড়িটা এনে খুলে দেব? দুদিন বাদে আবার গিয়ে হাজির হতে বলল, একটা চেলা কাঠ ঠিক করি আগে, তারপর এসো।

বাপী উৎসুক।—তারপর?

—আমিও সেই ছেলে। পরদিন দুটো লোকের মাথায় দেড়-দেড় তিন মণ চেলা কাঠ এনে ওর উঠোনে ফেললাম আর গ্যাঁট হয়ে ওদের দাওয়ায় বসলাম। আবুর প্রাণখোলা হাসি।—দুলারির তখনকার মুখখানা যদি দেখতে!

আবুর এখন সবদিক থেকে সুদিন আর সুখের দিন চলছে বোঝা গেল। বাপী পর পর দুটো রাম-ধাক্কা খাওয়ার কথা বলেছিল মনে পড়তে জিজ্ঞেস করল, একটা ধাক্কা তো দুলারি, আর একটা কি?

—তোমাকে না পেয়ে নিজের ঘরে গেছলাম। সেখান থেকে এক নেপালী মহিলার তাড়া খেয়ে বেরুতে হয়েছে!

—এই রে! তোমার ঘরবাড়ি তো বেদখল। চার-পাঁচ মাস আগেও যদি একটা খবর পেতাম তাহলে ছাড়ি? তোমার খোঁজে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত গেছলাম—

বাপী শংকিত।—বেচে দিয়েছ নাকি?

আবু এটুকুতেই আহত।—আমি যেমন লোকই হই, তোমার সঙ্গে বেইমানি করব বাপী-ভাই? আমাকে জিম্মাদার করে গেছ আর আমিই খেয়ে নেব?

বাপীর তাড়াতাড়ি সামাল দেবার চেষ্টা।—খেয়ে নেবার কথা বলিনি, সুবিধে পেলে বেচে দেবার কথা তো আমি লিখেই দিয়ে গেছলাম তোমাকে।… তাহলে কি ভাড়া দিয়েছ?

—ভাড়াই বলতে পারো, তবে তার মধ্যেও প্যাঁচ ঘোঁচ আছে। মওকা পেয়ে আমি তোমার ভালই করতে গেছলাম, বাড়ির চেহারাখানা কেমন হয়েছে ভালো করে দেখেছ?

বাপী মাথা নাড়ল। দেখেছে।

—গেল মাসে আবার ইলেকট্রিক লাইটও আনা হয়েছে। ও তল্লাটে এখন কেবল তোমার বাড়িতেই বিজলির আলো জ্বলে—অনেক খরচা করে চা-বাগানের কোয়ারটারস থেকে লাইন টানা হয়েছে।…তা কে ভাড়া করল,

নেপালী মেমসাহেব···মানে গায়ত্রী রাই নিশ্চয় ?

—নাম কি করে জানব, যার বয়েস বেশি।

—হ্যাঁ, গায়ত্রী রাই। তার মেয়ে উর্মিলা রাই। মেয়েকে দেখেছ ?

—হুঁ।

একটা চোখ সামান্য ছোট করে আবু হাসল একটু।—বেশ খাসা, না!

আগের দিনের মতো এ চটুল প্রসঙ্গ বাপীর ভালো লাগল না। তার বুকের তলার ক্ষত আবু জানে না। তাছাড়া স্বাস্থ্য ভালো আর রং ফর্সা হলে বয়েস-কালের সব নেপালী মেয়েরাই মোটামুটি সুশ্রী। যে তপ্ত নিঃশ্বাস মুচড়ে বেরিয়ে আসছে সেটা গোপন করার তাগিদ।···ওই মেয়েকে খাসা বলছে, মিষ্টিকে দেখলে কি বলত ?

হাল্কা সুরেই জবাব দিল, মায়ের তাড়া খেয়ে আর অত দেখা হয় নি।

আবুর এতেও হাসি।—দেখতে গেলে আরও বেশি তাড়া খেতে—মা'টি জাঁদরেল মেয়েমানুষ। সব বলব'খন—তা তোমার সঙ্গে তার কি কথা হয়েছে ?

এ প্রসঙ্গও সংক্ষেপে সারল বাপী। তারপর বলল, এখানে থেকে যাব বলেই এসেছিলাম, যা হোক কিছু করে চালিয়ে নিতাম—তাও হবার নয় দেখছি।

আবু প্রায় আগের মতোই তিরিক্ষি।—আমি থাকতে তোমার এখানে থাকার জায়গার অভাব হবে ? চলে যেতে হবে ? তুমি কিছু ভেবো না, সব আমার ওপর ছেড়ে দাও। এই আবু রব্বানী এখন খোদার দয়ায় অনেক কিছু পারে—বুঝলে ?

বোঝা যায় কি যায় না এমন একটু শ্লেষ মাখিয়ে বাপী বলল, এখানে পা দিয়েই শুনেছি তুমি এখন একজন মস্ত লোক এখানকার—,

—কোন শালা—। বেফাঁস শব্দটা মুখ দিয়ে বার করেই জিভ কাটল আবু রব্বানী।—তুমি এখন অনেক পাশটাশ করা ভদ্রলোক মনে থাকে না, আমি শালা সেই জংলিই আছি—

বাপী বলল, জংলিই ভালো, মনে রাখার দরকার নেই।

আবুর হৃষ্ট মুখ।—আসলে কি জানো বাপীভাই, দাপটে না চললে সকলে ঘাড়ে পা দিতে চায়, তা বলে তুমি মস্ত লোক বলবে ?

—আচ্ছা বলব না। কিন্তু আমাকে থাকতে দেবে কোথায়, নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলবে ?

নিরীহ মুখে আবু ফিরে জিজ্ঞাসা করল, তুললে অসুবিধে হবে ?

—তা হয় না—।

আবু হেসে উঠল।—আমি মস্ত লোক হয়েছি, না তুমি ভদ্দর লোক হয়ে গেছ বোঝো তাহলে। কিছু ভেবো না, তোমাকে আমি জঙ্গলের ঘরে রাখব না। উঠে দাঁড়াল।—কিন্তু আমার ঘরে গিয়ে এখন কিছু মুখে দিতে আপত্তি নেই তো?

বাপীও উঠে পড়ল। মনের অবস্থা আবুর বোঝার কথা নয়। জঙ্গলের ঘরে কেন, একেবারে গহন জঙ্গলে সেঁধিয়ে যাবার মতোই ভিতরের তাড়না। একা থাকতে চায়। নিরিবিলিতে থাকতে চায় দিন-কতক। গুলি-বিদ্ধ বাঘও হিংস্র আক্রোশে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, তারপর ক্ষত শুকোনোর তাড়নায় নিরিবিলি আড়াল খোঁজে। সামনে দিয়ে তখন হরিণ নেচে গেলেও মুখ ফিরিয়ে থাকে।

—চলো। খিদের চোটে অন্ধকার দেখছি।

যত খুশিই হোক, আবুর কাজে গাফিলতি নেই। নতুন চারা-বেডটার দিকে এগিয়ে গেল। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে লোক ক'টাকে বলল, রাতে এরপর দুজন দুজন করে পাহারা দিতে হবে মনে থাকে যেন, নইলে বেজিতে শেষ করে দেবে।

যেতে যেতে বাপী বলল, বড়সাহেবের স্পেশাল অর্ডারের চন্দ্রা না কিসের বেড বললে ওটা, জঙ্গলে ফুলের চাষ-টাষও হচ্ছে নাকি আজকাল?

আবু মিটি মিটি হাসতে লাগল।—দুদিন সবুর করো, সব জানবে। চন্দ্রা কোনো বাহারী ফুল নয়, ওর আর এক নাম সর্পগন্ধা—অ্যালোপাথি কবরেজি হোমিওপ্যাথি এই তিনেতেই এর দারুণ কদর। এছাড়া হাতুড়েরাও পাগলা-দাওয়াই বানাবার জন্যে এর ফুল ফল পাতা শেকড়বাকড় সব কেনে।

সর্পগন্ধা নাম বাপীরও জানা। কিন্তু বীটম্যান আবুর এত-সব জানার কারণ কি, আর ওর মুখেই বা এরকম হাসি কেন? জিজ্ঞেস করল, বড়সাহেবের হুকুমে জঙ্গলে ওষুধের গাছ-গাছড়াও চাষ হচ্ছে এখন?

—হচ্ছে না, আমি হওয়াচ্ছি। আর, একটু কায়দা করে বড়সাহেবের হুকুমটা আদায় করে নিতে হচ্ছে। খুশিতে টইটুম্বুর মুখ আবুর।—বললাম তো, কটা দিন সবুর করো, সব জানবে সব শুনবে। তুমি এখানেই থেকে যাবে শুনে আমার বুকের ছাতি ডবল হয়ে গেছে—তুমি যা-হোক কিছু করে চালিয়ে নেবার কথা বলছিলে—এখানে পয়সার ছড়াছড়ি, বুঝলে দোস্ত—শুধু মাথা খাটিয়ে তুলে নিতে জানলেই হয়।

আবু রব্বানী মাথা খাটাচ্ছে আর পয়সাও তুলছে এটুকু বোঝা গেল। সেটা যে চাকরির পয়সা নয়, বাড়তি কিছু, তাও স্পষ্ট।

আরো একটু এগিয়ে বাপী দাঁড়িয়ে গেল।—বাক্স-বিছানা এদিকে রেখে এসেছি, নিয়ে নিলে হত।

—কোথায় রেখেছ?

বাপী ইচ্ছে করেই লছমনের নাম করল না। হেসে বলল, বনমায়ার জিম্মায়।

—বনমায়া! আমাদের বনমায়া?

সায় দিয়ে বাপী বলল, এখানে এসেই তো সবার আগে ওর সঙ্গে দেখা করলাম।

—তোমাকে চিনল?

—খুব। শুঁড় উঁচিয়ে আগের মতো সেলাম বাজালো, শুঁড় পেঁচিয়ে আদর করল।

শুনে আবুও খুশি। বলল, এক ভীম-বাহাদুর ছাড়া বনমায়ার কদর এখানে কেউ বুঝলই না। ভেবে নিল কি একটু।—বাক্স-বিছানা ওখানেই থাক এখন ...আপাতত ওদিকেই তোমার থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। লছমন দেখে রেখেছে তো?

সায় পেয়ে ঘরের দিকেই চলল আবার। আবু বলল, ভীমবাহাদুর নেই, বনমায়ার মেজাজেরও ঠিক নেই; তবে ফি বছর মরদের সঙ্গে পালানোটা ঠিক আছে।

—বনমায়াকে ছেড়ে ভীমবাহাদুর পালালো কেন?

শুনল কেন। না পালালে ভীমবাহাদুরকে জেলে পচতে হত। এখনো ওর নামে হুলিয়া বহাল আছে। ভাল ঘরের মেয়েকে ঘরে আনার আধা-আধি টাকার যোগাড় হয়ে গেছল। সেই টাকা জমানোর নেশায় ভীমবাহাদুর ভালো খেত না পর্যন্ত। চা-বাগানের এক উঠতি বয়সের দাপটের বাবু ওই পাহাড়ী মেয়েকে ছলাকলায় ভুলিয়ে নিজের বাংলোয় নিয়ে এসেছিল। তারপর যা, তাই। মেয়েটা বাবুর গায়ে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল বলে সে তাকে চাবুক দিয়ে মেরেছে পর্যন্ত। আর দরজায় পাহারা মোতায়েন রেখেছে।

মাঝরাতে ভীমবাহাদুর বাংলোয় ঢুকে তার বুকে ছুরি বসিয়েছে। আধ ঘুমন্ত পাহারা-অলা ওর সেই মূর্তি দেখে পালিয়ে গেল। বাবুটি তখন নেশা করে ঘুমোচ্ছিল। সে ঘুম আর তার ভাঙেনি। সেই রাতেই ভীমবাহাদুর

তার ভালবাসার মেয়েকে নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে।

বাপী মুখ বুজে চলেছে। কিন্তু ভিতরে নাড়াচাড়া পড়ল একপ্রস্থ। দক্ষিণ কলকাতার কোনো এলাকার সাতাশি নম্বর বাড়ির উল্টো দিকের দোতলা বারান্দার সোনালি চশমা রাঙামুখো একজনের কলজে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবার সুযোগ পেলে তার নিজের হাত একটুও কাঁপত কি? নাকি রাতের অন্ধকারে খুপরি ঘরে ঢুকে রতন বনিক তার বউ কমলা বনিকের আর বাপী-নামে এক বেইমানের বুকে ওমনি ছুরি বসিয়ে গেলে খুব অন্যায় হত?

কথায় কথায় আরো কিছু খবর জানালো আবু রব্বানী।...ওর বাবা কালু তিন বছর আগে মারা গেছে। শেষের দিকে ছেলের ওপরেও তার অভিমান, যেন ওকে হটিয়ে ছেলে তার জায়গাটা জুড়ে বসেছে। অথচ শেষ সময় পর্যন্ত আবু তাকে নেশার জিনিস জুগিয়ে এসেছে—শহর থেকে সেরা জিনিস এনেও খাইয়েছে। আর গেল বছর রেশমার মরদ কাঁদনাও মাটি নিয়েছে। ওর আর পেট বলে কিছু ছিল না, হেজে পচে গেছল। ও মরে বেঁচেছে, রেশমারও নিষ্কৃতি।

বাপী জিগ্যেস করল, রেশমা একাই সাপ খেলা দেখাচ্ছে এখন?

—ছোঃ! তার থেকে ঢের ঝাঁঝের খেলা দেখাচ্ছে। আবু হাসতে লাগল, রেশমা আর সে রেশমা নেই, বুঝলে? এখন বুকের পাটা কত, বিষাক্ত সাপগুলোর খপাখপ টুঁটি টিপে ধরা দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে।

বাপী ভেবে নিল সাপ ধরে রেশমা এখন অন্য সাপুড়েদের কাছে বেচে দেয়। আবুর কথায় আর হাব-ভাবে কিছু রসের ছোঁয়া থাকলেও বাপী আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ চলতে লাগল। রস চুলোয় যাক।

আবু হঠাৎ উৎসুক চোখে ঘাড় বেঁকিয়ে ওকে দেখে নিল।—আগে তোমার কথা শুনি বাপীভাই, অ্যাদ্দিন ছিলে কোথায়?

—কলকাতায়।

—চাকরির চেষ্টায়?

—মাস কয়েক যুদ্ধের আপিসে টেম্পোরারি চাকরি করেছি।

—তারপর বেকার বসে ছিলে?

বাপী মাথা নাড়ল। তাই। এ নিয়েও কথা বাড়াতে চায় না। কিন্তু আবু খুশিতে ডগমগ।—খোদার খেল দেখো, তার মরজি না হলে টান পড়ে না—এখানে কাজই উল্টে তোমার জন্যে হাঁ করে আছে! আমি কতদিন

তোমার কথা ভেবেছি, দুলারিকেও বলেছি, এ-সময় বাপীভাই এখানে থাকলে জমত ভালো—নেপালী মেমসাহেবকে ওই বাড়িটা দেবার সময় তোমার কথা তো খুব হত—

আবু রব্বানী এ ক'বছরে আরো কত চতুর হয়েছে বাপীর ধারণা নেই। বাড়িটা হাতছাড়া হয়েছে বলে এমন আশার কথা শোনাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। বাপী ভিতরে উৎসুক একটু, বাইরে প্রায় নির্লিপ্ত।—কি কাজ, চাকরি-টাকরি?

—চাকরি করলে চাকরি, নয়তো চুক্তিতে রফা হলে চুক্তি—ধৈর্য ধরে সব দেখেশুনে যা তুমি ভালো বুঝবে। বললাম না পয়সার ছড়াছড়ি এখানে। মাথা খাটাও, দিল লাগাও আর কড়ি তোলো। তোমার মতো ভদ্দরলোকের চামড়া গায়ে থাকলে আর বিদ্যের জোর থাকলে এই আবু রব্বানীকে আজ দেখতে হত! নেপালী মেমসাহেবের ওই প্যাঁচামুখো লাটসাহেবকেই লাট খাইয়ে দিতাম না!

এও দুর্বোধ্য। তবে নেপালী মেমসাহেব যে ওর স্বার্থের কোনো বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে, এটুকু স্পষ্ট।

আবু আর একবার ঘাড় ফেরালো, তারপর বলল, তুমি একটু বদলে গেছ বাপীভাই···

—কেন?

—আগে আমার সব ব্যাপারে তোমার কত আগ্রহ ছিল, উৎসাহ ছিল—প্রায় ছ'বছর বাদে দেখা, আর তুমি যেন আমার কাছ থেকে ছ'হাত দূরে দূরে হাঁটছ।

আবু চালাক বলেই একটু ঘুরিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করল। নইলে সাদাসাপটা বলে বসত, আগে তো আমার চেলাটি ছিলে, আমাকে গুরু ঠাওরাতে—এখন সে-রকম দেখছি না। বাপী হাসল একটু, জবাব দিল, আধ-হাত দূর দিয়েও তো হাঁটছি না।

হঠাৎ আগের মতোই সন্ধানী চাউনি আবুর। কথার ধরনও তেমনি চাঁছাছোলা—সাহেব বাংলোর তোমার সেই মহারাণীর মেয়ের খবর কি, আর দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে?

আবুর সঙ্গে দেখা হলে এ-কথা উঠবে জানত। আর যতটা সম্ভব নির্লিপ্ত মুখে এ-প্রসঙ্গ ধামা-চাপা দেবার চেষ্টাই করবে ভেবে রেখেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে আবুকে আগের মতো সেই কাছের মানুষ মনে হতে বুকের তলায়

মোচড় পড়ল। জবাব না দিয়ে একবার তাকালো শুধু।

আবু লক্ষ্য করছে। উৎসুকও।—দেখা হয়েছে তাহলে! কেমন এখন? বহুত খুবসুরৎ?

—ভালোই।

খপ করে শিকার ধরে তোলার মতো চকচক করছে আবুর দু চোখ।—কত দিন আগে দেখা হয়েছে?

বাপী কি হঠাৎ জোর গলায় ওকে ধমক লাগাবে একটা? পারা গেল না। বিড়বিড় করে বলল, বেশি দিন নয়।

যন্ত্রণার আঁচ আবু কতটা পেল সে-ই জানে। সব ঝেড়ে ফেলার মতো করে বলল, গুলী মেরে দাও বাপীভাই, আমি তো সেই কবেই বলে রেখেছিলাম ও-মেয়ে বেশি দিন বাপ-মায়ের সিন্দুকে বসে থাকবে না। যেতে দাও—নিজের দুটো পায়ের ওপর শক্ত করে দাঁড়ালে অমন কত হুরী-পরী এসে গড়াগড়ি খাবে!

বাপী সন্তর্পণে বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা। আবু ধরে নিয়েছে মিষ্টি অন্যের হেপাজতে চলেই গেছে আর সেই মনস্তাপেই কলকাতা ছেড়ে ও আজ বানারজুলিতে। একেবারে সত্যি না হলেও কত আর ভুল···।

ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আবুর আর এক মূর্তি। ঘরে ঢুকল না তো একখানা দুরন্ত খুশির ঢেউ আছড়ে পড়ল যেন। হাতের লাঠি একদিকে ছুঁড়ে ফেলল। সাড়ে তিন বছরের ছেলেটা ছুটে এসে, তার সাধ্যমতো একটা লাফ দিয়ে দু-হাতে বাপের কোমর জড়িয়ে ধরে ঝুলতে লাগল। ওদিকে দুলারির কোলের আট-ন'মাসের ছেলেটাও দু-হাত তুলে বাপের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ব্যগ্র। হাত বাড়িয়ে আবু আগে ওকে নিয়ে লোফালুফি খেলল খানিক। ছেলেটার ভয়-ডর নেই, খিক-খিক হাসি। তারপর একটু দূর থেকেই ওটাকে মায়ের কোলে ছুঁড়ে দিয়ে আবু বড়টার সঙ্গে ছোটাছুটি আর মেকি মারামারি ঘুষোঘুষি শুরু করে দিল। বাপীকে বলল, কালে দিনে এ দুটো আমার থেকেও কড়া অ্যালসেসিয়ান হয়ে উঠবে দেখে নিও—

ছেলেটাকে উসকে দেবার জন্য আবু একটু জোরেই ঘা বসাচ্ছে এক-একবার, আর ওটা দ্বিগুণ গোঁ-ভরে বাপের ওপর চড়াও হচ্ছে। দুলারির তামাটে মুখ প্রসন্ন, কিন্তু ধমকেই উঠল, আঃ থামবে? বাপীভাই যে কাণ্ড দেখে হাঁ হয়ে গেল!

মায়ের ধমকেই ছেলের দৌরাত্ম্য থামল। কি মনে পড়তে আবুর হাসিমুখ

বিপরীত গাম্ভীর্যে ঘোরালো করে তোলার চেষ্টা। গলায় কপট শ্লেষ মিশিয়ে বলল, রেশমাব বদলে তোমাকে আমার ঘরে দেখে বাপীভাই তার থেকে ঢের বেশি হাঁ হয়েছে—বুঝলে? আমি রেশমার জন্য পাগলা হয়ে গেছলাম দেখে গেছে আর আজ ঘরে এসে দেখে বিবি বদল।

তুলারি হাসছে না ঠিক, তামাটে মুখে হাসির আভা ছড়াচ্ছে। বলল, বাপীভাইয়ের তখন চোখ কানা ছিল বোধ হয়।

আবু হা-হা শব্দে হেসে উঠল। হাসছে বাপীও। আর মনে মনে সায় দিচ্ছে, কানা যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আবু বলল, দুজনেরই খিদে পেয়ে গেছে, কি আছে জলদি দাও—বাপীভাইকে নিয়ে এরপর আবার নেপালী মেমসাহেবের কাছে যেতে হবে।

সুপটু গৃহিণীর মতো পাঁচ মিনিটের মধ্যে একরাশ জলখাবার নিয়ে দুলারি হাজির। বাপী আসবে ধরেই নিয়েছিল বোধ হয়। খুশি মুখে আবু টিপ্পনী কাটল, এত সব আজ তোমার খাতিরে, আমার অত জোটে না।

দুলারিরও সমান জবাব।—বেইমানি কথা শুনলে জিভে গরম ছেঁকা লাগাব।

আবু সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকালো।—আমার জিভে ছেঁকা লাগালে আখেরে কে পস্তাবে?

সাপুড়ে মেয়ের তামাটে মুখে শরমের রং। কটাক্ষের চাবুক হেনে চটপট সরে গেল। আবু হাসতে লাগল।

বাপী সুখের ঘর দেখছে।

জলখাবারের পাট শেষ হতে আবু আয়েস করে বিড়ি ধরালো একটা। বাপীকে বলল, সিগারেটও আছে—চলে?

বাপী মাথা নাড়ল, চলে না। নিজের বাড়ির খবর জানার তাগিদ। জিগ্যেস করল, নেপালী মেমসায়েবের কাছে যাবে এখন?

—যাব'খন। হাসল।—ওই ঠাকরোনটির কাছে যেতে হলে এমনিতেই বেশ করে দম নিয়ে যেতে হয়—তার ওপর আজ বাড়ির মালিককে দেখে ক্ষেপেই আছে কিনা কে জানে।

—কেন?

—কেন আর, নতুন ঘর তুলে তোমার বাড়ির ও-রকম ভোল পাল্টাতে একক্াঁড়ি টাকা খরচ হয়েছে—আমাকে হিসেব দেবে বলছিল।·· লাইট-ফাইট

জল-কলসুদ্ধু কম করে পাঁচ হাজার হবে—সে বাজার কি আর আছে!

বাপীর হু'কান খাড়া। বাড়ির দায় ওর ওপরেই ছেড়ে দিয়ে গেছল। ভাড়া আর বিক্রীর দুটো পরোয়ানা ওকেই লিখে দিয়েছিল। বেচে যে দেয় নি সেটা আবু আগেই বলেছে। আবার ভাড়া নিয়েও কি প্যাঁচ-ঘোঁচের ব্যাপার আছে বলছিল। কি শর্তে নেপালী মেমসাহেব ওই বাড়ির পিছনে অত টাকা ঢেলেছে আবু এখন পর্যন্ত সেটাই বলে নি।

সে বাড়ির মালিক শুনে মহিলা থমকেছিল বেশ, বাপীর মনে আছে। জিজ্ঞেস করল, তা আমাকে দেখে ক্ষেপবে কেন?

হাতের বিড়িটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলল আবু রব্বানী।—মেমসাহেব জানে বাড়ির মালিক বে-পাত্তা। কোন দিন ফিরবে কি ফিরবে না তারও ঠিক নেই। আর জানে, আমি বাড়ির জিম্মাদার, আমি সবে-সর্বা—তাই নিশ্চিন্ত মনে ঘর তুলেছে আর বাড়ি সাজিয়েছে—আমার সঙ্গে এখন পর্যন্ত সইসাবুদটা পর্যন্ত হয়নি, এর মধ্যে খোদ মালিক হাজির দেখলে কি আহ্লাদে আটখানা হবে?

বাপী ভিতরে ভিতরে স্বস্তি বোধ করল একটু।—বাড়ির ব্যাপারে এত সব তোমার পারমিশন নিয়ে করা হয়েছে?

—হুঁঃ, সেই মেয়ে! পারমিশন-টারমিশনের ধার ধারে না, তাঁর মর্জি-মাফিক কাজ—ম্যানেজারকে দিয়ে তোমার বাড়ির খোল-নলচে পাল্টানোর পর চুক্তির কথা তুলেছে—আমিও মওকা পেয়ে চুপ মেরে ছিলাম—

—নেপালী মেমসাহেবের আবার ম্যানেজারও আছে নাকি?

—নেই আবার—হেঁজিপেঁজি মেয়েমানুষ নাকি! সে শালাই তো তার প্যাঁচামুখো লাটসায়েব।

জঙ্গল ভেঙে ঘরে ফেরার পথে আবু বলেছিল বটে বিদ্যেবুদ্ধির জোর থাকলে নেপালী মেমসাহেবের কোন্ প্যাঁচামুখো লাটসায়েবকে লাট খাইয়ে দিত।

বাড়ি আর চুক্তির ব্যাপারটা বাপী আর একটু বিশদ করে শুনে নিল। গায়ত্রী রাই পাশের জমিসুদ্ধু বাড়িটা কিনেই নিতে চেয়েছিল। যুদ্ধের পর জায়গা-জমির দাম এ-দিকেও হু-হু করে বাড়ছে দেখে আবু রাজি হয় নি। তাছাড়া দোস্তের পৈতৃক ভিটের ওপর তারও কম মায়া নয়। গরজের দায়ে গায়ত্রী রাই চড়া দামের লোভ দেখিয়ে চাপাচাপি করছিল। মিনমিন করে আবু তখন একটা মিথ্যে কথাই বলেছে। ও বাড়ির জিম্মাদার ইচ্ছে করলে ভাড়া দিতে পারে, বেচতে-টেচতে পারে না।

গায়ত্রী রাইয়ের দাপটের ম্যানেজারের নাম রণজিৎ চালিহা। আসামের মানুষ। ধরাকে সরা ভাবে। বাড়ির মালিক পাঁচ বছর যাবৎ নিখোঁজ, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে ওটা জবরদখলের মতলব দিয়েছিল মেমসায়েবকে। বলেছিল, সব নিজের ভেবে তুমি যা-খুশি করে নাও, কেউ দাবি ফলাতে এলে আমি আছি। কিন্তু গায়ত্রী রাই যত জাঁদরেল মেয়েমানুষই হোক, অমন কাঁচা ঠকবাজি পছন্দ করে না। তাছাড়া বেগতিক দেখে মেমসায়েবের কাছে আবু বাপীর মরা বাপকে এই জঙ্গলের অফিসার বানিয়ে দিয়েছিল। বলেছে, এখানকার সরকারী ছোট অফিসার ছিলেন ভদ্রলোক—আর মস্ত ধার্মিক মানুষ ছিলেন, সকলে তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত। তাঁর ছেলের সঙ্গে এ-রকম করাটা ঠিক হবে না, তাছাড়া বাড়ির দলিলপত্র মালিকের কাছে আছে—নিখোঁজ হলেও সে সব তো আর হাতছাড়া হয় নি।

গায়ত্রী রাই হাঁ-না কিছুই বলেনি। কারো উপদেশ বরদাস্ত করার মেয়ে নয়। আবুকে ধমকে যে ওঠেনি তাতেই বোঝা গেছে বড়দরের অন্যায় কিছু করবে না। বাড়ির ভোল বদলানোর পর আবুর ডাক পড়েছে। গায়ত্রী রাই জানিয়েছে সব ঠিক-ঠাক করে নিতে পাঁচ হাজার টাকার মতো খরচ পড়েছে। হিসেব তার ম্যানেজারের কাছে আছে। এ-টাকাটা ভাড়ার টাকা থেকে কাটান যাবে—সব শোধ হলে তবে মাসের ভাড়া হাতে আসবে।

এই মওকা ছাড়ার পাত্র কি আবু রব্বানী? ভিজে বেড়ালের মতো মুখ করে ভাড়ার ফয়সলায় নেমেছে। শুধু বসতবাড়ি তো নয়, বাড়তি ঘরখানা তোলা হয়েছে ব্যবসার কাজে লাগানোর জন্য। তাছাড়া যুদ্ধের সময় থেকে এই বানারজুলিতেও সেলামীর ভূত নেমেছে—ইজেরাদার ঠিকেদারদের কল্যাণে এখন একখানা ঘর পেতে হলে আগে নজরানা গুণে দিতে হয়। আবুর বরাত ভালো ম্যানেজার তখন ট্যুরে। গায়ত্রী রাইয়ের পায়ের কাছে বসে অনেক কথা নিবেদনের সুযোগ পেয়ে গেছল। যেমন বাড়ির মালিক বাপী তরফদার তার প্রাণের দোস্ত—আর তার বাপের দয়াতে ওর এখানকার জঙ্গলের চাকরি, সেই দোস্ত ফিরে এসে যদি ওকে বেইমান ভাবে তাহলে খোদার বজ্র ওর মাথায় নেমে আসবে। তাই বাড়ির ব্যাপারে আবুর মুখ না চেয়ে হকের ফয়সলাই করতে হবে—কারণ, পাঁচ হাজার ভাড়া থেকে কাটান গেলে এখন যা হয়েছে তার সবটাই তো বাড়ির মালিকের। তাই পাঁচ হাজার থেকে প্রথমেই হাজার টাকা সেলামী বাবদ কাটান যাবে। আর একশ টাকার নিচে এই দিনে এরকম বাড়ির ভাড়া তো হতেই পারে না।

কলে পড়লে নেপালী মেমসাহেবের দরাজ হাত। এ নিয়ে খুব একটা ঝকাঝকি করেনি। সেও আবু রব্বানীকে সেয়ানা জানে কিন্তু বেইমান ভাবে না। ভাববেই বা কেন, আবু তাকে বলেছে, সেলামী বাদ দিয়ে বাকি চার হাজার টাকা থেকে একশ টাকা করে কাটান দেবার চুক্তি সে-ই করবে—ততদিনে বাড়ির মালিকের দেখা নিশ্চয় মিলবে, আর না যদি মেলে তো মেমসায়েব যেন তার পরের টাকা বানারহাটের সরকারী দপ্তরে বাড়ির মালিকের নামে চেকে জমা করে দেন। ও তো আর হাত পেতে একটি পয়সাও নিচ্ছে না!

হাজার টাকা সেলামী আর একশ টাকা ভাড়া শুনে ম্যানেজার রণজিৎ চালিহা নাকি আবুকে ধরে এই মারে তো সেই মারে। কিন্তু গায়ত্রী রাইয়ের জবান খসলে পাকা ব্যাপার। তাঁর কথামতো কাগজপত্র তৈরি। কিন্তু হচ্ছে হবে করে এই চার মাসেও সইসাবুদের ফুরসৎ মেলেনি। ম্যানেজার মাসের অর্ধেক সময় বাইরে বাইরে ঘোরে, নেপালী মেমসায়েবও হুট হুট করে তার পাহাড়ের বাড়িতে চলে যায়। আর দুজনেই যখন এখানে তখন এত কাজের চাপ আর এত রকমের প্ল্যান-প্রোগ্রাম হিসেব-নিকেশ যে এই সামান্য ব্যাপারটা হয়তো মনেই থাকে না।

এবারে তিন নম্বর বিড়িটা আবু বাইরে ছুঁড়ে ফেলে হিসেব দাখিল করল, খরচের মোট পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে হাজার টাকা সেলামী বাদ দিলে থাকল চার হাজার। তার থেকে গত চার মাসের চারশ টাকা ভাড়া আর তার আগের চার মাসে পঞ্চাশ টাকা করে ধরে মোট ছ'শ টাকা তোমার শোধ হয়েই গেছে। হেসে উঠল, হাঁ হয়ে গেলে যে—মওকা পেয়ে আবু রব্বানী দোস্তের ভালো করেছে কি খারাপ করেছে?

বাড়ির ব্যাপারে বাপী অন্যরকম ভাবছিল বলে নিজেরই খারাপ লাগছে। বলল, এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে—

আবু এতেই খুশি। দুনিয়ার অনেকখানি হাতের মুঠোয় এমনি সুরে বলে উঠল, ভালোর এখনো ঢের বাকি, সবে এলে, এখন তোমার আমার দু মাথা এক হলে কি যে হবে দেখো!

ওকে পেয়ে আবুর মাথায় কিছু মতলব গজিয়েছে আগেই সেটা বোঝা গেছে। ঘরে আসার পথে ওর মুখে ফুর্তি উপচে পড়ছিল। কলকাতায় বাপী বেকার বসেছিল শুনে বলেছিল, 'খোদার মর্জি না হলে টান পড়ে না—এখানে কাজই উল্টে তার জন্যে হাঁ করে আছে। দুলারিকেও নাকি কত সময় বলেছে, এ সময় বাপীভাই এখানে থাকলে জমত ভালো।...আর বলছিল, পয়সার

ছড়াছড়ি এখন এখানে—মাথা খাটাও, দিল্ লাগাও আর কড়ি তোলো। ওকে পেয়ে আবুর মাথা খাটানো দিল্ লাগানোর জোর আর কড়ি তোলার আশা অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু এ-দিকটা বাপীর কাছে দুর্বোধ্য এখনো।

আবু রব্বানীর জিভের লাগাম আরো ঢিলে এরপর। খুশি-ঝরা দু চোখ বাপীর মুখের ওপর। দেখছে কিছু। তরল গলায় বলল, তোমার মুখখানা এখন আগের থেকে ঢের মিষ্টি লাগছে বাপীভাই—দেখলেই মনে হয় ভেতর-বার সাফ—নেপালী মেমসাহেবের ঠিক পছন্দ হয়ে যাবে।

শোনার-কান খাড়া, বাপী হাল্কা সুরে ইন্ধন জোগালো, কেন—মেয়ের জন্য পাত্রটাত্র খুঁজছে!

রসের কথায় আবু আর চাঁচাছোলা মানুষ নয় আগের মতো। হেসে উঠে জবাব দিল, মেয়ের জন্য কেন, নিজের জন্যেই খুঁজছে—ঠাকরোন বিধবা জানো তো?

নেপালিনীদের কী দেখে সধবা বিধবা বোঝা যেতে পারে বাপীর ধারণা নেই। পাত্র খোঁজার রহস্যটা আবু আর একটু বিস্তার করল। নিজের কাজের জন্যেই খুব একজন বিশ্বাসী আর লেখাপড়া জানা চৌকস লোক খুঁজছে নাকি গায়ত্রী রাই। ম্যানেজারের অনুপস্থিতিতে চা-বাগান থেকে দুবার দুটো ভদ্রলোক ছেলেকে এনে কাজে বহাল করেছিল। দুজনেই তারা চা-বাগানের কেরানী। চা-বাগানের কর্তাব্যক্তিরা গায়ত্রী রাইকে চোখে বড় দেখে না কিন্তু মানে-গনে খুব। দরকার শুনে তারাই দুবার দুজনকে লম্বা ছুটি দিয়ে আর বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে মহিলার যাচাইয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু একজনও টিঁকে যেতে পারে নি। গায়ত্রী রায় দুজনকেই ছেঁটে দিয়ে চা-বাগানে ফেরত পাঠিয়েছে। আবুর মতে ওই দুজনের একজন অন্তত বেশ শিক্ষিত আর চালাক-চতুর, আবু ধরে নিয়েছিল সেই লোকটা টিঁকেই যাবে। রসের ছোঁয়া পেলে আবুর এক চোখ এখনো একটু ছোট হয়ে যায়। মুচকি হেসে বলল, আমার ধারণা ওই লোকটার ঘাড়ে ঠাকরোনের খাঁড়া নেমেছে অন্য কারণে, নইলে কাজকর্ম ভালই করছিল, আর পরে ম্যানেজারও তাকে ভালো চোখেই দেখছিল।

মুখ দেখে বোঝা না গেলেও রস-টস কানে নেবার মন নয় বাপীর। সাদাসিধে ভাবেই জিগ্যেস করল, আমার মুখ দেখে আর ভেতর-বার সাফ ভেবে তোমার নেপালী মেমসাহেব এখন আমাকে সে জায়গায় নিয়ে নেবে ভাবছ?

—নিশ্চয় নেবে। আবুর গলার জোর বাড়ল।—একে তোমার বাড়ির সে ভাড়াটে, তার ওপর ওই বাড়ির ব্যাপারেই তোমার সম্পর্কে আমি একরাশ গুণ গেয়ে রেখেছি না! যেমন লোকই হই, ঠাকরোন আমাকে দারুণ বিশ্বাস করে—লেখাপড়া জানা একজন ভালো অথচ চালাক-চতুর মানুষ তার খুব দরকার এ কথা নিজে আমাকে ব'লছে। চাকরি না পোষায় চুক্তিতে কাজ করতে পারো, তবে আটঘাট সব বুঝে নিয়ে মেমসাহেবের গলায় দাঁত বসাতে হলে চাকরিতে লেগে যাওয়াই ভালো। হেসে উঠল, ভেবো না, দাঁত বসানোর মওকা আমিই করে দেব—

বাপীর চোখে বা মুখে উৎসাহের চিহ্ন নেই। ওর মিষ্টি মুখের ছলনার ওপর আবু কিছুটা নির্ভর করছে মনে হতে খারাপই লাগল। বলল, আমার ভেতর-বার সাফ ভেবে নেপালী মেমসাহেবের পছন্দ হলে তোমার কি লাভ—ভাঁওতাবাজীর ব্যাপার কিছু?

এবারে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল আবু রব্বানী। মেজাজী পুরুষ।—দেখো বাপীভাই, আমি লোক যেমনই হই আর যা-ই করি নিজেকে খোদার গোলাম ভাবি। তুমি লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের ছেলে, আমার দোস্ত—তোমাকে নোংরামির মধ্যে যেতে বলব কেন, আর তুমিই বা তা বরদাস্ত করবে কেন? তোমাকে ওই মেমসাহেবের সঙ্গে জুড়ে দিতে চাই কেরামতি দেখিয়ে একদিন ওই চালিয়াৎ ম্যানেজারকে টিট করার জন্য, আর আমাদের ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা ঠিক-ঠিক পাইয়ে দেবার জন্য। এরই নাম দাঁত বসানো, নইলে তো ওই আধবয়সী মেয়েমানুষের বদলে তার মেয়েকেই দেখিয়ে দিতাম!

উষ্মার মুখেই হেসে ফেলল আবার।—খবরদার, মেয়ের দিকে তাকিয়েছ কি কেস গড়বড়—এ-ব্যাপারে মা-টি যাকে বলে বাঘিনী। মেয়ের পিছনে ছোঁকছোক করতে দেখেই চা-বাগানের সেই চৌকস লোকটিকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়েছিল।

ঘরে বাতাসের অভাব, না বুকে? দুনিয়ায় কি এমন জায়গা নেই যেখানে মেয়ে নেই? বাপী বিড়বিড় করে বলল, মেয়ের কথায় কাজ নেই, মায়ের কথা বলো।

গায়ত্রী রাইয়ের মেজাজ বা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বাপীর মিনিট কয়েকের পরিচয়। একটা উটকো মানুষ অন্দরে ঢুকে পড়ছে ভেবে তার ঝাঁঝ দেখে আর ঝাপটা খেয়ে চলে এসেছিল। ওটুকু দিয়ে মহিলার বিচার সম্ভব নয়। তবু বাপীর মনে হয়েছিল তার রমণীসুলভ কোমলতার দিকটায় কিছু ঘাটতি আছে।

কিন্তু আবুর প্রগল্ভ বিস্তারের সার থেকে ওই রমণীর যে ছবিটা পেল তেমনটি হাজার গণ্ডা মেয়েছেলের মধ্যে একজনকেও দেখা যাবে কিনা সন্দেহ।

...বানারজুলির এই জঙ্গল ভারত সীমার মধ্যে। কিন্তু জঙ্গলের পরিধি ভুটান পর্যন্ত জুড়ে আছে। ভুটান স্বাধীন। এখান থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে সেই স্বাধীন ভুটানের বাসিন্দা গায়ত্রী রাই।

সেখানে একটা ছোট্ট পাহাড়ের মাথায় তার নিজস্ব বাড়ি। বাড়িটা করেছিল তার স্বামী বীরেশ্বর রাই। হিমালয়ের নিচের দিকে অমন ছোট ছোট অজস্র পাহাড় আছে। যারা অবস্থাপন্ন তারা নামমাত্র টাকায় সেই সব পাহাড় ইজারা নিয়ে তার ওপর ঘরবাড়ি তোলে। বীরেশ্বর রাই টাকার মুখ দেখার পরেই পাহাড়ের ওই বাড়ি করেছিল, কিন্তু সেই বাড়ির চেহারা এখন যা দাঁড়িয়েছে তার বারো আনা গায়ত্রী রাইয়ের কৃতিত্ব। সে-এলাকায় অমন বাড়ি এখন খুব বেশি নেই। পাহাড়ের সেই বাড়িতে আবু বার কয়েক গেছে। গায়ত্রী রাইয়ের হুকুমে তার কাজ নিয়েই যেতে হয়েছে। গায়ত্রী রাইয়ের নিজের ভ্যান আছে একটা। স্বামীর আমলে জিপ ছিল। সেই জিপ বেচে দেওয়া হয়েছে। এখন ভ্যানেই যাতায়াত চলে।

আবুর যাতায়াত ভ্যানেই। ভ্যানে পাহাড়ের তলা থেকে উঠে একেবারে পাহাড়ের ডগায় বাংলোর কম্পাউণ্ডে পৌঁছে যেতে পারে। তলা থেকে লাল কাঁকরের রাস্তা পাহাড়টাকে পেঁচিয়ে ওপরে উঠে গেছে। গায়ত্রী রাইয়ের স্বামীর আমলে রাস্তাটা ভাল ছিল না। সেই রাস্তার সংস্কারও গায়ত্রী রাই করিয়েছে আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খোলা দিকে অর্থাৎ পাহাড়ের দেয়ালের উল্টো দিকে তারের বেড়া লাগিয়েছে।

কারণ তিন বছর আগে কিছুটা স্বামীর দোষে আর কিছুটা বা ওই রাস্তার দোষে গায়ত্রী রাইয়ের কপাল ভেঙেছিল। আবু রব্বানীর অবশ্য ধারণা সেই থেকে নেপালী মেমসাহেবের কপাল খুলে গেছে।

গায়ত্রী রাইয়ের ওই পাহাড়ের ঘরবাড়ি দেখার জন্য একজন লোক আর একটা মালী আছে। আর সেখানে তার পেশার কাজে সাত-আটজন নানা জাতের পাহাড়ী লোক বহাল আছে। এদের সকলের মাথার ওপর যে তার নাম ঝগড়ু। দেশ বিহারে। কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে এদিকের জঙ্গলে আর পাহাড়ে বাস। তার বউ বুনো হাতির পায়ের তলায় চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে মরেছে। দু-দুটো জোয়ান ছেলের একটাকে সাপে কেটেছে আর একটাকে

ভালুকে মেরেছে। কিন্তু আবু সে-জন্যে লোকটার বড় রকমের শোক-পরিতাপ কিছু দেখে নি। কেবল সাপের গলা টিপে বিষ নিঙড়ে বার করার সময় তার চোখ দুটো সাপের থেকেও বেশি জলতে দেখে, আর ভালুক শিকারের গন্ধ পেলে এই বয়সেও যে অস্ত্র সামনে পায় হাতে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসে। এই বয়সে বলতে লোকটার বয়স এখন সত্তরের কাছাকাছি। এখনো পাথরে কোঁদা মজবুত শরীর। বীরেশ্বর রাইয়ের ব্যবসার শুরু থেকে তার সঙ্গে আছে। এখন তো মেমসাহেব না থাকলে ও-ই পাহাড়ের বাড়ির সর্বেসর্বা।

বয়েসের অনেক ফারাক সত্ত্বেও এই ঝগড়ুর সঙ্গে আবুর গলায় গলায় ভাব এখন। ভাব দু-তিন কারণে। স্বয়ং কর্ত্রীর যে বিশ্বাসের পাত্র ঝগড়ুর কাছে তার কদর বেশি। তা ইদানীং তো কর্ত্রীর অনেক রকমের জরুরী কাজে আবুর ডাক পড়ে। সে হেড বীটম্যান হবার পর মেমসাহেবের আয়-পয় আরও বেড়েছে। দ্বিতীয় কারণ, আবুকে সত্যিকারের মরদ ভাবে ঝগড়ু। পাহাড় থেকে নেমে এ-পর্যন্ত তিনটে ভালুক শিকার করেছে ওরা। আবুর বন্দুক আছে এখন, কিন্তু বন্দুক দিয়ে শিকার করাটা কি এমন মরদের কাজ। দুজনে মাথা খাটিয়ে জাঁদরেল ভালুককে নাজেহাল করে হাতের অস্ত্র দিয়ে ঘায়েল করতে পারলে তবে তো কথা। তাই করেছে। আর সে-সময় আবুর সাহস আর বুদ্ধি-বিবেচনা দেখে ঝগড়ুর তাক লেগে গেছে।

গলায় গলায় ভাবের তৃতীয় কারণ—কারণ। অর্থাৎ সরাব। ভুটানে এই জিনিসটি অঢেল। বাজারে অনেক রকমের শস্তার মাল মেলে। আবার দামী বিলিতি জিনিসও এন্তার পাচার হয়ে আসে। দামী হলেও অন্য জায়গার তুলনায় ঢের শস্তা। কিন্তু গরিব মানুষ ঝগড়ুকে কম পয়সার দিশী মালই গিলতে হয়। অথচ সে বিলিতি বা দামী সরাবের ভক্ত। গন্ধ পেলে জিভে জল গড়ায়। ভাল জিনিসের স্বাদ জেনেছিল মনিব অর্থাৎ বীরেশ্বর রাই বেঁচে থাকতে। তখন দিশী জিনিসের দিকে ফিরেও তাকাত না ঝগড়ু। মনিবটি একদিকে যেমন দিলদরিয়া মানুষ ছিল, অন্যদিকে তেমনি সরাব-রসিক ছিল। কত রকমের দামী মাল ঘরে মজুত রাখা হত তখন। সাহেব দরাজ হাতে তার ভক্তকে প্রসাদ দিত—সিকি বোতল আধ-বোতল যা অবশিষ্ট থাকত ঝগড়ুর ভোগে আসত। ঝগড়ুর সেই সব সুখের দিন গেছে। ভাল জিনিস আর মেলেই না। কর্ত্রী ঘরে থাকলে এখন কত লুকিয়ে-চুরিয়ে আর মেহনত করে তাকে একটু-আধটু দিশী মাল খেতে হয়। টের পেলে এত পুরনো খাতিরের লোককেও ওই মনিবানি খাতির করবে না। যা-ই হোক, মেমসাহেবের

ফরমাশ মত আবু পাহাড়ে গেলে বেশি দামের ভাল মালই ঝগড়ুকে খাওয়ায়। এরই ফলে দোস্তি জমজমাট। সেই দিলখুস নেশার সময় ঝগড়ুর মুখ থেকে এই পরিবারের নাড়িনক্ষত্র জেনেছে আবু রব্বানী।

ওষুধের বনজ কাঁচা মাল সরবরাহের ব্যবসা ফেঁপে উঠেছিল বীরেশ্বর রাইয়ের। অ্যালোপ্যাথী, কবিরাজি আর হোমিওপ্যাথী ওষুধের কারখানায় যে-সব শিকড়-বাকড় লতাপাতা বীজ ফলমূল গাছগাছালির বিশেষ চাহিদা। আশপাশের হেকিম ওঝা হাতুড়ে বদ্যিরাও এ-সবের খদ্দের। ভেষজগুণের দামী আর দুষ্প্রাপ্য মাল সংগ্রহের দিকে বেশি ঝোঁক ছিল বীরেশ্বর রাইয়ের। এ ব্যাপারে দারুণ পরিশ্রমী ছিল নাকি মানুষটা। নিজে পড়াশুনা করত, ওষুধের গাছ-গাছড়া লতাপাতা চেনে এমন লোকদের খুঁজে বার করত, তাদের নিয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। এই করে ওষুধের গাছ যোগাড় করা আর চাষ করার একটা দলই তৈরি করে ফেলেছিল। তারা এখনো আছে, নতুন লোককেও শেখাচ্ছে। পাহাড় আর জঙ্গলের মানুষেরা বেশির ভাগই ভীষণ গরিব। পয়সার মুখ দেখলে তাদের উৎসাহের অভাব হয় না, জঙ্গলের বাঘ-ভালুকেরও পরোয়া করে না। ওষুধের গাছ, লতাপাতা, বীজ, দানা চেনার ব্যাপারে সব থেকে চৌকস হয়ে উঠেছিল ওই ঝগড়ু। মনিব এ-জন্যে ওকে সব থেকে বেশি ভালবাসত। বয়েস হয়েছে, এখন আর যোগাড়ের কাজে বেরোয় না। পাহাড়ের বাংলোর পিছন দিকে কিছু দামী ওষুধ গাছের চাষের বাগান আছে, সেটা দেখাশুনা করে আর অন্য লোকদের তালিম দেয়।

বীরেশ্বর রাইয়ের এই সব বনজ কাঁচা মালের পসরা ভুটান সিকিম ছেড়ে আসাম আর উত্তর বাংলার দিকেও ছড়িয়ে গেছল। ও-সব দিকে তখনও কবিরাজি চিকিৎসার প্রাধান্য। অশিক্ষিত বা গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষেরা আগে হেকিম বা কবিরাজের কাছে ছুটত। ফলে ছোট-বড় কবিরাজি ওষুধ তৈরির কারখানাও গজিয়ে উঠছিল। তা ছাড়া ছোট-বড় কবিরাজেরা নিজেরা তো ওষুধ তৈরি করেই। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য দফায় দফায় লম্বা টুরে বেরুতো বীরেশ্বর রাই। ফলে সুনাম আর তার কাঁচা মালের কদর দুই-ই বেড়েছে।

এই ব্যবসা সামনে রেখে কাঁচা টাকা রোজগারের আর একটা দিকও হাতের মুঠোয় এসে গেছল বীরেশ্বর রাইয়ের। পাহাড়ী বনজঙ্গলে ওষুধের গাছ-গাছালি ছাড়া নেশার জিনিসও কত রকমের গজায় তার ঠিক নেই। আফিম গাঁজা ভাঙ তো আছেই, আরও অনেক রকমের ছোট-বড় নেশার জিনিসের

হদিস মেলে। এ-ব্যাপারেও যেটুকু জ্ঞানগম্যি থাকা দরকার বীরেশ্বর রাইয়ের সেটুকু ছিল। এ ব্যবসা সে বাইরে চালাত না। এই সব নেশার জিনিস ভুটানের রাজধানী থিম্পু আর পারোর মত দুই একটা বড় শহরে চালান দিত। তাইতেই অনেক টাকা ঘরে আসত।

ব্যবসা ফেঁপে উঠতে বীরেশ্বর রাই একা আর পেরে উঠছিল না। রণজিৎ চালিহা তখন চা-বাগানে চাকরি করে। তার বন্ধু আর এক গেলাসের ইয়ার। চালাক-চতুর চৌকস মানুষ। টগবগ করে অসমীয়া বাংলা হিন্দী ভুটানী নেপালী আর ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। রণজিৎ চালিহার ওপর আগে থাকতেই চোখ ছিল বীরেশ্বর রাইয়ের। আসামের মানুষ, তাকে পেলে আসামের বাজারটা ভাল মত কব্জায় আসতে পারে। তাছাড়া অতগুলো ভাষা জানা একটা চৌকস লোককে হাতে পেলে সব-দিক থেকেই সুবিধে। হাতে পাওয়ার ব্যবস্থা ওপরঅলাই করে দিলে। হঠাৎ কি গোলযোগে চা-বাগানের চাকরি নিয়ে টানাটানি রণজিৎ চালিহার। সেই মওকায় বে-ইজ্জত হবার আগেই বীরেশ্বর রাই আরও কিছু বেশি মাইনের টোপ ফেলে ব্যবসায় টেনে নিল। সেই থেকে সে ম্যানেজার।

বন্ধু আর এক গেলাসের ইয়ার হলেও ব্যবসার কাজকর্ম আর টাকা-পয়সা লেনদেনের ব্যাপারে কড়া মানুষ ছিল বীরেশ্বর রাই। সব-দিকে তার চোখ ছিল। রাতে গেলাস নিয়ে বসলে বা মেয়ে-বউ নিয়ে তার সঙ্গে কোন ফুর্তির সফরে বেরুলে তখন বন্ধু। অন্যদিকে ম্যানেজার রণজিৎ চালিহাও চতুর কম নয়। মনিব-বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে মন বুঝতো আর চটপট সেই মত কাজ সেরে ফেলত। ফলে ঝগড়ু দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া ভুল-বোঝাবুঝি কখনও হতে দেখে নি। একসঙ্গে চার বছর কাজ করেছে তারা, ততদিনে ব্যবসা আরও চাঙা হয়ে উঠেছে। মালিক তার ওপর খুশি ছিল, আর ফুর্তিবাজ কাজের মানুষটার ওপর মালকানও অখুশি ছিল না। মালিক বেঁচে থাকতে ম্যানেজার কত মাইনে আর উপরি পেল বা এখন কত মাইনে পায় ঝগড়ু বা আবুর কোন ধারণা নেই। মাইনে এখন আরও বেশি পায় নিশ্চয়, কিন্তু আবুর ধারণা, ইদানীং তার বাড়তি রোজগার মাইনের থেকে বেশি ছাড়া কম নয়। যতই হোক মাইনের টাকায় এত মদ খাওয়া ফুর্তি করা বা এমন চালের ওপর থাকা সম্ভব নয়। আবুর আরও ধারণা, তার বাড়তি রোজগারের ব্যাপারটা গায়ত্রী রাইও জানে কিন্তু কিছু বলে না। বলবে কি করে, ব্যবসার অনেকখানি তো বলতে গেলে এখনও তারই হাতে।

যতখানি সম্ভব গায়ত্রী রাই নিজেই ব্যবসার হাল ধরেছে আর ধরে আছে। বীরেশ্বর রাই মারা গেছে তিন বছর আগে। আচমকা অঘটন, আচমকা মৃত্যু। পাহাড়ের বাংলোয় ওঠার পথে বেসামাল জিপ নিচে পড়ে যায়। জিপ চালানোর ব্যাপারে মাহুষটা বেপরোয়া হলেও পাকা হাত। তখনও বর্ষা শুরু হয়ে যায় নি। বর্ষাকালে পাহাড়েব বাংলোয় থাকাই যায় না। প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। রাস্তা খারাপ হয়ে যায়। ধ্বস নামে। রাস্তা বন্ধও হয়ে যায়। প্রতি বছর বর্ষা নামার আগে সপরিবারে পাহাড় থেকে নেমে আসতে হয়। ওই সময়টা কাছাকাছির কোন শহরে বা চা-বাগানের বাংলো ভাড়া করে থাকে তারা। বর্ষা শুরু না হলেও সেদিন প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল, আর পাহাড়ী রাস্তাও বেশ খারাপ হয়ে গেছল। তাছাড়া তখনকার সেই রাস্তাও এখনকার মত ছিল না। সেই অঘটনের ফলেই এককাঁড়ি টাকা খরচ করে এখানকার এই রাস্তা বানিয়েছে গায়ত্রী রাই। যা-ই হোক, বৃষ্টিতে রাস্তা খারাপ থাকলেও বীরেশ্বর রাইয়ের মতো অমন পাকা হাতে এইগোছের অ্যাকসিডেণ্ট হবার কথা নয়। আসলে একটা মস্ত কাজ হবার ফলে মনের আনন্দে এন্তার মদ গিলে দুই বন্ধু বাড়ি আসছিল। পোস্ট মরটেম রিপোর্ট থেকে সেটা বোঝা গেছে। রণজিৎ চালিহারও সেই রাতে পাহাড়ের বাংলোতেই খাওয়া আর থাকার কথা। কিন্তু কিছু টুকিটাকি কাজ সারার জন্য সে আগেই নেমে গেছল। কাজ শেষ করে ঘণ্টা দু ঘণ্টার মধ্যে ফিরবে। এক কথায় আয়ুর জোর ছিল লোকটার। নইলে একসঙ্গে দুজনেই শেষ হয়ে যেত।

সেই থেকে মদ দু চোখের বিষ গায়ত্রী রাইয়ের। তার কাজের লোকদের কারও মদ খাওয়া বরদাস্ত করে না। একমাত্র রণজিৎ চালিহাকেই কিছু বলে না। স্বামী বেঁচে থাকতে ব্যবসার হিসাবপত্র রাখা আর পার্টির কাছে চিঠিপত্র লেখার কাজ গায়ত্রী রাই করত। কিন্তু সে মারা যাবার দু মাসের মধ্যে মহিলা এমন শাস্ত হাতে ব্যবসার হাল ধরবে কেউ ভাবে নি। প্রখর বুদ্ধিমতী তো বটেই, এই তিন বছরে ব্যবসা ডবল ফাঁপিয়ে তোলার ব্যাপারে কম সাহস দেখায় নি। অবশ্য এই সাহসও রণজিৎ চালিহাই যুগিয়েছে। একটু বেপরোয়া হতে পারলে কত সহজে আরও কত বেশি টাকা রোজগার করা যায় সে-পথ সে-ই গোড়ায় দেখিয়েছে। না, টাকার গন্ধ পেলে মহিলা পেছু পা হবার মেয়ে নয়। ভুটান সিকিম উত্তরবাংলা আর আসামের নানা জায়গায় বনজ ওষুধের কাঁচা মাল মজুতের পাকাপোক্ত ঘাঁটি করা হয়েছে। সেই সব জায়গায় কাজ

চালানোর জন্য লেখাপড়া জানা স্থানীয় এজেন্ট বাছাই করে বহাল করা হয়েছে। তাদের ব্রোকাররা জায়গায় জায়গায় গিয়ে অর্ডার বুক করে। কমিশন পায়। এই নির্ভরযোগ্য লোক বাছাইয়ের কাজও মহিলা নিজেই করেছে। এ-সব কাজেও ম্যানেজার চালিহা তার ডান হাত—সে সঙ্গে থাকত। এ-রকম ঘাঁটি করার ফলে কারবারের মাল এখন ওদিককার বড় বড় অনেক শহরেই পৌঁছে যাচ্ছে।

এদিকে নেশার কারবারটি আগের থেকে চারগুণ জমজমাট। গায়ত্রী রাইয়ের কাছে নেশা করাটা চক্ষুশূল, কিন্তু নেশার জিনিস বিক্রী করে ঘরে টাকা তুলতে আপত্তি নেই। ভুটানের থিম্পু বা পারো ছেড়ে বর্ডারের কাছাকাছি বড় শহর ফুটশোলিঙ, পর্যন্ত নেশার মাল পাচার হয়ে যাচ্ছে। আর সে-সব জায়গা থেকে এখানে আসছে ভাল ভাল মদ। বানারজুলি আর আশপাশের অনেক চা-বাগানের সাহেব-সুবোরা এই মদের এখন বড় খদ্দের। হবে না কেন, ও-সব জিনিসের এখানে অনেক দাম—আর আনাও সহজ ব্যাপাব নয়। সুবিধের দামে হাতের কাছে মজুত পেলে তাঁরা ঝুঁকবে না কেন? সুবিধের দামে দিয়েও গায়ত্রী রাইয়ের মোটা লাভ থাকে।

ব্যবসার আরও একটা বড় শাখা বিস্তার করেছে গায়ত্রী রাই। সাপের ব্যবসা। এ-দেশ থেকে বহু সাপ বিদেশের নানা জায়গায় চালান যায়। আমেরিকা ইংল্যাণ্ড পশ্চিম জার্মানি হল্যাণ্ড জাপান সকলেরই সাপের চাহিদা। বিষাক্ত সাপ তো বটেই, নির্বিষ, সাপও চাই তাদের। এখানে এত খবর কে রাখত? সাপুড়ে আর বেদে-বেদেনীদের কাছে দালালদের আনাগোনা বাড়তে ব্যাপারটা বোঝা গেছে। তারা তো খবর রাখেই। এই বানারজুলি থেকে শুরু করে বিশাল তরাইয়ের জঙ্গলের সর্বত্র বিষধর আর নির্বিষ সাপ কিলবিল করছে। সাপের কি শেষ আছে এ-সব দিকে! গায়ত্রী রাইয়ের এই ব্যবসা শুরু করার পিছনে আসল কৃতিত্ব আবু রব্বানীর। এদিককার জঙ্গলের সে হেড বীটম্যান। দালালরা তার কাছে আসত, তার পকেটে টাকা গুঁজে দিয়ে অনুরোধ করত লোক লাগিয়ে জ্যান্ত সাপ ধরে দাও। এমনি সাপ হলে কম পয়সা, বিষাক্ত সাপ হলে বেশি। যে ধরে দেবে তাদেরও এক-একটা সাপের জন্য আট আনা থেকে দেড়-দু টাকা পর্যন্ত দিত তারা। পাইথন পেলে দশ-পনের টাকা দিতেও রাজি। তাজ্জব ব্যাপার।

কিন্তু সরকারী চাকুরে আবু দালালদের খুশি করে কি করে? তারা এলে তখন সাপের খোঁজ। সে তো আর সাপ মজুত করে রাখতে পারে না বা

আগে থাকতে লোক লাগিয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে সাপ কিনে রাখতে পারে না। কথায় কথায় একদিন দালালদের চাহিদার ব্যাপারটা সে গায়ত্রী রাইকে বলেছিল। মেমসাহেবের একটা মজা আছে, নিজে কথা বেশি বলে না কিন্তু সকলের সব কথা শোনে। শোনার পর ম্যানেজারকে ডেকে বলল কি ব্যাপার খবর নিতে। এ-সব ব্যাপারে রণজিৎ চালিহা তৎপর খুব বলতেই হবে। আট-দশ দিনের মধ্যে সমস্ত খবর তার ঠোঁটের ডগায়। শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ সাপ বিদেশে যাচ্ছে। বাকি পাঁচ ভাগ দেশের গবেষণার কাজে লাগছে। বাইরে সাপ চালানের প্রতিষ্ঠান আছে এ-দেশে। দালালদের হাত ঘুরে সেই সাপ প্রতিষ্ঠানে পৌঁছয়। দালালরা তো লাভ করেই, খোদ কারবারীরাও তার ওপর মোটা লাভ করে সাপ বিদেশে চালান দেয়। প্রতিষ্ঠান বড় দালালদের কাছ থেকে কোন্ জাতের সাপ কি দরে কেনে শুনে মেমসাহেব পর্যন্ত হাঁ একেবারে। বিষাক্ত সাপের দাম ছয় থেকে বিশ টাকা পর্যন্ত ওঠে। তার মধ্যে একটা শঙ্খচূড়ের দাম একশ থেকে তিনশ সাড়ে তিনশ পর্যন্ত হয়। যত বড় হবে ততো দাম চড়বে। আর নির্বিষ সাপের মধ্যে পাইথনের দামও একশ থেকে আড়াইশ-তিনশ হতে পারে।

ব্যস, আবুর ওপর হুকুম হয়ে গেল বেদে সাপুড়ে বা জঙ্গলের লোকের কাছ থেকে একটা সাপও যেন দালালরা না পায়। সাপের খোঁজে এলে তাদের গায়ত্রী রাই অথবা ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। আর সকলকে জানিয়ে দিতে হবে জ্যান্ত সাপ ধরে আনলে দালালদের থেকে অনেক ভাল দামে তারা সেগুলো কিনে নেবে। বিয়ের আগে দুলারিরা যে ডেরায় থাকত সেটা এখন নানা জাতের আর নানা রকমের সাপের গুদাম। মাস গেলে দুলারি এখন কুড়ি টাকা করে ডেরার ভাড়া পায়। আর আরও পঞ্চাশ টাকা পায় এই ব্যবসা দেখাশুনা করার জন্য। দেখাশুনা বলতে সাপ ধরার লোকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা আর দালালদের সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেলে মালকান বা ম্যানেজারের নির্দেশমত তাদের হাতে সাপ জিম্মা করে দেওয়া। দুলারির নামে এই দেখা-শুনার ব্যাপারটা সব আবুই করে। দু-দুটো বাচ্চা নিয়ে তার অত সময় কোথায়। দুলারি এখন পাকা সংসারী হয়ে গেছে।

সাপের বিষও যে সোনার দরে বিকোয় তাই বা কে জানত? কিন্তু গায়ত্রী রাই ঠিক জেনেছে। সাপের বিষের চাহিদা অবশ্য সামান্যই সে-সময়। কিন্তু যেটুকু আছে তাতেও কম লাভ নয়। বাছাই করা কিছু বিষাক্ত সাপ গায়ত্রী রাইয়ের পাহাড়ের বাংলোয় চলে যায়। সেখানে একটা সাপের ঘরই করে

দেওয়া হয়েছে। ওদিকটার ভার ঝগড়ুর। ওর হাতের টিপুনির চাপে সাপগুলো গলগল করে বিষ ঢেলে দেয়। সাপের বিষ পেতে হলে খদ্দেরদের সেই পাহাড়ের বাংলোয় যেতে হয়।

গায়ত্রী রাইয়ের সঙ্গে ম্যানেজার রণজিৎ চালিহার অবনিবনা কেউ কখনও দেখে নি। বরং এই একজনের সঙ্গেই শুধু মেমসাহেব হাসিমুখে কথাবার্তা বলে, আর বেশির ভাগ ব্যাপারে তার সঙ্গেই পরামর্শ-টরামর্শ করে। কিন্তু একবার মেমসাহেবের সঙ্গে তার মনকষাকষি একটু হয়েছিল সে-খবর শুধু ঝগড়ু রাখে। আবুকে এই গোপন কথাও সে-ই বলেছে। সাহেব মারা যাবার বছরখানেকের মধ্যে রণজিৎ চালিহা নাকি গোটা ব্যবসাটা তিনজন পার্টনারের নামে চালাবার প্রস্তাব দিয়েছিল। একজন গায়ত্রী রাই, একজন তার মেয়ে উর্মিলা রাই আর একজন সে নিজে। সাদা কথা, তিন ভাগের এক ভাগ মালিক হতে চেয়েছিল। মেয়ের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব ঝগড়ুর। এ খবর সে-ই চুপি চুপি ফাঁস করেছে তার কাছে। মেয়ে তখন নাবালিকা। মেমসাহেব সে-প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। ম্যানেজারের তখন নাকি মেজাজ বিগড়েছিল। মেমসাহেব কোন্ কায়দায় তাকে ঠাণ্ডা করেছে, ঝগড়ু জানে না। তবে মাইনে যে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর ঝগড়ু লক্ষ্য করেছে, তারপর থেকে বাড়িতে লোকটার আদর-আপ্যায়নও বেড়েছে।

রণজিৎ চালিহার বউ ছেলে মেয়ে আছে। আগে বছরের বেশির ভাগ সময় তারা আসামেই থাকত, মাস-কতকের জন্য বানারজুলিতে আসত। গত দু বছরের মধ্যে আর আসেই নি তারা। ফলে দেড়-দু মাস অন্তত ম্যানেজারের আসামে টুর প্রোগ্রাম পড়ে। অবশ্য ব্যবসার বাজারও সেখানে ভালই জমে উঠেছে। আগে মেমসাহেবের কাছে লোকটার খাতির কদর দেখে আবুরা ভাবত লটঘটের ব্যাপার কিছু আছে। অমন কড়া মালকান এই লোকের কাছে শুধু নরম নয়, হাসি-খুশিও। প্রেমের আবার বয়েস বলে কিছু আছে নাকি? মেমসাহেব পাহাড়ের বাংলোয় থাকলে ম্যানেজার সেখানে মাঝে-সাঝে গিয়ে উপস্থিত হয়, খানাপিনা করে, রাতে থাকেও। ও-দিকে ম্যানেজারের বউ ছেলে মেয়ে এ-দিক মাড়ায় না। কিন্তু দু-দুটো বছর একভাবে কেটে গেল, নানা কারণে আবুর আর এখন সে-রকম কিছু মনে হয় না। তাছাড়া সে-রকম হলে ঝগড়ু নেশার মুখে ঠিক বলে দিত। ম্যানেজার লোকটাকে ঝগড়ু খুব একটা পছন্দ করে না। পছন্দ কোন কর্মচারীই করে

না। লোকটার এমন হাবভাব যেন সে-ই সব-কিছুর হর্তাকর্তা বিধাতা। নিজে কত দিকে কত ভাবে টাকা কামাচ্ছে ঠিক নেই, অন্যকে হকের পয়সা দেবার বেলায় ঝকাঝকি করে মালিককে খুশি করার চেষ্টা। নেশার মুখে ঝগড়ু বরং বলেছে, তেমন দরকার পড়লে মালকান গাল বাড়িয়ে ব্যাঙের লাথি খেতে পারে, আবার হুশমন ঢিট করতেও জানে। দরকার হলে যত লায়েকই হোক ওই ম্যানেজারকেও টাইট দিতে ছাড়বে না। কেন বলতে পারবে না, আবু এখন তার মেমসাহেবের এই চরিত্রটাই বেশি বিশ্বাস করে।

আবুর সঙ্গে মেমসায়েবের যোগাযোগ দু বছরেরও বেশি। আর বছর খানেকের ওপর হল ও তার একজন বিশ্বস্ত লোক। বর্ষায় তো পাহাড় থেকে নেমে আসতেই হয়, আবার কড়া শীতেও নেমে আসতে হয়। এই জন্য মেমসাহেব পাকাপোক্ত ডেবার খোঁজে ছিল। ইদানীং বানারজুলির দিকে কাজ বেশি, আবার এখানে থাকলে যোগাযোগের সুবিধেও বেশি। আট মাস আগে আবু বাপীর বাসাটা তার জিম্মায় ছেড়েছে। দুলারিও এই পরামর্শই দিয়েছিল। মেমসাহেবের নেকনজরে পড়ার আরও কারণ আছে। ও কাজের লোক কেমন তা তো দেখেছেই। তার ওপর ও এ-জঙ্গলের হেড বীটম্যান হবার দরুন সুবিধেও কম পাচ্ছে না। যেমন, জঙ্গলে আজ বাপী স্বচক্ষে যে চন্দ্রা বা সর্পগন্ধার বেড দেখে এলো, সেটা ওখানে হচ্ছে কার জন্যে? হচ্ছে কি করে? হচ্ছে ওই মেমসাহেবের জন্যে, খরচ একরকম নেই-ই বলতে গেলে। আর হচ্ছে আবুর দৌলতে। মাথা চুলকে বড়সাহেবর কাছে আর্জি পেশ করল, কিছু ভাল ওষুধ-গাছের বীজ তার হাতে এসেছে, জঙ্গলের মধ্যে একটু জায়গা নিয়ে চাষ করতে দিলে অনেক গরিব লোকের উপকার হয়। নি-খরচায় লোকের উপকার করে নাম কিনতে পারলে বড়সাহেবই বা আপত্তি করবে কেন? জঙ্গলে তো আর জায়গার টানাটানি নেই। তাছাড়া আবুর কল্যাণে জঙ্গলের কম জিনিস কি তার বউয়ের হেঁসেলে বা ভাঁড়ারে যায় যে আর্জি নাকচ হবে?

গল্পে গল্পে কখন সন্ধ্যা পার বা কখন দুলারি ঘরে হারিকেন রেখে গেছে দুজনের কেউই তেমন খেয়াল করে নি। এই সমাচার আরও কতক্ষণ চলত কে জানে। বাধা পড়ল।

আবু এ-দিক ফিরে ছিল, ঘরে যে ঢুকল, তাকে দেখে বাপীই প্রথমে সচকিত। দুলারি নয়।

রেশমা।

অন্দরে একজন বাইরের লোক দেখে ভিতরে ঢুকে ও থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত, তারপরেই মুখে বিস্ময় ভাঙল।—বাপীভাই মনে হচ্ছে—অ্যাঁ?

আবু ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। তারপর কিছু একটা রসিকতা করতে গিয়েও বাপীর মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। মজা দেখছে।

কারণ বাপীর মুখে কথা নেই। চেয়েই আছে। সেই রেশমাই বটে, অথচ অনেক তফাৎ।··· বছর দুই বড় হবে বাপীর থেকে, বছর চব্বিশ-পঁচিশ হবে বয়েস এখন। কিন্তু এত দিনেও মেয়েটার বয়েস বাড়ে নি, শুধু চেকনাই বেড়েছে। আগের থেকে অনেক তাজা আর পুষ্ট লাগছে। পরনের খাটো ঘাগরা আগের মত মলিন নয়। গায়ের আঁট জামাটাও চকচকে। মাথার সেই উস্কো-খুসকো চুল মিশকালো এখন—পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে। সুর্মা-টুর্মা কিছু লাগানোর দরুণ চোখ দুটো গভীর টানা দেখাচ্ছে।

বাপীর এই গোছের দেখার জালে পড়লে রেশমা আগে খিলখিল করে হেসে উঠত। এখনও হাসছে বটে, কিন্তু এখনই যেন সত্যিকারের সাপের খেলা দেখালো মেয়ের হাসি।

পরের মুহূর্তে মেয়ে গম্ভীর। একটু এগিয়ে এসে আবুর মুখোমুখি দাঁড়াল। দু হাত দু দিকের কোমরে উঠে এলো। চোখে ভ্রূকুটি।

কপট যন্ত্রণায় আবুর মুখ কুঁচকে গেল।—অমন করে চোখ দিয়ে বিঁধিস না মাইরি, বাপীভাই এসেই আমারি ঘরে তোব বদলে দুলারি কেন জিগ্যেস করে বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে!

খেদ শেষ হবার আগে দুলারিও ঘরে। আবু এখন কোন্ দিক সামলাবে। মেকি ত্রাসে পিছিয়ে বসল একটু।—মুখ ফসকে বলে ফেলেছি, বাপীভাই বাঁচাও!

রেশমা ফিরে দেখল দুলারিও মুখ টিপে হাসছে। তাকে নিয়ে রসের কথা কিছু হয়েছে বুঝেও তেমন কৌতূহল দেখাল না। আবুর দিকে ফিরে শাসনের সুরে বলল, এই জন্যেই তোমার পাত্তা নেই—বুকে বসানোর জন্য মালকান ওদিকে ছুরি হাতে অপেক্ষা করছে—যাও। ম্যানেজারও আছে—

—শালারা খেলে দেখছি। রস ভুলে আবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।—বাপীভাই চলো, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বাপীর দু চোখ তখনও রেশমার মুখের ওপর। রেশমা কটাক্ষে এ-দিকে তাকালো একবার। ঠোঁটে হাসি ঝিলিক দিল।—আবু সাহেব তুমি একলাই

যাও, বাপীভাই এখন আমাকে দেখতে ব্যস্ত।

পিছন থেকে তুলারি একটা থাপ্পড় বসালো তার পিঠে। আত্মস্থ বাপী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। আবুকে বলল, চলো।

॥ দশ ॥

চারদিকের আবছা অন্ধকারের মধ্যে শুধু বাপী তরফদারের বাড়িটাই আলোয় ঝলমল করছে। লাইন ধরে কাছে-দূরের আর সব ঘরে লণ্ঠন কুপী মোমবাতির টিমটিম আলো। ওই বাড়িটা এখন চোখ টানার মতো ব্যতিক্রম। নেপালী মহিলার রুচির প্রশংসা করতে হয়। দিনের বেলায়ও বাপী বাড়িটার ছিমছাম চেহারা দেখে গেছে।

সামনের বারান্দায় আরো চড়া আলো জ্বলছে। টেবিলের দুদিকের শৌখিন বেতের চেয়ারে গায়ত্রী রাই আর তার ম্যানেজার রণজিৎ চালিহা বসে। হাসিমুখে কথাবার্তা চলছে।···আবু বলছিল, ওই ম্যানেজার ছাড়া মেমসায়েবকে আর কারো সঙ্গে হেসে কথা বলতে দেখে না ওরা। কথা বেশি রণজিৎ চালিহাই বলছে। গায়ত্রী রাই অল্প অল্প হাসছে, এক-একবার মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছে বা কিছু বলছে। দূর থেকে এ-দৃশ্য দেখেই আবুর পিত্তি জ্বলে গেল। চাপা ঝাঁঝে বলে উঠল, শালা ঠিক গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, আর মেমসাহেবকে কিছু লাভের রোশনাই দেখাচ্ছে। ও-ব্যাটা এখন ওখানে না থাকলেই ভালো হত, মেমসাহেবের ওপর দিয়ে কথা কইবে।

কি ভেবে মৃদু গলায় বাপী বলল, বাড়ি নিয়ে কথা উঠলে তুমি চুপ করে থেকো. আমি এসে যাবার পরে আর তোমার কোনো দায়িত্ব নেই।

এতেই আবু ঘাবড়ে গেল।—তুমি কি গোলমেলে কথা কিছু বলবে নাকি? মেমসাহেবের মেজাজ খারাপ করে দিও না বাপী ভাই, আর ওই ম্যানেজারও একটুও সাদা মনের লোক নয় মনে রেখো।

বাপী আশ্বস্ত করল তাকে, ঠিক আছে।

বারান্দায় জোরালো আলো, বাইরের দিকটা অন্ধকার। তাই একেবারে দাওয়ার কাছে আসার আগে বারান্দার দু'জন ওদের লক্ষ্য করল না। দু'জন নয়, তিনজন। বারান্দা-লাগোয়া ঘরের দরজার কাছে একটা চেয়ারে বসে গায়ত্রী রাইয়ের মেয়ে ঊর্মিলা রাই বই পড়ছে। এদের আড়ালে দূর থেকে তাকে দেখা যাচ্ছিল না।

ভিতরে ঢুকে পড়তে বারান্দার ছু'জনের ওদের দিকে চোখ গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছু'জনেরই খুশি মুখ গাম্ভীর্যের আড়ালে সেঁধিয়ে গেল। কাছে এগোবার ফাঁকে প্রথমে রণজিৎ চালিহাকেই এক নজর দেখে নিল বাপী। পরনে দামী স্যুট, দামী টাই, ধপধপে ফর্সা রং, চওড়া উঁচোনো কপাল, সে-তুলনায় ছোট চোখ। আসামের মানুষ দেখলেই বোঝা যায়। বয়েস বেশি হলে চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ।

ওরা কাছে আসার ফাঁকে গায়ত্রী রাই নেপালী ভাষায় চাপা গলায় রণজিৎ চালিহাকে বলল কিছু। চালিহা অল্প ঘাড় বেঁকিয়ে আবুকে ছেড়ে বাপীকে ভালো করে দেখে নিল। বাপীর ধারণা, ও যে বাড়ির মালিক মেমসাহেব তার ম্যানেজারকে সেটাই জানান দিল।

এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আবু রব্বানীর অন্য মুখ। বিনয় উপচে পড়ছে। ঝুঁকে মেমসাহেবকে সেলাম জানালো। আবার মুখেও বলল, গুড্ ইভনিং মেমসায়েব। তারপর ম্যানেজারের উদ্দেশে আরো বিনীত অভিবাদন। —গুড্ ইভনিং সার!

মনে মনে বাপী আবুকে তারিফ না করে পারল না। ও উন্নতি না করলে কে করবে!

বাপী দু হাত জুড়ে কপালে ঠেকালো, কিন্তু মহিলা ওর দিকে তাকালোই না। ফলে বাপী ম্যানেজারের দিকে আর না ফিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মেয়ে ঊর্মিলা বিকেলে বাড়ির মালিকের হেনস্থা দেখেছে, আবার সে এসে দাঁড়াতে তার বই পড়ার মনোযোগ গেল। এবারে মায়ের সঙ্গে আংকল চালিহা, লোকটার কপালে দুর্ভোগ আছে ভাবছে।

বাড়ির মালিকের অস্তিত্ব স্বীকার করারও দায় নেই যেন গায়ত্রী রাইয়ের। ঈষৎ রুষ্ট স্বরে আবুকে বলল, বিকেল থেকে তোমার খোঁজে লোক পাঠানো হয়েছে—কোথায় ছিলে?

আবু রব্বানীর অপ্রস্তুত মুখ, কিন্তু জবাব সপ্রতিভ। এতকাল বাদে দোস্তকে কাছে পেয়ে ভুলে গেলাম—

আবু রব্বানীর মতো একজনের সঙ্গে এত দোস্তির কারণে কিনা বলা যায় না, বাপীকে এখনো কেউ বসতে বলছে না। আবুর জবাবও গায়ত্রী রাইয়ের কাছে তেমন খুশি হবার মতো নয়। আরো গম্ভীর।—বাড়ির ব্যাপারে কাগজপত্র কবেই সই হবার কথা ছিল, এখনো হয়নি কেন?

আবুর বিনীত জবাব, ম্যানেজার সায়েব জানেন—

রণজিৎ চালিহা বলল, সব রেডি আছে, কালই হতে পারে।

জবাবের আশায় আবু এবার বাপীর দিকে তাকালো। কিন্তু বাপীর এমন মুখ যেন মাথায় ঢুকছেই না কিছু। অগত্যা আবু মেমসাহেবের দিকে ফিরল। বলল, ঘরের মালিক এসে গেছে, এখন যা করার সেই করবে—তাকে বলুন।

গায়ত্রী রাইয়ের এই উক্তিও পছন্দ হল না—আমি মালিক-টালিক জানি না, তোমার সঙ্গে আমার কথা পাকা হয়েছে, তাকে যা বলার তুমি বলো—কনট্রাক্ট কালই সই হওয়া চাই।

নিরুপায় আবুর দু' চোখ আবার বাপীর দিকে। দোস্ত সব জেনেশুনে ওকে এমন ফ্যাসাদে ফেলছে কেন?

অগত্যা এবারে বাপীর জিভ নড়ল। দু' চোখ মহিলার মুখের ওপরে।—কোন্ বাড়ির কথা হচ্ছে…এই বাড়ি?

গায়ত্রী রাইয়ের বিরূপ চাউনি।—সেটা এতক্ষণে বুঝলেন?

বাপীর এই মুখে কৃত্রিমতা খুঁজে পাওয়া শক্ত। বলল, আপনাদের কথাবার্তা আমি ঠিক খেয়াল করিনি…বিকেল থেকে এই ক'ঘণ্টার অর্ধেক সময় আবুর মুখে কেবল আপনার প্রশংসা শুনেছি, তাই আমি ভাবছিলাম একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে আপনি বসতেও বলছেন না কেন…।

ধাক্কাটা শুধু সামনের মহিলা নয়, রণজিৎ চালিহা, দরজার ও-ধারের চেয়ারে বই হাতে ঊর্মিলা, এমন কি আবুর ওপরেও গিয়ে পড়ল।

—সীট্ ডাউন প্লীজ। বলা বাহুল্য, শিষ্টাচারের খোঁচা খেয়ে মহিলার মুখভাব আরো অপ্রসন্ন।

বাপী চেয়ার টেনে বসল। ঊর্মিলা উঠে ঘর থেকে একটা মোড়া এনে আবুর সামনে রেখে আবার নিজের চেয়ারে ফিরে গেল। ইশারায় ওকেও বসতে বলে, গায়ত্রী রাই বাপীর মুখোমুখি।

বাপী জিজ্ঞাসা করল, বলুন, বাড়ির কি হয়েছে?

—কি হয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?

কি হয়েছে দেখার জন্যেই বাপীর দু'চোখ বারান্দার চারদিকে আর ঊর্মিলা রাইকে ছাড়িয়ে ভিতরের দিকেও একবার ঘুরে এলো। মেয়েটার চাউনিতে কৌতুকের ছায়া।

এদিকে বাপীর হৃষ্ট পর্যবেক্ষণেও ভেজাল কিছু নেই। অকপট প্রশংসার সুরেই বলল, দিনের বেলা দেখে গেছলাম, রাতে আরো ভালো লাগছে…ঘর

বেড়েছে, ইলেকট্রিক লাইট এসেছে···নিজের সেই বাড়ি বলে চেনাই যায় না।

গায়ত্রী রাই তেমনি গম্ভীর, কিন্তু গলার স্বর নরম একটু।—এর জন্য আমার অনেক টাকা খরচ হয়েছে, নট্ লেস্ দ্যান·· ফাইভ থাউজ্যাণ্ড। এ-টাকাটা ভাড়া থেকে কিভাবে অ্যাডজাস্ট করা হবে সেটা আবুর সঙ্গে সেট্‌ল্‌ড হয়ে আছে। আপনি জেনে নেবেন···এগ্রিমেণ্ট রেডি আছে। চালিহার দিকে ফিরল, গেট্ ইট সাইণ্ড্ টুমরো—

বাপী পাশের দিকে অর্থাৎ ম্যানেজারের দিকে ফিরেও তাকালো না। তার আবেদন খোদ কর্ত্রীর কাছে। মুখখানা ফাঁপরে পড়ার মতো। বলল, আপনি আমার ভাঙা বাড়ির চেহারা পাল্টে যা করেছেন মিসেস্ রাই, আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ। এরকম করার সামর্থ্য আমার কোনদিন হত না, সই-টইয়েব জন্যেও কিছু আটকাবে না·· কিন্তু একটু মুশকিল হল আমি থাকব কোথায়?

মুখের কথা শেষ হতে না হতে চালিহা বলে উঠল, দ্যাটস্ নট্ আওয়ার লুক আউট।

বাপীর ভেবাচাকা খাওয়া মুখ। চালিহাকে একবার দেখে নিয়ে সংকোচ আর সম্ভ্রমের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, ইনি?

চালিহা থমকালো। ধৃষ্টতা দেখছে। গায়ত্রী রাই জবাব দিল, ইনি মিস্টার রণজিৎ চালিহা, আমাদের বিজ্‌নেসের চিফ একৃসিকিউটিভ।

আমার বিজ্‌নেস বলল না বা ম্যানেজার বলল না বাপীর কানে সেটুকু ধরা পড়েছে। সবিনয়ে তাকে নমস্কার জানিয়ে আবার মহিলার দিকে ফিরল।—বাড়ির এগ্রিমেণ্ট আপনার সঙ্গে, না আপনার ফার্মের সঙ্গে?

—আমার সঙ্গে।

—তাহলে কথাবার্তাও আপনার সঙ্গে হোক।·· বাড়ি নিয়ে আপনাকে আমি কোনো ট্রাবল্ দেব না, আবুর সঙ্গে যা সেট্‌ল্ করেছেন তাই হবে। কিন্তু আমার প্রবলেমটা আপনিও এঁর মতো এক কথায় নাকচ করে দেবেন আমি আশা করছি না।

রণজিৎ চালিহার ফর্সা মুখ লাল। সরাসরি কারো দিকে না তাকালেও বাপীর অগোচর কিছু নেই। মোড়ায় বসা আবুর উতলা মুখ। আর দরজার লাগোয়া চেয়ারে বসা ওই মেয়ের চোখের কোণে কৌতুক আরো বেশি জমাট বেঁধেছে। অর্থাৎ কর্ত্রীর সামনে বসে প্রকারান্তরে তার ম্যানেজারকে তুচ্ছ করাটা নতুন কিছু।

···কিন্তু বাপী তরফদারের ষষ্ঠ অনুভূতি ওকে বড় ঠকায় না। আবুর মুখে

গায়ত্রী রাই আর তার এই ম্যানেজারের সম্পর্কে আদ্যোপান্ত শোনার পর থেকেই একটা সম্ভাবনা মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। এখন এই কথার পরে মহিলারও গম্ভীর চাউনিতে যদি পলকের প্রশ্রয়ের আভাস সত্যিই মিলিয়ে যেতে দেখে থাকে, তাহলে তার হিসেবের সঙ্গে মেলে।

মনে হল দেখেছে।

গায়ত্রী রাইয়ের কথায় অবশ্য সেই প্রশ্রয়ের ছিটেফোঁটাও নেই। কথাও বিরক্তি-ছোঁওয়া। – আপনাব প্রবলেম শুনে আমি কি করতে পারি?…বড়জোর পুরো ভাড়া একশ' টাকার জায়গায় মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা করে কাটা যেতে পারে।

মহিলা চতুর কত বুঝতে একটুও সময় লাগল না বাপীর। টাকা তার কাছে কোন সমস্যা নয়। পঞ্চাশ-ষাট ছেড়ে পঁচিশ-তিরিশ টাকা করে কাটতে বললেও হয়তো রাজি হয়ে যাবে। কারণ তাতে বাড়ির ওপর দখলের দাবি অনেক বছর ধবে কায়েম থাকবে। কিন্তু ম্যানেজাব রণজিৎ চালিহা এই কূট চালের ধার দিয়েও গেল না। অসহিষ্ণু ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, তাহলে আবার ফ্রেশ এগ্রিমেণ্ট করতে হয়—এমনিতেই ওই আবু রব্বানী যতটা পারে স্কুইজ করছে।

বাপী এবার তার দিকে ফিরল। ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, ওই এগ্রিমেণ্টের আমি কানাকড়িও দাম দিই না।

রণজিৎ চালিহার ফর্সা মুখ তেতে ওঠার বা সামনের মহিলার দু'চোখ ঘোরালো হয়ে ওঠার আগেই বাপী একই সুরে আবাব যা বলল, সেটা কেউ আশা করেনি। চোখে গায়ত্রী রাইকে দেখিয়ে ম্যানেজারকেই বলল, আমার বন্ধু আবু রব্বানী যাঁকে এত শ্রদ্ধা করে আর বিশ্বাস করে, আমারও তাকে তেমনি শ্রদ্ধা করতে আর বিশ্বাস করতে অসুবিধে নেই। ওই এগ্রিমেণ্ট আপনি ছিঁড়েও ফেলতে পারেন, ওঁর মুখেব কথাই যথেষ্ট। ধীরেসুস্থে গায়ত্রী রাইয়ের দিকে ফিরল।— সত্যিই যদি স্কুইজ করা হয়েছে মনে করেন, তাহলে বলবেন, যা উচিত বিবেচনা করবেন তাই হবে। কিন্তু আমার সমূহ প্রবলেম অন্যরকম—

কথার কলে পড়ে চালিহার মেজাজ আরো তিরিক্ষি। আবারও আগ বাড়িয়ে গজগজ করে উঠল, সেটা আমাদের বলে লাভ কি—আপনার প্রবলেম মাথায় রেখে আমরা বাড়ির রিনোভেশনে হাত দিইনি বা এত টাকা ঢালিনি।

বাপীর নিরীহ দু'চোখ প্রথমে মা, পরে দরজার ওধারে মেয়ের মুখের ওপর

ঘুরে এলো। অত বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার কথা বলার পর ম্যানেজারের এই মেজাজ তাদের কাছেও সুশোভন লাগছে না। বাপীর স্নায়ুগুলো আরো যেন নিজের বশে এখন। মোড়ায় বসা হতবাক মূর্তি আবুর দিকে ঘুরে তাকালো।—ঘর বাড়ানো বা এত সব করার পরামর্শ তুমি দিয়েছিলে?

আবুর হাঁসফাঁস দশা। কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। পাশ থেকে রণজিৎ চালিহাই খেঁকিয়ে উঠল আবার।—ও পরামর্শ দেবে কি? এই ঘর-বাড়ি ওঁর মতো মহিলার বাসযোগ্য ছিল? যেটুকু দরকার করে নেওয়া হয়েছে।

বাপীর ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসি যেন আপনা থেকেই এসে গেল। বলল, বাড়ির হাল দেখে ছেলেবেলায় আমার নিজেরই খুব খারাপ লাগত, আর তখন চা-বাগানের বড় বড় বাংলোগুলো দেখে ভাবতাম বড় হয়ে ওখানে ও-রকম একটা বাংলো তুলব।…তো এই গরিবের কুঁড়েঘর নিয়ে টানাহেঁচড়া না করে আপনিও চা-বাগানের কোনো জমিতে ওঁর উপযুক্ত একখানা হালফ্যাশানের বাংলো তুলে দিতে পারতেন?

এই বানারজুলির জঙ্গলেই বাপী দেখেছে, তৈরি মৌচাকে ঢিলের যুৎসই ঘা পড়লে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি তাড়া করে আসে আবার চাক থেকে টসটস করে মধুও ঝরে। আবুর দিকে বাপী তাকায়নি, তার দিশেহারা অবস্থাটা আঁচ করতে পারে। বাকি তিনজোড়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টি প্রথমে ছেঁকে ধরল তাকে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া আর ততটা গরম মনে হল না। ঊর্মিলা রাইয়ের চোখের সামনে বই। গায়ত্রী রাইয়েরও বাইরে রুষ্ট মুখ কিন্তু ভিতরে তরল কিছু তল করার চেষ্টা।

…খোঁচাটা শেষ পর্যন্ত একজনেরই দম্ভের চাকে গিয়ে লেগেছে। সম্ভাবনার সেই অনুভূতিটা ভিতরে আর এক দফা নড়া-চড়া করে গেল। বাপীর হিসেব মিলছে।

রণজিৎ চালিহা চেয়ার ছেড়ে উঠেই দাঁড়াল এবার। ক্রুদ্ধ দু'চোখ গায়ত্রী রাইয়ের দিকে। এই একজনকে এরপর ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করা হবে কিনা এই জিজ্ঞাস্য হয়তো।

জবাবে রমণীর পলকা ভ্রূকুটি। গলার স্বরে হালকা শাসন, ডোণ্ট বি ইমপেশেণ্ট ম্যান! বোসো—। তারপরেই রসকষশূন্য গম্ভীর দু চোখ বাপীর মুখের ওপর চড়াও হল। গলার স্বরে ঠাণ্ডা ঝাপটা।—ওঁকে ও-কথা বলবার অর্থ কি, এ বাড়ি আমরা জবর-দখল করে খুশিমতো রেনোভেট করে নিয়েছি?

বাপীও ঠাণ্ডা মুখেই মাথা নাড়ল।—না। যা করেছেন একটু আগে তার

জন্য আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছি, আর ভাড়া-টাডার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই হবে বলেছি।

ঘরে বসে আবু বলছিল, বাপী ভাইয়ের মুখখানা আগের থেকে ঢের মিষ্টি লাগছে, দেখলে মনে হয় ভেতর বার সাফ—নেপালী মেমসায়েবের ঠিক পছন্দ হয়ে যাবে। আবুর সে-আশায় এখন ছাই পড়েছে কিনা জানে না, কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে ওর মেমসায়েবের এখন ভিতর দেখার চোখ।

--ঠিক আছে। থাকার জায়গার প্রবলেমের কথা শুনেছি। কিন্তু আমরা কি করতে পারি?

এ-প্রশ্নের জন্য বাপী প্রস্তুতই ছিল। জবাব দিল, বাড়ির জন্য আপনি অনেক খরচ করেছেন আরো কিছু খরচ করলে সমস্যা মেটে। পাশের খালি জমিতে সেপারেট আর এক্সক্লুসিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট সুদ্ধু আমার জন্য একখানা ঘর তুলে দিন।

প্রায় কর্কশ স্বরেই গায়ত্রী রাই বলে উঠল, অ্যাবসাবড! এখানে আমি থাকি আমার মেয়ে থাকে—আমাদের অসুবিধে হবে!

দরজার কাছে সেই মেয়ে তেমনি বসেই আছে। বাপীর সহিষ্ণুতায় এবারে চিড় খেল একটু। সব মেয়েই মেয়ে। হয়তো ওকে করুণাপ্রার্থী ভাবছে এবার। তবু সংযত সুরেই বলল, অসুবিধে আমারও খুব হবে মিসেস রাই··· নিজের নিরিবিলি শান্তির ঘরে একটু আশ্রয় পাব বলে কলকাতা থেকে চলে এসেছিলাম। যাক, মাঝে যেমন খুশি পার্টিশন দিয়ে নিতে পারেন, আর সবসুদ্ধু যা খরচ হবে তাও ওই ভাড়ার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন।

মায়ের পিছনে মেয়ে উসখুস করে উঠল একটু। অসুবিধে তারও হবে শুনে হয়তো মজার ছোঁয়া লেগে থাকবে। বাপী তাকালো না। সব থেকে বেশি অবিশ্বাস আর ঘৃণা নিজের ওপর।

গায়ত্রী রাই মাথা নাড়ছে। চাউনিও সদয় নয়। বলল, আই ডোণ্ট লাইক দি আইডিয়া।

এবারেও বাপীর নরম মুখ। কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট।—টাকা সংগ্রহ করে নিজের জমিতে যদি সেপারেট ঘর তুলি, আপনি আটকাবেন কি করে?

এবারে যথার্থ হালছাড়া ক্রুদ্ধ মুখ মহিলার। এদিকটা ভাবেনি। তার দাপটের ম্যানেজার এতক্ষণে হয়তো ধৈর্যের শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু এ কথার পর সেও আর দাপট দেখালো না। ঘাড় বেঁকিয়ে নেপালী ভাষায় কি

দুই-এক কথা বলল তাকে।

কি বলল তক্ষুনি বোঝা গেল। গায়ত্রী রাইয়ের দু' চোখ আবার বাপীর মুখের ওপর এঁটে বসল। বলল, পাশের জমিসুদ্ধু বাড়িটা যদি আমি কিনে নিতে চাই? আই উইল পে ফেয়ার প্রাইস, পাঁচ হাজার টাকা আমি অলরেডি খরচ করেছি···আরো আট হাজার টাকা দিতে পারি। এগ্রিড?

বলা নেই কওয়া নেই একটা মুখের কথায় আট হাজার টাকার মালিক হয়ে বসতে পারে—ভাবলেও বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে ওঠার কথা। আট হাজার টাকা একসঙ্গে কখনো চোখে দেখেনি। কিন্তু বাপী গরজ দেখছে। গরজ বুঝছে। রয়ে-সয়ে ফিরে জিগ্যেস করল, আপনাব বিবেচনায় সব মিলিয়ে এই বাড়ি আর জমির দাম তাহলে তেরো হাজার টাকা?

—টেন থাউজ্যাণ্ড? ঝাঁঝালো গলায় দর চড়িয়ে গায়ত্রী রাই বলল, কিসের কি দাম আমার জানা আছে, আমার দরকাব তাই এই দাম—কিন্তু আর বাডবে না। এগ্রিড?

ঘাড় ফিরিয়ে একবার আবুর মুখখানা দেখতে ইচ্ছে করছে বাপীর। কিন্তু বেচাবা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার টালি এলাকার দ'কলিন পিওন রতন বনিকের কথা মনে পডে গেল। আসার দিনও বলেছিল, কপালের রং বদলাচ্ছে, এবারে দিন ফিরল বলে। কয়েকশ' টাকা পুঁজির বৃত্ত থেকে একেবারে দশ হাজার টাকার বৃত্তের মধ্যে এসে দাঁড়াল? কিন্তু বুকের তলায় যে বৃত্তে পৌঁছনোর তৃষ্ণা এখন, সেটা দশ হাজারের দশ বিশ গুণ হলেও কিছু নয়। আবুর কথা আর উচ্ছ্বাস সত্যি হলে এই একটি রমণীর সঙ্গে তেমন যোগ-নির্বন্ধে ভাগ্যের পাশায় তার থেকে ঢের বড দান পড়তে পারে। দশ হাজার টাকা হাতের মুঠোয়। যে-কোনো সময় হাত বাড়ালেই পাবে, কিন্তু এক্ষুনি হাত বাড়ানো মানেই এই যোগের শেষ। বাপী তরফদার আজ যেখানে দাঁড়িয়ে, দশ হাজার টাকা কেন, এই জীবনটাকেও জুয়ার আসরে নামাতে আপত্তি নেই।

রমণীর অসহিষ্ণু প্রতীক্ষা মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। দু' চোখের অকরুণ ঝাপটায় ওর মুখের জবাব টেনে বার করার মতো। বাপী বলল, না, আর বাড়াতে হবে না, মন থেকে সায় পেলে ওতেই হবে। পেলে বলব।

মহিলা চেয়েই আছে। দশ হাজার টাকার টোপ না গেলার মতো জোরটা কোথায় বোঝার চেষ্টা। এবারে ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, সায় পেতে কতদিন লাগবে?

এত বড় একটা লোভের থাবা থেকে এমন অনায়াসে বেরিয়ে আসতে পেরে বাপীর ভিতরটা হালকা লাগছে। সেই সঙ্গে নিজের একটা জোরের দিকেরও হদিস মিলছে। মুখে বিপন্ন হাসি।—সায় এক্ষুনি পাচ্ছি না যখন, কতদিনের মধ্যে পাব বলি কি করে···কিন্তু আপনার এত তাড়া কিসের, আমি সত্যি বাড়ি নিয়ে আপনার সঙ্গে কোনো রকম বোঝাপড়া করতে আসিনি। আপনাকে দেখতে এসে নিজের সমস্যার কথাটা বলে ফেলাই হয়তো অন্যায় হয়েছে।

গায়ত্রী রাইয়ের বাইরেটা দেখে ভেতর বোঝা কারো দ্বারা সম্ভব কিনা বলা যায় না। এ-কথার পরেও মুখে কোনো নরম রেখা দেখা গেল না। তবু বাপীর কেমন মনে হল, বোঝাপড়ার চেষ্টা বাতিল করে মহিলা এবারে শুধুই ওর ভেতর দেখছে।

এ-দিকে ম্যানেজার রণজিৎ চালিহা কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল, তারপর অনেকক্ষণের একটা অসহ্য বিরক্তি ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

গায়ত্রী রাইও সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে তাকালো। বাড়িতে ঢোকার আগে আবছা অন্ধকার থেকে মহিলার হাসিমুখ দেখা গেছল। এখন হাসি নেই মুখে, কিন্তু চাউনিটা অন্তরঙ্গ।—যাচ্ছ?

—হ্যাঁ, সাড়ে আটটায় ক্লাবে সেই পার্টির সঙ্গে মিট করার কথা।

– ঠিক আছে। কাল সকালে আসছ?

মাথা নাড়ল, আসছে।

সে পা বাড়াবার আগে গায়ত্রী রাই আবার বলল, ক্লাবেই যাচ্ছ যখন একটা কাজ কোরো তো, সেখানকার ম্যানেজারকে দিন-কতকের জন্য এঁকে একটা ঘর ছেড়ে দিতে বলো···আনটিল উই রিচ্ সামহয়্যার।

রণজিৎ চালিহা বাপীর দিকে একটা উষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিল। বাড়ির দর দশ হাজার টাকা তুলে ফেলার জন্যেই হাবভাবে জ্বলতে দেখা গেছে লোকটাকে। এখন এই কথা। জবাব দিল, কোথাও রিচ্ করার জন্য তোমার এত ব্যস্ত হওয়ার দরকার আছে?

সঙ্গে সঙ্গে এদিক থেকে আবার সেই হাল্কা-গম্ভীর ভ্রূকুটি। যার একটাই অর্থ, যা বলছি করো, এ-রকম জল-ভাত ব্যাপার নিয়ে মেজাজ গরম কোরো না।

রণজিৎ চালিহা বারান্দা থেকে নেমে অন্ধকারে মিশে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাপীর মনে হল অনেকক্ষণের একটা কৃত্রিম গুমোট কেটে গেল। সামনের

মহিলা এখনো গম্ভীর বটে, কিন্তু মুখের অকরুণ টান-ভাবটা গেছে। ওদিকে তার মেয়েও বেতের চেয়ার তুলে এনে মায়ের পাশে বসল। লালচে ঠোঁটের ফাঁকে টিপ-টিপ হাসি। আরো কিছু মজার খোরাকের প্রত্যাশা।

বাপী তাকাতে চায় না। দেখতে চায় না। সব মেয়েই মেয়ে। ওর জীবনে শনি। শনির দৃষ্টিতে সব জলে, সব পোড়ে। ভিতরের ক্ষতবিক্ষত সত্তা কাউকে যেন চিৎকার করে নালিশ জানাতে চাইছে, এখানেও আবার একটা মেয়ে কেন? কেন?

ঘাড় বেঁকিয়ে একবার মেয়েকে দেখে নিয়ে আবার এদিক ফিরে গায়ত্রী রাই হঠাৎ ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, ইউ রাসকেল, কাম হিয়ার।

বাপী হকচকিয়েই গেছল। কিন্তু না, এই আচমকা সম্ভাষণ বা আহ্বান ওকে নয়। আবুকে। কিন্তু আবুও এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল।

ঝাঁঝালো গলায় গায়ত্রী রাই আবার হুকুম করল, মোড়াটা এনে এখানে বোসো।

নিজের বাঁ পাশটা দেখিয়ে দিল। আবু শশব্যস্তে হুকুম তামিল করল। ঘাড়ে কি অজানা কোপ পড়ে ভেবে পাচ্ছে না।

গায়ত্রী রাইয়ের দুই সাদাটে ভুরু কুঁচকে জোড়া লাগার দাখিল।—ক'মাস আগেও বাড়ির মালিকের সম্পর্কে তুমি আমার কাছে গাদা গাদা প্রশংসা করে গেছ—সে এই মালিক?

এবারেও আবুর হতচকিত মূর্তি। জবাব দিল, জি মেমসায়েব।

সোজা হয়ে বসে নাক দিয়ে ফোঁস করে গরম বাতাস ছড়ালো এক ঝলক।—তুমি একটা গাধা, হি ইজ্ এ ডেনজারাস ম্যান।

—জি মেমসায়েব—না, মেমসায়েব না। ভুল শুধরে ব্যস্তমুখে আবু উঠে দাঁড়াল একেবারে।—খোদার কসম খেয়ে বলছি বাপীভাই খুব ভালো লোক—আমার থেকে সাচ্চা লোক। ওই ম্যানেজর সায়েব খামোখা গরম হয়ে উঠতে ওর মেজাজ খারাপ হয়েছিল—বাপীভাই, মেমসায়েবকে তুমি বুঝিয়ে বলো না।

এই আবু ঢিল নিয়ে বা শুধু লাঠি হাতে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে মোকাবিলা করে ভাবা শক্ত। কিন্তু বাপীর স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাড়া জেগেছে আবার। ভিতরে আবার সেই অনুভূতির আনাগোনা। যে অনুভূতি আগে থাকতে কিছু ইশারা পাঠায়, কিছু বলে দেয়। আবুটা সরলই বটে। সত্যিই ডেনজারাস ভাবলে ওর মেমসাহেব এমন ঘটা করে সেটা বলত না—ভাবল না।

ওর হাঁসফাঁস দশা দেখে মেয়েটা হাসছে। বাপীরও চোখে হাসি, মেমসায়েবকেই দেখছে।

আবুর কপালে আবার একটা ধমক।--ইউ শাট্ আপ অ্যাণ্ড সীট ডাউন। গায়ত্রী রাইয়ের দু চোখ আবার বাপীর মুখের ওপর আটকালো। ঘনিষ্ঠ আদৌ বলা যাবে না, কিন্তু সেরকম তপ্তও নয়।

—কি নাম বলেছিলে—বাপী তরফদার?

সোজা তুমি করে বলল। এতক্ষণই যেন একটা বাড়তি সৌজন্যের লাগাম ধরে বসেছিল। এ-ও বাপীর হিসেবের সঙ্গে একটু বেশিই মিলছে।

--আজ্ঞে হ্যাঁ।

--আই থিংক ইউ আর নট এ স্ট্রেট ম্যান—আর ইউ?

চোখে চোখ রেখে বাপী হাসল একটু।—খুব স্ট্রেট বলেই তো মিস্টার চালিহা আর সেই সঙ্গে আপনিও একটু রেগে গেছলেন···আমি কি একটাও বাঁকা-চোরা কথা বলেছি?

নিজে না চাইলে ওই মুখে নরম দাগ পড়েই না বোধ হয়। কিন্তু জবাব শুনে অখুশি মনে হল না। জিজ্ঞেস করল, পড়াশুনা কতদূর করা হয়েছে?

বলল।

—অনার্স ছিল?

—আজ্ঞে না, অনার্সের বই কেনার মতো সঙ্গতি ছিল না। ডিসটিংশন পেয়েছিলাম।

আবু রব্বানীর মুখে একটা বড় আশার বাতি জ্বলে উঠেছে। তড়বড় করে বলল, দারুণ ভালো ছাত্র ছিল মেমসায়েব, আমার সঙ্গে মিশে আর দিনরাত জঙ্গল চষে অল্পের জন্য স্কলারশিপ মিস করেছে। হাই ফার্স্ট ডিভিশনে—

মেমসায়েব ওকে ধমকে থামালো, তোমাকে কিছু জিগ্যেস করা হয়নি।

বাপীই যেন হাঁপ ফেলে বাঁচল, উৎসাহের ঝোঁকে আবু ওকে আরো কত বেমক্কা ফাঁপিয়ে তুলত ঠিক নেই।

—বয়েস কত?

বাপীর মনে পড়ে ব্রুকলিনের বড়বাবু মন্মথ সোম খাটি-বয়েস জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁর মনে কিছু ছিল, এঁর মনে কিছু থাকা অবশ্য সম্ভব নয়। তবু পাশে এই বয়েসের একটা মেয়ে বসা বলেই নিজের বয়েস দশটা বছর বাড়িয়ে বলতে পারলে স্বস্তি বোধ করত। কিন্তু পারা গেল না, সত্যি কথাই বেরিয়ে এলো।—এবারে তেইশ হবে।

এত কাঁচা বয়েস মহিলারও খুব মনঃপূত হল না যেন। কারণটাও বাপী হয়তো আঁচ করতে পারে। কিন্তু তলিয়ে ভাবার আগেই পরের প্রশ্ন।—কলকাতায় কি করা হত ?

—যুদ্ধের আপিসের টেম্পোরারি চাকরি।

—গেছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভিতরে ভিতরে কেন যেন এখন আবার মেয়েটার পাশে বসে থাকা পছন্দ হচ্ছে না বাপীর। এখন কিছু মজার কথা হচ্ছে না, উঠে গেলেই তো পারে।

—এখন এখানে থাকা হবে ?

বাপীর মনে হল প্রত্যেক কথার ফাঁকে মহিলা ওকে যাচাই করে নিচ্ছে।

—সুযোগ সুবিধে হলে সেইরকমই ইচ্ছে।

—কিরকম সুযোগ সুবিধে ?

চাকরির কথা ইচ্ছে করেই মুখে আনল না। বলল, ছোটখাটো কোনো ব্যবসা যদি করতে পারি।

—এই জঙ্গলে আবার কি ব্যবসা ?

বাতাস অনুকূল। বাপী হেসেই জবাব দিল, সে তো আমার থেকে আপনি ভালো জানেন।

এবারে চাউনিটা আবার রুক্ষ কয়েক নিমেষের জন্য।—যা জানি সে চেষ্টা করতে গেলে আমিই তোমাকে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব।···চাকরি করবে ?

আবুর আর সবুর সইল না।—কেন করবে না মেমসায়েব, আপনার মুখের কথা খসলে বাপীভাইকে আমি আর ছাড়ি! ওর থেকে সেরা লোক আপনি এই তামাম বানারজুলিতে পাবেন না—এ আমি হলপ করে বলতে পারি। জঙ্গলের নাড়ি-নক্ষত্র জানে; গাছ-গাছড়াও কম চেনে না—

—এরপর তোমাকে আমি এখান থেকে বার করে দেব!

সঙ্গে সঙ্গে আবুর উচ্ছ্বাসের গলায় কুলুপ। কিন্তু মেমসায়েবের এরকম ঠাণ্ডা দাবড়ানি খেয়েও অভ্যস্ত বোধ হয়। হেসেই নিজের দু'কানে হাত দিয়ে সামাল দিল।

বাপীর দিকে ফিরল গায়ত্রী রাই।—আমি প্রথমে তোমাকে ছ'মাসের জন্য ট্রায়েল দেব—ইট উইল বি এ রিগরাস জব, বাট দেয়ার ইজ ফিউচার—এই ছ'মাস কি পাবে না পাবে সেটা পরে ঠিক করব।

ভাগ্যের পাশায় দান পড়েছে, শুরুতেই সেটা জোরালো করে তোলার মতো

জুয়াড়ীর খেলা দেখানোর এই মওকা। বাপীর এখন বদ্ধ ধারণা, আবুর মুখে সব শোনার পর যে অনুভূতিটা মনের তলায় আনাগোনা করে গেছে তাতে কোনো ভুল নেই। ভুল হলে একটা মানুষ এখান থেকে চোখের আড়াল হবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস এমন বদলে যেত না।

বাপী চুপ। কিছুটা নির্লিপ্তও।

—ও. কে ?

—ভেবে আপনাকে জানাব।

জবাব শুনে আবু তড়াক করে মোড়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

না, মহিলাও এই জবাব আশা করেনি। ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল।—ভাবার কি আছে ?

বিড়ম্বনার ধকল কাটাবার চেষ্টাতেই যেন সময় নিল একটু। বলল, যে-রকম লোক চাইছেন, ছ'মাসের ট্রায়েলে সেটা সম্ভব কিনা আপনিই জানেন।···তাছাড়া মিস্টার চালিহার জন্ম আমাকে কিছুটা ফ্রীহ্যাণ্ড দিতে আপনারই হয়তো অসুবিধে হবে।

এটুকুতেই ঠিক বোধগম্য হবার কথা নয়, হলও না। কিন্তু এতেই চোখ-কান সজাগ। মনে আরো কিছু আছে তাও যেন আঁচ করতে পারছে। কোনো ব্যাপারে অস্পষ্টতা বরদাস্ত করার মেজাজও নয় মহিলার। বলল, কারো যোগ্যতা বুঝতে ছ'মাস যথেষ্ট সময়। ফ্রি-হ্যাণ্ড দেবার কথা এখনই আসছে কোথা থেকে ? আর তোমার জন্যে মিস্টার চালিহাকে নিয়ে আমার কি অসুবিধে হবে ? হি উইল বি ইয়োর বিগ বস্···অবশ্য তোমার সম্পর্কে তিনি ভালো ইমপ্রেশন নিয়ে যাননি, তোমাকে গ্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট করবেন বলে মনে হয় না। আই উইল ট্রাই—

বেশ স্পষ্ট অথচ নরম গলায় বাপী বলল, মিস্টার চালিহা আমাকে খুব গ্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট করবেন মনে হলে আপনি কি অনেক আগেই আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতেন না ?

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বলল গায়ত্রী রাই। এই মুখ আর এই চাউনি দেখে ওদিকে ঊর্মিলা রাই আর এদিকে আবু রব্বানীও চকিত বিমূঢ়।

—হোয়াট ডু ইউ মীন্ ?

বাপী চুপ। একবারেই জবাব দেবার ইচ্ছে নেই।

ফলে মহিলার আরো ঝাঁঝালো গলা।—কাম স্ট্রেইট, হোয়াট ডু ইউ মীন্ ?

বেশ সহজ অথচ শান্ত মুখে বাপী বলে গেল, আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বুঝতে

পারছি, মনে যা আসে বলে ফেলে আমি অনেক সময় এরকম মুশকিলে পড়ি।
···আবুর মুখে আপনার আর আপনার ব্যবসার গল্প শুনে আমার কেমন মনে হয়েছিল, এত বড় অর্গানিজেশনে বাইরের কোনো একজন সর্বেসর্বা হয়ে উঠবে এটা আপনি চান না। আর এই জন্যেই মিস্টার চালিহার মতোই যোগ্য হয়ে উঠতে পারে এমন একজন নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসী লোক আপনার দিক থেকে আপনি চাইছেন। এ যদি ঠিক না হয়, ছ'মাসের ট্রায়েল দেবার দরকার নেই —নিজেকেই আমি বাতিল করছি।

মাত্র দু'চার মুহূর্তের জন্য বাপী যা দেখে উঠল সে কি ভুল? বুকের তলার গোপন কিছুর ছবিটা কেউ যদি আচমকা চোখের সামনে তুলে ধরে, সে কি চকিতের জন্য এমনিই ধড়ফড় করে ওঠে না? কিন্তু সে শুধু কটা পলকের জন্য। গায়ত্রী রাইয়ের পালিশ-করা সাদাটে মুখে আলগা রক্ত জমাট বাঁধছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। হিসহিস স্বরে বলল, ইউ আর রিয়েলি ইমপারটিনেণ্ট। আমার সামনে বসে আমারই চিফ একজিকিউটিভ সম্পর্কে তুমি এমন কথা বলো? এত সাহস তোমার? শুধু গলায় নয়, চোখেও আগুন ঝরছে।— ইউ মে গো নাও।

বাইরে পা দিয়ে আবুর হুতাশ একটা আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে।—একেবারে পারে এসে এভাবে খেয়া ডোবালে বাপীভাই?

এদিকটায় রাস্তায়ও আলো নেই। বেশ অন্ধকার। চা-বাগানের কাছাকাছি হলে তবে রাস্তায় আলো। আবুর হাতে টর্চ। সন্ধ্যার পর ঘরের বার হলে এখানে সকলের হাতেই টর্চ বা হ্যারিকেন থাকে।

টর্চের আলোটা পায়ের দিকে রাস্তার ওপর। পাশাপাশি চললেও আবু ভালো করে দোস্ত্-এর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। বাপী হাসছে একটু একটু। নিজেকে নিয়ে খুব একটা ভাবনা-চিন্তা আর সত্যি নেই। কারণ খুব বড় কিছু খোয়াবারও নেই আর।

বলল, তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন?

আবু যথার্থই বেজার। একটু হয়তো বিরক্তও।—এরপর ওই মেমসায়েব আমাকেও ছাড়বে না। তোমার ওইসব কথা ফাঁস করে দিলে ওই শালা ম্যানেজার ছাড়বে?

নির্লিপ্ত স্বরে বাপী বলল, তাহলে তুমি আমাকে ছাড়ো। আমাকে ক্লাবে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গিয়ে তোমার মেমসায়েবকে বলো, পাঁচ বছরে আমি এত বদলে গেছি তুমি জানতে না।

আবুর হাতের টর্চ আস্তে আস্তে বাপীর মুখের ওপর উঠে এলো। ঠোঁটে হাসি দেখে রাগই হল।—তুমি সত্যি বেশ বদলেছো তাহলে? আবু রব্বানী মওকা খোঁজে কিন্তু আসলে কোন্ শালার পরোয়া করে? দশ হাজার টাকা বাড়ির দাম পেলে—নিলে না। সেধে চাকরি দিতে চাইলে—তার জবাবে ওপর-পড়া হয়ে ওই কথা বলে এলে—তোমার মতলবখানা কি?

—টর্চ নামাও।···বাড়ির দাম মজুতই আছে। দরকার হলে বেচে দেব, আর তুমি সঙ্গে থাকলে ওই টাকায় নিজেরাই কিছু করতে পারব। কিন্তু তোমার কি মত, মেমসায়েবকে যা বলেছি, সত্যি নয়?

আবু তবু ক্ষুব্ধ।—গায়ে পড়ে অত সত্যি কথা বলার দরকার কি ছিল?

বাপী আর কিছু বলল না। বলার আছেই বা কি। আবু যা ভাবছে তা হতেই পারে। গায়ত্রী রাই বাপী'ক হয়তো ছেঁটেই দিল।·· কিন্তু তা যদি হয়, ভাগ্যের চকে তেমন কোনো বড় দান পড়েনি বুঝতে হবে। ছেঁটে দিলেও বাপীর খেদ থাকবে না। কিন্তু মন সে-কথা বলছে না। দেখা যাক···।

আর কিছু ভাবতে ভালো লাগছে'না। রাজ্যের ক্লান্তি। কাল সমস্ত রাত ঘুম হয়নি। ঘুম ক'রাত ধরেই নেই। আজও সকাল থেকে এ পর্যন্ত ধকলের মধ্যেই কাটল। এখন নিরিবিলির তৃষ্ণা। একলার কোটরে সেঁধিয়ে যাবার তাড়না।

জিগ্যেস করল, ক্লাবে আলাদা ঘর-টর একটা পাব তো?

বুক ঠুকে বলার মতো করে আবু জবাব দিল, এজন্যে ওই ম্যানেজারকে বলার কিছু দরকার ছিল না—সে-ব্যবস্থা এ-মোল্লাই করতে পারত।

॥ এগারো ॥

এক ঘুমে ভোর।

চোখ তাকিয়ে বাপী নিজেই অবাক। জানলা দিয়ে বানারজুলির নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। তার গায়ে ধূসর পাহাড়ের দেয়াল। বাপীর লোলুপ দু চোখ সেদিকে স্থির খানিক।

দু রাত আগে বুকের তলায় যখন রক্ত ঝরছিল; এই বানারজুলি তখন মায়ের মতো হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। বানারজুলি সত্যিই আশ্রয় দেবে ওকে? নইলে এমন একটানা শান্তির ঘুম এলো কোত্থেকে?

কিন্তু এই ক্লাবে থাকা পোষাবে না। পাঁচ-ছ বছরে ক্লাবের ভোলও একেবারে

বদলে গেছে। একতলা বিশাল লম্বা দালান এখন। ছোট-বড় দুটো হলঘর। বাইরের অতিথি অভ্যাগতদের দুই-এক রাত থাকার মতো মাঝারি ঘরও আছে কয়েকটা। ভাড়া লাগে না কিন্তু কর্তাব্যক্তিদের সুপারিশ লাগে। সাজানো-গোছানো ঘর। একদিকে গদির শয্যা, দেয়ালের গায়ে ড্রেসিং টেবল, আলমারি। অ্যাটাচড বাথ। সেখানেও বেসিন, বাথ-টাব, মাথার ওপর শাওয়ার। গায়ত্রী রাইয়ের চিফ একজিকিউটিভ ক্লাবের ম্যানেজারকে ঘরের কথা বলেই রেখেছিল। এখানে তাকে ম্যানেজার কেউ বলে না। ছোট-বড় উঁচু-নিচু সকলেরই সে ডাটাবাবু। বাপী পরে জেনেছে ভদ্রলোকের নাম বাবুলাল দত্ত—সকলের মুখে মুখে ডাটাবাবু হয়ে গেছে।

মুখ দেখে বয়েস আঁচ করা শক্ত। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে যে কোনো বয়েস হতে পারে। ঢ্যাঙা, রোগা, ফর্সা। পরনে ঢিলে-ঢালা ট্রাউজার, গায়ে ঢোলা কোট। হাসি-হাসি মুখ, চটপটে হাব-ভাব।

লোকটা আবুকেও খাতিরই করে বোঝা গেছে। বেয়ারার মারফৎ খবর পেয়ে এসেই অন্তরঙ্গ সুরে বলেছিল, কদিনই ভাবছি আবুসাহেবের একেবারে দেখা নেই কেন।

একটা চোখ একটু ছোট করে ঠাট্টার সুরে আবু জিজ্ঞেস করেছিল, মালে টান পড়েছে?

পাশে অচেনা লোক দেখে ডাটাবাবু সপ্রতিভ সৌজন্যে বাপীকে নমস্কার জানিয়েছে।—মিস্টার তরফদার? মিস্টার চালিহা আপনার কথা বলে গেছেন। সব ঘরই খালি—যেটা খুশি নিতে পারেন।

সব শেষের এই নিরিবিলি ঘরটাই বেছে নিয়েছে বাপী। বিকেলে একটু ভারী খাওয়া হয়েছিল, ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ খুব ছিল না। কিন্তু আবুর কাছে পার নেই। আজকের দিনটা অন্তত বাপীভাই তার আদরের অতিথি। ক্লাব ক্যানটিনের খানা ভালো, ওই ক্যানটিন চালিয়েই বাবু ডাটা লাল হয়ে গেল, নইলে ম্যানেজার হিসেবে তার মাইনে-কড়ি কিছু নেই—ক্যানটিনে দুজনে একসঙ্গে ডিনার সারবে, তাকে আবু খাওয়াবে।

ডিনারের আগে ক্লাব দেখিয়েছে আবু, ক্লাবের গল্প করেছে। সব কটা চা-বাগানের মালিক আর কর্তাব্যক্তিরা জোট বেঁধে বাড়তি লাভের কড়ি থেকে এই নতুন ক্লাব করেছে। নইলে এই পেল্লায় দালান তুলতে আর সব ব্যবস্থা করতে খরচ যা হয়েছে তার সবটাই ইনকাম ট্যাক্সের পেটে গিয়ে ঢুকত। ভাগাভাগি করে সব টাকাই কোম্পানীগুলোর খরচের খাতায় উঠেছে।

ক্লাবে সাজ বা সরঞ্জামের ক্রটি নেই। তকতকে বিলিয়ার্ড টেবল, দু সেট টেবলটেনিস বোর্ড, গোটাতিনেক ক্যারমবোর্ড, মাঝারি হলঘরের একদিকে অনেকগুলো ছোট ছোট টেবিল, চারদিকে শৌখিন চেয়ার। এখানে তাস দাবা জুয়ার আড্ডা। অন্যদিকে দুটো বড় বড় টেবিলে খবরের কাগজ আর রংচঙা জার্নাল ম্যাগাজিন ছড়ানো।

রাত দশটার কাছাকাছি। তখনো জুয়ার আসর জমজমাট। দু-পাঁচজন আধ-বয়সী মহিলাকেও দেখা গেছে এখানে। খবরের কাগজ বা জার্নালের দিকে কেউ নেই। চার-পাঁচটা টেবিলে তিন-তাস রামি পোকার চলেছে। ওদিকে সকলেই গম্ভীর, জোরালো আলোর নিচে সিগারেটের ধোঁয়া পাক খাচ্ছে। ব্যস্ত শুধু কয়েকটা তকমা পরা বেয়ারা। অর্ডার মাফিক ড্রিঙ্ক সারভ করে যাচ্ছে আর হিসেবের খাতায় সই নিচ্ছে। হিসেবের ফয়সলা হয় প্রত্যেক জুম্মাবার অর্থাৎ শুক্রবারে। শনি রবি দুদিন চা-বাগানের ছুটি। তাই শুক্রবার রাতে হোমরাচোমরাদের নাকি দিল ভালো থাকে। ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট ভাইস প্রেসিডেণ্ট সেক্রেটারি ইত্যাদি আছে। বুঝে শুনে রকমারি মদ আমদানির ব্যবস্থা এবং তদারক তারাই করে থাকে। মেম্বাররা কি দরে সেটা এখানে ভোগ করবে তাও তারাই হিসেব কষে ঠিক করে দেয়। এ ব্যাপারে ডাটাবাবু শুধু জিম্মাদার, সার্ভিস চার্জ ছাড়া আর বেশি কিছু লাভ করতে পারে না। তবে আবুর ধারণা বাজারে শুধু খালি বোতল বেচেই লোকটা মন্দ কামায় না। তার আসল লাভ ক্যানটিন থেকে। খানা ভালো, গলা-কাটা দাম। শুকুর শনি এই দুটো দিন ডাটাবাবুর লক্ষ্মীবাবুর। চা-বাগানের রইস মানুষেরা সপরিবারে ওই দু রাতে ওখানেই ডিনার সারে।

অল্প আর মাঝারি আয়ের খদ্দেরদের জন্য ডাটাবাবুর ডে-ক্যানটিন খোলা থাকে। তখন কম খরচেও লাঞ্চ মেলে। আর যা মেলে সেটা ডাটাবাবুর নিজস্ব কারবার। কম দামে দিশী ভালো মালের যোগানদার ডাটাবাবু। সবাই তো আর হোমরাচোমরা চাকুরে নয় এখানে। লাঞ্চ খেতে এসে বা এমনিতেও সূয্যি ডোবার আগে এসে তারা আস্ত বোতল কিনে নিয়ে যায়। একটু অসুবিধে, ইচ্ছে করলেও এ জিনিস এখানে বসে খাবার হুকুম নেই। এখানকার বড় সাহেবসুবোদের সঙ্গে রণজিৎ চালিহার খাতির বাজারের থেকে সস্তায় নামী-দামী মাল যোগানোর দৌলতে, আর ডাটাবাবুর কাছে আবু সায়েবের খাতিরও অনেকটা একই কারণে। আবু বর্ডারের বাইরে গেলেই কম দামের দিশী মাল পাবার আশায় হাঁ করে থাকে ডাটাবাবু। বর্ডারের ওধারে

হরেকরকমের দিশী মালেরও ছড়াছড়ি। এই দিশী মাল মানে হাড়িয়া পচাই নয়, তার থেকে ভদ্দরলোকের জিনিস।

এহেন জায়গায় কিনা বাপী তরফদার।

এরকম জায়গায় রাতটা অঘোর ঘুমের মধ্যে কেটে গেল সেটাই আশ্চর্য। আরো ক'দিন ক'রাত থাকতে হবে কে জানে। এখানে বানারজুলির বাতাস নেই, বানারজুলির মাটির গন্ধ নেই। এর থেকে আবুর জঙ্গলের ঘরের একটাতে থাকতে পেলেও বেশি স্বস্তি বোধ করবে।

মুখ হাত ধোয়া হতেই চায়ের তেষ্টা। আর তক্ষুনি বুকের তলায় মোচড়। এই দুটো কান আর দুটো চোখ একটা যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে এলো।···এমনি সকালে খুপরি ঘরের নড়বড়ে দরজা বাইরে থেকে ঠেলে খোলার কঁ্যাচ করে শব্দ।···এক হাতে রুটি বা বিস্কুট, অন্য হাতে গরম চায়ের গেলাস···ঘুমের দাগে ফোলা ফোলা একখানা শামলা মুখ।

দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো বাপী। বারান্দায় একটা বেয়ারার জিম্মায় বনমায়ার নতুন মাহুত লছমন তার বাক্স আর বিছানা রেখে গেছে। আবু বলে গিয়ে থাকবে। এখানে এ দুটোর একটাও মানায় না ঘরে ঢুকিয়ে দিতে বলে বাপী সোজা ক্যানটিনে। লম্বা লম্বা পা ফেলে আর এক দিক থেকে ডাটাবাবু সামনে এগিয়ে এলো।—গুড মর্নিং সার, রাতে কোনো অসুবিধে হয়নি ?

টাটে গোলাপ কি গাঁদা ডাটাবাবু সেটা দেখে না। বাপী জবাব দিল, কিছু না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে হালকা শিস দিতে বেয়ারা ছুটে এলো।—স্যবকা ব্রেকফাস্ট।

ডাটাবাবু হাল্কা চালে কিচেনের দিকে চলে গেল। এরপর শুধু চা আর টোস্ট অর্ডার দেয় কি করে। সঙ্গে একটা ডিমের পোচ বলল। কিন্তু এরই বিল দেখে বাপীর দু চোখ কপালে। চায়ের পাট শেষ হতে বিল সামনে রেখে বেয়ারা জিজ্ঞেস করল, দুপুরে লাঞ্চ হবে কি না।

বাপী জানালো হবে। কিন্তু ভিতরে আবার আর এক চিন্তা। এখানে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার করতে হলে তার পুঁজি ফাঁক হতে ক'দিন আর। আবু শার তার মেমসায়েব খাসা ব্যবস্থাই করল যা হোক।

এখানে সন্ধ্যের পর কাগজ আসে। বাপী বাইরে বসে আগের দিনের কাগজটা উল্টে-পাল্টে দেখছিল। কত দিন যাবৎ বাইরের জগৎটাকেই ভুলে বসেছিল। খবরের কাগজ হাতে নিয়েও দেখেনি। কিন্তু আজও একটু

বাদেই আর ভালো লাগল না।

দূরে বানারজুলির জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। ওটা টানছে ওকে। আবু সকালে আসবে বলে গেছল। তার জন্য অপেক্ষা করতে না হলে বেরিয়েই পড়ত।

কিন্তু নটা বেজে গেল আবুর দেখা নেই। থাকা খাওয়ার ফয়সলাই আগে করে নেওয়া দরকার। জলপাইগুড়ির ললিত ভড়ের কল্যাণে রান্নাটাও রপ্ত হয়েছিল। নিজেরটা নিজেই করে নিতে পারে। এই ক্লাবঘরে থাকলে সেটা সম্ভব নয়। একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলে ওই গায়ত্রী রাই যদি মাসে একশ টাকা—বাড়িভাড়া থেকে পঞ্চাশ টাকা করেও ওর হাতে দেয় তাহলে খাওয়া-খরচটা অন্তত চলে যেতে পারে। ভালো খেতে ভালো লাগে না এমন নয়, কিন্তু গত পাঁচ বছরে বাপী এ ব্যাপারে অনেকখানি নিরাসক্ত হতে পেরেছে।...যাক বাড়ির দশ হাজার টাকা দাম পাবার পর মাসে মাসে খুদ কুড়নোর কথা আর ওঠেই না। বেচেই দেবে। এমন লোভনীয় দর পেয়েও কাল রাতে অমন নিস্পৃহ থাকতে পারল কি করে সেটাই আশ্চর্য লাগছে এখন।

ওই দশ হাজারেব অঙ্কটা সামনে রেখে বাপীর নিজেকে একটু চাঙা করে তোলাব চেষ্টা। কিন্তু গতরাতে অমন নির্লিপ্ত ভাবখানা দেখিয়ে এসে আজই আবার নিজে থেকে বাড়ি বিক্রির প্রস্তাব নিয়ে ছুটে যেতে পারে না। পরিস্থিতি বোঝার জন্যেও কটা দিন সবুর করতেই হবে।

আবুর এখনো দেখা নেই। বিরক্ত হয়ে পাজামা পাঞ্জাবি বদলাবার জন্য ঘরে এলো। সাড়ে নটা বাজে, এবারে বেরিয়ে পড়বে।

মিনিট দশেকের মধ্যে বেরুতে গিয়ে দেখে ডাটাবাবুর কিচেন ঘর থেকে আবু রব্বানী এদিকে পা বাড়িয়েছে। দরজার কাছে ডাটাবাবু দাঁড়িয়ে। অতটা দূরে থেকেও বাপীর মনে হল কাঁচুমাচু মুখ তার। আর বড় বড় পা ফেলে আবুর গভীর চালের এই মুখ দেখলে কেউ বলবে না বানারজুলি জঙ্গলের বীটম্যান ও।

কাছে এসে ধমকের সুরে বলল, সকালে ব্রেকফাস্টের টাকা দিতে গেলে কেন? আব শুধু ডাল ভাত মাছের ঝোলের লাঞ্চ অর্ডার দিয়ে এসেছ কেন?

জবাব না দিয়ে বাপী চেয়ে রইল। এত দেরিতে এসেও প্রথমেই ডাটাবাবুর কাছে এই খোঁজ নিতে গেল, অবাক হবারই কথা।

ঘরে পা দিয়ে আবু আবার বলল, ডাটাবাবুকে বকে এলাম আর তোমার অর্ডার বাতিল করে ফার্স্ট ক্লাস লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে এলাম, আর বলে দিলাম

এরপর যে কদিন এখানে থাকবে ব্রেকফাস্ট বা লাঞ্চডিনারের কোনো বিল যেন তোমার কাছে হাজির না করা হয়।

—সে কি। টাকা কে দেবে—তুমি?

—না, মেমসায়েব।

বাপীর স্নায়ু সজাগ। কিছু কি ঘটেছে এর মধ্যে আর সেইজন্য আবুর আসতে দেরি? কিন্তু ওর মূর্তি দেখে কিছু বোঝা দায়।

পিছনের দরজা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে আবু ভুরু কুঁচকে একবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল।—আমার দেরি দেখে সটকান দিচ্ছিলে?

—বসে বসে ভালো লাগছিল না। কিন্তু তোমার ওই—

—বোসো। আগে আমার কথার জবাব দাও। বয়সে আমি কত বড় হব তোমার থেকে?

এই গাম্ভীর্য দেখে বা প্রশ্ন শুনে বাপীর আবারও কেমন মনে হল সমাচার কিছু আছে। জবাব দিল, বছর ছয় হবে…

—তাহলে তুমি গুনে গুনে আমার দু গালে তিন-তিন ছটা থাপ্পড় মারো. আর কান দুটো ছবার কষে মুলে দাও।

কপট রাগ আর ধবে রাখতে পারল না। দু হাতে বাপীকে বুকে জাপটে ধরল আর দু গালে নিজের গাল ঘষতে লাগল। এরপর চুমুটুকুও খেয়ে বসতে পারে. বাপীর নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা।

—বাপী ভাই আমি একটা পাঁঠা—আমি একটা গরু—আমি একটা গাধা।

এরপব যেটুক, বাপীর কাছে অন্তত তা আর অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। তবু দু কান সজাগ রেখে মন দিয়েই শুনল। রাতে ব্যাজার মন নিয়ে আবু রব্বানী ঘরে ফিরেছে। দুলারিকেও বলেছে, মেমসায়েবের কাছে গিয়ে বাপী ভাই বিসমিল্লায় গলদ বাঁধিয়ে বসেছে, এখন ওর নিজের গলা বাঁচলে হয়।

সকালে জঙ্গলে যাবার আগে বাপী ভাইয়ের কাছে আসার কথা, কিন্তু তার আগেই লোক মারফৎ মেমসায়েবের তলব। জলদি যেতে হবে। আচ্ছা করে ঝাড়বে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে। মেমসায়েব বারান্দায় তার অপেক্ষাতেই বসেছিল। সামনে গিয়ে মন ভেজানোর মতো সেলাম ঠোকার সময়ও দিলে না। রক্ত জল করে দেবার মতো ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমার ওই লোক কাল অমন কথা বলে গেল কেন—তার কাছে তুমি আমাদের সম্বন্ধে কি বলেছ?

নিরুপায় আবু তখন আল্লার দোহাই দিয়ে জানালো, দোস্ত যা বলে গেছে

তার সবটাই তার নিজের মাথায় গজিয়েছে, সে এরকম বলতে পারে মনে হলে এই বিপাকে পড়ার জন্য তাকে মেমসায়েবের কাছে নিয়েই আসত না। রাতে এখান থেকে বেরুনোর পর দোস্তের সঙ্গে তার এ নিয়ে একরকম ঝগড়াই হয়ে গেছে। আবু শুধু তার কাছে মিসিসায়েবের (উর্মিলার) এলেমদার বাপজানের জিপ অ্যাকসিডেণ্টের গল্প করেছিল। ম্যানেজার চালিহা সাহেবের আযুর জোরের কথা বলেছিল, আর মেমসায়েব এই ম্যানেজারকে নিয়ে বুদ্ধি আর সাহসের জোরে কি করে তাঁর খসমের ব্যবসা এমন জমজমাট করে তুললেন সেই সব গল্প করেছিল। দোষের মধ্যে মেমসায়েব এখন আর একজন লেখাপড়া জানা ইমানদার লোক খুঁজছেন আর এ পর্যন্ত দুজন লোককে ট্রায়েল দিয়ে ছাঁটাই করেছেন এ খবরটাও দোস্তকে জানিয়েছিল। ও খুব আশা করেছিল দোস্তকে মেমসায়েবের পছন্দ হবেই। কারণ এমন বিদ্যাবুদ্ধি আর সাহস ও-বয়সে কম ছেলেই ধরে। কিন্তু এখানে এসে আর চালিহা সায়েবকে দেখে দোস্ত কি ভেবে আর কি বুঝে অমন বেমক্কা কথা বলে ফেলল সেটা এখনো ওর মাথায় আসছে না।

বরফ-ঠাণ্ডা মুখ করে মেমসায়েব ওর সব কথা শুনে গেল। তারপর বলল, তোমার দোস্ত্ একটা হাড়-পাজী ছেলে—বুঝলে?

মেমসায়েবকে একটু তোষামোদ করার আশায় আবু মাথা নেড়ে প্রায় সায় দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই অবিশ্বাস্য কিছু দেখল। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির মতো কি। আর চোখেও একটু খুশির জেল্লা।

আবু বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পেল না।

সঙ্গে সঙ্গে আবার মালকানের কড়া মুখ। ঝাঁঝালো গলায় আবুকে সাবধান করল, দোস্ত্ কাল রাতে এখানে কি বলেছে না বলেছে এ যেন কাক-পক্ষীতেও জানতে না পারে—জানলে দুজনেরই গর্দান যাবে। তারপর হুকুম করল, তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। তারপর নিজেই আবার বলল, এখন থাক, সকালের দিকে চালিহার আসার কথা, বিকেল তিনটে-চারটের সময় যেন দেখা করে।

আবু রব্বানীর বুদ্ধিসুদ্ধি একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে সেঁধিয়েছিল। এবারে খোলসা। আনন্দে সেখানেই একটা ডিগবাজী খেতে সাধ গেছল তার। কিন্তু মেমসায়েবের জেরার শেষ নেই তার পরেও। ছেলেবেলায় কেমন দেখেছে দোস্তকে, একটু বড় হবার পর কেমন দেখেছে, পাঁচ বছর দেখেনি এর মধ্যে বন্ধুর স্বভাব-চরিত্র যে বিগড়য়নি সে জানল কি করে—এই সব।

আবুও তখন লাগাম ছেড়ে বন্ধুর প্রশংসা করেছে। সত্য-মিথ্যে যা মনে এসেছে তাই বলেছে। বলেছে, পাঁচ বছরে স্বভাব বদলে থাকলে কলকাতার মতো আমোদ-আহ্লাদের জায়গা ছেড়ে সে এই জঙ্গলে ফিরে আসবে কেন। এতদিন বাদে দেখে ক'ঘণ্টার মধ্যে আবুর বরং ভয় ধরেছে বন্ধু বিবাগী-টিবাগী না হয়ে যায়। আর টাকার লোভ যে নেই সে প্রমাণ তো মেমসায়েব নিজেই পেয়েছেন। পকেটে দশ টাকা আছে কিনা সন্দেহ কিন্তু বাড়িটার জন্য নাকের ডগায় দশ হাজার টাকা ঝুলিয়েও তাকে লোভের জালে আটকানো গেল না।

বুকের তলার ক্ষতর ওপর আঁচড় পড়ল ক'টা। ওর স্বভাব-চরিত্রের খবর জানা থাকলে প্রশংসা করতে গিয়ে এই আবু রব্বানীরও জিভ আটকে যেত। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য বাপী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, আমার ক্লাব-ক্যানটিনে খাওয়াদাওয়ার খরচ চালানোর ভার তাহলে তোমার মেমসায়েবের?

হ্যাঁ। ভালো ঘর পেয়েছ কিনা খোঁজ করল। আমিও তক্ষুনি কাজ হাসিল করে নিলাম। বললাম, ভালো ঘর পেলে কি হবে, ওখানে ডাটাবাবুর খাওয়াব বিল মেটা ত তো এক হাত জিভ বেরিয়ে যাবে। মেমসায়েব তক্ষুনি বলে দিল, বিল সব আমার কাছে পাঠাতে বোলো। আবু হাসছে হি-হি করে—এমনিতে মেমসায়েবের আঙুলের ফাঁকে জল গলে না, আমার যে এখনো ম্যাজিকের মতো লাগছে গো বাপী ভাই!

এবার বাপীও হাসল।—গায়ে পড়ে অত সত্যি কথা বলার দরকার কি ছিল এখন সেটা বুঝছ তাহলে?

আবু অকপটে মাথা ঝাঁকালো।—হাড়ে হাড়ে বুঝছি। কাল দুলারির কাছে তোমাকে গালই পেড়েছি আর এই ভোজবাজির কথা শুনলে ও আমাকে বোকা পাঁঠা বলবে।

ঘরের মধ্যে আর ভালো লাগছিল না। আবুর সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ল। ও এখন জঙ্গলের কাজে যাবে। হেড বীটম্যান হিসেবেও দায়িত্ব তো একেবারে কম নয়। ওর সঙ্গে আগের মতোই জঙ্গলে কাটানোর তৃষ্ণা বাপীর।

পাশাপাশি পাকা রাস্তা ধরে চলতে চলতে বাপী জিজ্ঞেস করল, আপাতত আমার এই ক্লাবে থাকাই ঠিক তাহলে?

আবু সানন্দে জবাব দিল, খাবেদাবে তোফা আনন্দে থাকবে—গাঁটের পয়সা খরচা না হলে এর থেকে ভালো জায়গা আর আছে নাকি? তবে মেমসায়েব পাশের জমিতে তোমার ঘর তুলে দেয়ার কথাটা একেবারে ছেঁটে দেয় নি। আজও বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওই খালি জমিটুকু দেখে বলছিল, ঘর